আশাপূর্ণা দেবী

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৬৯ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু

ব্লক
মডার্ণ প্রসেস

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস

মুদ্রক
বংশীধর সিংহ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

স্নেহ ভালবাসা আর আদরের

শতদীপাকে

PARAMESWARI

by

Smt. Ashapurna Devi

লেখিকার অন্য বই

প্রথম প্রতিশ্রুতি
সুবর্ণলতা
অস্তিত্ব
যে যেখানে ছিল
আমি ও আপনারা
বাছাই গল্প

যাঁরা এমন ধারণা পোষণ করেন এযুগের পটভূমি থেকে চন্দ্রকোণার ধুতি, গিলেকরা ঢিলেহাতা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবী, সোনার বোতাম, রুপো বাঁধানোছড়ি, হরিণের চামড়ার চটি, লক্ষ্ণৌ কাজ করা গড়গড়া আর অম্বুরি তামাক চিরতরে বিলোপ পেয়েছে। তাঁদের ধারণাটি ভুল। অবশ্য যে যার নিজ নিজ ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকতে চান, থাকতে পারেন, বলবার কিছু নেই। তবে যদি সত্যসন্ধানী হন তো ইচ্ছে করলেই 'রাজানগর রাজ-বাড়ির' পুরনো বারান্দায় এসে উঁকি মেরে দেখে যেতে পারেন।

ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখবার পক্ষে প্রশস্ত সময় হচ্ছে বেলা নটা থেকে বারোটা আর সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত দশটা। এই সময়টিই ওখানের বাতাস অম্বুরি-তামাকের সুবাসে মাদকতাময় হয়ে ওঠে। গড়গড়া টানার মৃদু মন্দ ধ্বনি ধ্বনিত হতে থাকে একটি ছন্দময় ছন্দে আর তার মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ হুঙ্কার ওঠে দুই বাঘের।

দুই বাঘই দুর্জয় এবং গর্জনে পটু। কেউ কারো কাছে এক তিলও নত হতে বা হার মানতে রাজী নয়। তবে এঁদের হুহুঙ্কারে কেউ চমকিত হয়ে ছুটে আসে না। সকলেই জানে ও কিছু নয়। এ সময়টা এঁদের খিদে বাড়াবার কসরৎ হয়। অবশ্য 'সকলে' বলতে আর কে? পরমেশ্বরী আর মানমর্যাদায় 'ছোটবড়' গোটা কতক কাজের লোক ছাড়া?

পরমেশ্বরীই ওই ওদের সাহায্যে এই ব্যাঘ্রযুগলকে সামলান। এবং তাদের সর্ববিধ চাহিদার জোগান দিয়ে চলেন অতি সন্তর্পণে, নিঃশব্দে। কবে বুঝি একদিন পুরনো সরকারমশাই একটু সশব্দ হয়ে পড়ে বাঘেদের অবহিত করবার সংকল্পে কী একটা বলে বসতে চেয়েছিলেন, সেই অপরাধে তাঁর আটচল্লিশ বছরের চাকরিটি যেতে বসেছিল। নেহাৎ নাকি পরমেশ্বরীর মনে পড়ে গিয়েছিল তিনি যখন মাথায় মুকুট গলায় সাতনরির হার হাতে রতনচূড় আর পায়ে চরণ পদ্ম পরে এবাড়িতে এসে ঢুকেছিলেন, তখন

পালকির ধারে ধারে পায়ে হেঁটে সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন এই সরকার মশাই।

চাকরীটা তাঁর বজায় থেকে গেল শুধু ওই স্মৃতিটুকুর ওকালতিতে। তদবধি অবশ্য সরকার মশাই বাঘেদের কোনো বিষয়েই অবহিত করতে আসবার চেষ্টা করেন নি। মনস্থির করে ফেলেছেন, যেমন চলছে চলুক!

'ব্যাঘ্রযুগল' নামটা পরমেশ্বরীরই দেওয়া। বলেছিলেন, নাম ধরে কথা বলার যখন রেওয়াজ নেই, তখন দুজনকেই এক্ নামে ডাকি। শর্টকাটও হবে। তবে লোক সমাজের নাম, দু'জনের দু রকম। একজন হচ্ছেন রাঘবেন্দ্রনাথ রায় আর অপরজন হচ্ছেন কুলপতি নারায়ণ মুখুটি।

কুলপতি এই রাজানগর রাজবাটির জামাই।

রাঘবেন্দ্র রাজবংশীয়। পিতা ছিলেন বিক্রমেন্দ্রনাথ, পিতামহ সুরথেন্দ্রনাথ। ঊর্ধ্বতন আরো চোদ্দপুরুষের নাম নাকি সরকার মশাইয়ের স্টকে আছে, কিন্তু সে স্টক বার করে দেখিয়ে আনন্দ পাবেন, এমন আর কে কোথায় আছে? রাঘবেন্দ্র তো নিঃসন্তান।

আর কুলপতিনারায়ণ?

তাঁকেও নিঃসন্তানই বলা যায়। যে সন্তান জন্মেই মরেছে এবং সেই সঙ্গে মাকেও মেরেছে, তাকে কী আবার কেউ হিসেবের খাতায় ধরে? অতএব দুজনেই 'আঁটকুড়ো।' বোধকরি সেই কারণেই দুজনের একই মেজাজ। লোক দ্যাখতা দুজনের মাঝখানে ফরাসের ওপর একখানা দাবার ছক পাতা থাকে এবং দুজনেরই বাঁ হাতে থাকে গড়গড়ার নল, তবে প্রকৃতপক্ষে সকাল বিকেল এই কয়েক ঘণ্টা করে সময় তাঁদের ঝগড়া করবার সময়।

পরমেশ্বরী তো তাই বলেন।

এঁরা যদিও সে কথা শুনলে দারুণ রেগে গিয়ে বলেন 'তর্ক আর ঝগড়ায় তফাৎ বোঝবার বুদ্ধিটুকুও যার নেই, তার কথা আমরা ধর্তব্য করিনা।' তবে রেগে উঠতেও ছাড়েন না।

আজ পরমেশ্বরী রান্নাঘরের সামনে পিঁড়ি পেতে বসে রাঁধুনি শ্রীনাথের

মার সঙ্গে হাত চালিয়ে মাছের কচুরী ভাজবার জন্যে পুর ভরছিলেন। এটি নিবেদিত হবে সান্ধ্যভোগে চায়ের সঙ্গে। হঠাৎ দু দুটো গলার হুঙ্কার। এটা দাবার হাতী ঘোড়া রাজা মন্ত্রীর কাটাপড়াজনিত একটি গর্জন নয়, চলছে। বেশ কিছুক্ষণ চলছে।

পরমেশ্বরী একটু চঞ্চল হয়ে বললেন, বলরাম দেখে আয় তো এতক্ষণ কী হচ্ছে?

বলরাম বলল, ওরে ব্বাস! আমারে দেখতে পেলেই একদম ভস্ম করে খেলবে। কর্তাবাবুর যা চোখ! আগুন ঝরে। যদি বলে ওঠে, 'তুই এখেনে কী করতে?' তাহলেই গেচি। পেটের পিলে চমকে যাবে।

পরমেশ্বরী হাসলেন, সেটা তো তোর পক্ষে মঙ্গলই হবে রে! ডাক্তার বদ্যি না দেখিয়েই পিলে ঝরে যাবে।

আবার কানে এল সেই গর্জন 'খবরদার বলছি। আর এক ইঞ্চিও এগিও না।'

দ্বিতীয় কণ্ঠ ধ্বনি, 'আলবাৎ এগোবো! ইয়ার্কি পেয়েছ নাকী?'

দুটো স্বরই উত্তাল থেকে উত্তাল হচ্ছে। যদিও ব্যাপারটা নতুন নয়! হাতের কাজ না সেরে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। একেবারে খাবারটা ভেজে হাতে করে দোতলায় উঠে যাবেন এই মনোবাঞ্ছা। কিন্তু আজ যেন ঝগড়াটা তুঙ্গে উঠছে। অথচ রাজবাড়ির মাঝের অংশটি ভেঙে পড়ে ধরাশায়ী হওয়ার দরুন অনেকটা ঘুরে তবে সিঁড়ি উঠতে হয় তাই আলস্য! বয়েসও তো হচ্ছে।

এহেন সময় বিপদে মধুসূদন সরকার মশাই চলে এলেন তাঁর 'কাছারি ঘর' থেকে।

একদা কর্তাদের আমলে কাছারিবাড়ি নামের একটা ব্যাপার ছিল। ছিল আরো অনেক কিছু। তা চিরাচরিত নিয়ম—'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।' জমিদারই নেই, তো কাছারিবাড়ি।

তথাপি সরকার মশাই ওই নামের মোহটুকু আঁকড়ে রেখে এই ভগ্নদশা রাজবাটিরই বারবাড়ির একটি ঘরকে 'কাছারিঘর' নাম দিয়ে সেখানেই

কাজ কর্ম করেন।

কুলপতি বলেন, এখনো আপনি ওই 'সেরেস্তার ডেড্‌বডি' নিয়ে কী এত কাজ করেন সরকার মশাই? একদিন সবগুলো গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করে আসুন না।

সরকার মশাই গম্ভীর ভাবে বলেন, আমি মলে আপনারা দেবেন। আরে আপনি মরবেন আর আমরা টিকে থাকবো? বয়েসে বড় কে?

সরকার আরো গম্ভীর হয়ে বলেন, চিত্রগুপ্ত কি আর বয়েস মানেন? অতএব তিনি কাছারি ঘরে বসে সেরেস্তার নথিপত্র দেখেন।

তো সেখান থেকেও এনাদের কণ্ঠধ্বনির প্রাবল্য চঞ্চল করে তোলায়, ভিতর বাড়িতে চলে এসেছেন।

পরমেশ্বরী বললেন, আজ যেন একটু বেশী বেশী মনে হচ্ছে সরকার মশাই। একটু দেখবেন না কী? কী নিয়ে এতোক্ষণ—

সরকার একটু কান পেতে বললেন, ও আর দেখতে যেতে হবে না। বুঝেছি। সেই পান্নার আংটিটি?

পান্নার আংটিটি!

হ্যাঁ দুজনে লাঠালাঠি হচ্ছে কে ওর মালিক হবে!

পরমেশ্বরী একটু হেসে বললেন, আপনিও যেমন সরকারমশাই। কোন্ জন্মের কার জিনিস তার হিসেব নেই, হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেই অমনি কর্তাদের হাতে দিয়ে বসলেন। আপনি পেয়েছিলেন, আইনতঃ আপনারই প্রাপ্য।

সরকার জিভ কেটে বলে ওঠেন, কী যে বলেন বৌমা! কার জিনিস তার হিসেব না থাক, এ বংশের তো বটেই! 'আমি পেয়েছি বলে আমার প্রাপ্য' এমন কথা ভাবলেও যে নরকেও ঠাঁই হবে না আমার।

রাজানগরের সব কিছু যে অনেকটা পিছিয়ে থাকা তাতে সন্দেহ নেই। এ যুগে কে আবার 'নরকেও' একটা ঠাঁই না পাবার ভয়ে মরছে? 'তা' পাওয়াকেও বলিহারি!

এই 'কাছারিঘরটা' তো সেকালে কর্তাদের আমলে ছিল গুদামখানা। যত রাজ্যের ফালতু জিনিসের আশ্রয়। পুজোর সময় যাত্রার আসর বসাতে যে সব চাদর শতরঞ্চি 'গ্যাসলণ্ঠন' আর জল জোগানোর জন্যে বড় বড় ড্রাম আরো কত হ্যানো ত্যানো থাকতো, সেই ঘরে ওই দামী জিনিস।

অবশ্য ওই সব দঙ্গলের জঙ্গলে ছিল না। ছিল কড়ি বরগার মধ্যেকার একটা গোপন খাঁজের মধ্যে ছোট রুপোর কৌটার ভেতর। ভরিটাক সোনায় গড়া একটি আংটির গায়ে আঁটা জামের আঁঠি সাইজের একখানি পান্না! টাট্‌কা পাকা রুইয়ের পিত্তের মতো রং! আর কী জেল্লা! হিরে হার মানে।

সরকার শিবশম্ভু ঘোষাল কড়িবরগায় উই ধরেছে দেখে উধর্ব মুখে দেখছিলেন। কাঠের কড়ি বরগা, উই তো ধরতে পারে। তো একটা ঠ্যাঙা নিয়ে উইয়ের বাসা ভাঙতে গিয়ে ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেল কৌটোটা। হাতে তুলে নিয়ে ভয় ভয় করল। তবু খুলে দেখলেন। আর দেখেই কপালে ঘাম ফুটে উঠল।

কে কবে ওখানে এভাবে লুকিয়ে রেখেছিল?

কী জন্য?

চুরির মতলবে? তাছাড়া আর কী? যাঁর জিনিস সেই কোনো কর্তা নিশ্চয় মইয়ে উঠে আংটি লুকনো খেলা খেলতে যান নি। চাকর বাকররাই কেউ অথবা রাজমিস্ত্রীরা কেউ হঠাৎ পড়ে থাকতে দেখতে পেয়ে—

যাকগে, কে রেখেছিল সে প্রশ্নে এখন আর দরকার কী?

যে পেয়েছে, সে ছুটে গিয়ে প্রায় আছড়ে পড়ে পাওয়ার ইতিহাসটি বলে ওনাদের কাছে দিয়ে দিয়েছে। সেটা সকাল বেলার কথা! দাবা খেলছিলেন কর্তারা। ওনারা সেটা দাবার ঘুঁটির কৌটোর মধ্যে রেখে দিয়ে বোড়ের চাল চালতে বসেছিলেন। তারপর আর তেমন খেয়াল ছিল না। নাওয়া খাওয়ার সময় হয়েছে বলে পরমেশ্বরীর তাড়ায় পাতানো ছক ফেলে রেখে নেমে গিয়েছিলেন। অতঃপর বোধহয় এই সান্ধ্য আসরে ফের সেটা নজরে পড়েছে। আর তখন থেকেই কথা কাটাকাটি। তা কথা কাটাকাটি তো

তো নয়, প্রায় লাঠালাঠি। হঠাৎই এক সময় চুপচাপ।

পরমেশ্বরী গরম কচুরির থালা আর চায়ের কাপ ট্রেতে সাজিয়ে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে দোতলার সেই মার্বেল মোড়া বারান্দায় এসে দেখলেন দুজনেই ঝগড়া থামিয়ে ফরাসের দুধারে দুমুখো হয়ে বসে আছেন।

দুজনেরই সেই একই সাজসজ্জা। এবং নাকি কাঁটায় কাঁটায় একই বয়েস। চুনট করা ধুতি গিলেকরা পাঞ্জাবী আঙুলে গোটাকতক করে আংটি। মেজেয় পায়ের কাছে পড়ে আছে হরিণের চামড়ার চটি দুজোড়া। সাজসজ্জা এক হলেও চেহারায় তারতম্য আছে। রাঘবেন্দ্রর রং ফর্সা হলেও ঈষৎ তামাটে। রাঘবেন্দ্রর গোঁফ এবং মাথার চুল দুইই বেশ ঠাসবুনুনি। এবং কলপে রঞ্জিত। বেশ লম্বায় চওড়া গড়ন।

কুলপতির রং এখনো প্রায় দুধে আলতা! মাথাজোড়া টাক, গোঁফদাড়ি কামানো। গড়ন মাঝারি।

রাঘবেন্দ্র আগে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখতেন, তবে বেশী পেকে যাওয়ায় দাড়ি নির্মূল করে ফেলেছেন।···কুলপতির মাথাজোড়া টাক সত্ত্বেও বয়েস অপর ব্যক্তির থেকে কম দেখায়। তবে হুঙ্কারে গর্জনে তিনিও কম যান না।

এখন অবশ্য দুজনেরই মুখে তালাচাবি।

পরমেশ্বরী এসে দেখেই হেসে ফেলে বলে ওঠেন, এবার মুখের তালাচাবিটা খোলা হোক। চা আর মাছের কচুরি আসছে!

কুলপতি ঝপ্ করে মুখ ফিরিয়ে বলে ওঠেন, সেটা আগে বলবে তো!

এই তো বললুম! · এই যে বলরাম, ঠিক জায়গায় রাখ।

বলরাম ট্রেটাকে একটা টিপয়ের ওপর বসিয়ে, সবসুদ্ধ ধরে এনে ফরাসের ধারে বসিয়ে রেখে আড়ে আড়ে তাকাতে তাকাতে চলে গেল।

পরমেশ্বরী বললেন, বড় রায়মশাই দয়া করে কচুরিতে থাবা বসান! ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রাঘবেন্দ্র মুখ ফিরিয়ে বসে গম্ভীর ভাবে বলেন, আগের ওই মুখুটি কথা দিক, আমার প্রস্তাবে রাজী, তবেই হাত দেবো।

কুলপতিও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ানো হাতখানা গুটিয়ে নিয়ে বলে ওঠেন, ঠিক

আছে। তবে আমারও ওই একই মত। শালা আমার কথায় রাজী না হলে—

পরমেশ্বরী বললেন, আবার ?

কুলপতি বেপরোয়া গলায় বললেন, শালাকে শালা বলব তার আবার ভয়টা কী ? একশোবার বলব শালা। সেই থেকে বলছি শালাকে, আংটিটা তোর পূর্বপুরুষের, এটা তোরই পরা উচিত। তবু গোঁ ধরে বসে আছে, 'তুই বাড়ির জামাই, দামী আংটি ফাংটি তোরই প্রাপ্য !' আমি বলছি কখনো না ! আইন কখনোই তোর গোড়ে গোড় দেবে না।

রাঘব রায় হুঙ্কার ছাড়েন। কী ? তুই আমায় আইন দেখাতে আসছিস ? আইন আমি কলা মানি। আমি বলছি আংটি বাড়ীর জামাই পরবে। না, পরবে না। বংশধর পরবে।

রাঘব রায় আর একবার ধমকে ওঠেন, বংশের বংশধর বলে ভারী আমায় তুই প্যাঁচে ফেলতে চাইছিস। বলি 'টুনটুনি' এ বংশের ছিল না ? আমি আর টুনটুনি এক নয় ? আর তুই টুনটুনির স্বামী হতিস না ?

কে বলেছে নয় ? সেই তোর প্রাণের বোন টুনটুনির সুবাদেই চিরজন্ম এই রায়বাড়িতে জামাই আদর খেয়ে চলেছি না ? তা বলে তোদের পিতৃপুরুষের স্মৃতি—এই তুমিই বল না হে পরমেশ্বরী, আমার যুক্তিটা ন্যায্য না ওই শালা রাঘব রায়ের যুক্তিটা ন্যায্য ?

কাঁটায় কাটায় একবয়সী দুই শালা ভগ্নিপতির মধ্যে পরমেশ্বরী যেন মধ্য-মণি ! 'আপনি' 'মশাইয়ে'র ধার ধারে না কেউ।

পিতৃমাতৃহীন পরম কান্তিময় আর পরম কুলিন বংশের কুলপতিকে নিয়ে এসে যখন রাঘব রায়ের বাবা বিক্রমেন্দ্র দশ বছরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করে রেখেছিলেন, কুলপতির বয়েস তখন হবে পনেরো। রাঘবও ঠিক তাই। অতএব দুজনের যা বন্ধুত্ব গড়ে উঠল, একদম হরিহর আত্মা। 'তুই তোকারি' তো চলবেই।

এমনই ভাবের বহর যে বিয়ের বছর দুই পরে দুজনে চুপি চুপি পরামর্শ করে 'সন্নিসী' হবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল। দিন আষ্টেক পথে পথে ঘুরে

যখন খিদেয় এবং ক্লেশে, আর শূন্য পকেটে একবস্ত্রে কাটিয়ে সন্নিসী হবার বাসনা শিকেয় উঠতে বসেছে, ঠিক তখনই বিক্রমেন্দ্রর দিকে দিকে বিছিয়ে দেওয়া লোকেদের মধ্যে একজন ধরে ফেলল ছেলে দুটোকে।

চেনা লোক মুকুন্দকে দেখে যদিও হাতে চাঁদ পেল দুজন। তবু ডাঁট দেখিয়ে বলল, আমরা সাধন ভজন করে ভগবানকে পাবো বলে বেরিয়েছি—আর ঘরে ফিরব কেন?

মুকুন্দ বলল, এই কদিনেই চেহারার যা হাল করে ফেলেছ, তাতে ভগবানকে পাবার আগেই পঞ্চত্ব পেয়ে যেতে। তা এখন ঘরে ফেরো তো। বাগানে আম পেকেছে, আর গুণধররা এই সময়টাই ভগবানের জন্যে নিজেদের বিকোতে বসবে?…চল চল বাড়িতে। খেয়েদেয়ে গায়ে জোর করে ধীরে সুস্থে সাধন ভজন কোরো। আর তোমারেও বলি খোকা, জামাইবাবু 'বে' করেছে, পরিবারের ওপর একটা কর্তিব্যো রয়েছে, তাকে তুমি ভাড়িয়ে নিয়ে সন্নিসী করতে বেরিয়ে পড়লে কোন্ আক্কেলে? তোমার বোনটার কথা একবার ভাবলে না?

মুকুন্দর কাছে ওই পর্যন্ত। বাপের কাছে কান মুলে স্বীকার করতে হয়েছিল রাঘব রায়কে, কাজটা তার গর্হিতই হয়েছিল।…প্ররোচনাটা তো তার দিক থেকেই বেশী ছিল।

সন্ন্যাসী হওয়া হলো না।

আষ্টেপৃষ্ঠে ঘরবাসী করবার জন্যে বাপ চটপট ছেলের বিয়ে দেবার মতলব করলেন। তবে মনের মতো কনে খুঁজতে কিছু দিন গেল। অতঃপর এই পরমেশ্বরী। রঙে একটু খুঁৎ দেখে—শাশুড়ী কিঞ্চিৎ খুঁৎ খুঁৎ করলেও, গড়নে পেটনে লাবণ্যে আর মুখশ্রীতে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল বৌ দেখে।

রাঘবের তখন কুড়ি বছর বয়েস। বৌ চোদ্দ।

পনেরো বছরের টুনটুনি বলল, ওই পুঁচকেকে আবার 'বৌদি' বলতে যাচ্ছি নাম ধরে ডাকব।

এই বড়ত্বর অহঙ্কার করবার কারণও জন্মেছে তখন। সন্তানসম্ভবা টুনটুনি নিজেকে অনেক বড় বলে ভাবতে শুরু করেছে।

দৌড়ঝাঁপ খেলার কাল গিয়েছে, কেবলই বলতো, আয় পরমেশ্বরী, চার-জনে তাস খেলি। দাদাটাকে ডেকে আন।

সেই তাস খেলার আসরে চারজনেই নাম ধরে ডাকের চলন। শুধু পরমেশ্বরীকে কেউ এবং পরমেশ্বরী কাউকে 'তুই' বলত না।

কী সুখেই কেটেছে সে দিনগুলো!

কিন্তু ক'দিনই বা সেই সুখের আসর বসেছে? কিছুদিন পরেই তো টুনটুনি নামের মেয়েটা পৃথিবীর আসর থেকেই বিদায় নিল। সন্তানের জন্মকালে মা ছেলে দুজনেই পৃথিবী ছাড়ল।...

কুলপতি তার শ্বশুর শাশুড়ীকে বলেছিল—আর কোন্ সুবাদে আপনাদের অন্ন ধ্বংসাবো? এবার আমি যাই।

শাশুড়ী কেঁদে ভাসিয়ে বললেন, ও কথা বোলো না বাবা! তোমাকে দেখে দেখে আমি টুনটুনির অভাব ভুলেছি। তুমি চলে গেলে, আমার পৃথিবী শূন্য হয়ে যাবে। তুমি আমার ছেলের জুড়ি! ছেলের মতন।

শ্বশুর বললেন, চলে যাব বললেই হলো? তোমায় আমি আবার বিয়ে দিয়ে সংসারী করে ছাড়ব তা জেনো।

কুলপতি হাত জোড় করেছিল।

ওটি বলবেন না। তাহলে থেকে যাওয়াও হবে না।

কেন বাপু, তোমার এই বয়েস। এতো বড়ো জীবনটা পড়ে রয়েছে—

কুলপতি বলল, জীবনটা যে কতটা বড় সে হিসাবই বা কে দিচ্ছে?

আগে শ্বশুরের সামনে মুখ তুলে কথা বলতো না। বৌ মরে যাওয়ার পর যেন সাহস বেড়ে গেছে।

বিক্রমেন্দ্র বললেন, ভালো জ্যোতিষী দিয়ে তোমার কোষ্ঠিপত্র দেখানো আছে। দীর্ঘায়ু যোগ।

কুলপতি দুঃসাহসে ভর করে বলেছিল, পরের ছেলের ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখিয়েছিলেন আর ঘরের মেয়েটার দেখান নি? দেখেন নি এই অকাল-মৃত্যু যোগটা?

বিক্রমেন্দ্র একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

দেখিয়েছিলাম বাবা! অকালবৈধব্য যোগ ছিল। তো—জ্যোতিষী যখন বলল, কোনো 'দুর্দান্ত বিপত্নীক যোগযুক্ত' ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলে ওটা কাটাকাটি হয়ে যেতে পারে।

কুলপতি একটু হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলেছিল, তাই ছিল নাকি আমার কুষ্ঠিতে?

ছিল বাবা!

কুলপতি হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠেছিল, তবে? জেনেশুনে আর একটা ভদ্রলোকের মেয়েকে খুন করতে বলেন?

আহা বার বার কী আর—

বৌ-মরা যোগ থাকলে বার বারই মরবে। আমায় ছেড়েই দিন।

শ্বশুর শাশুড়ী দুজনেই হাপসে পড়ে বললেন, তা' হবে না বাবা তোমায় আর কেউ জ্বালাতন করবে না। ছেলের মতোই কাছে থাকো। তোমার তো মা বাপ ভাইবোন কেউ কোথাও নেই। আপনজন বলতে ওই কাকা। তো তিনি তো—

একটু হেসে থেমে গিয়েছিলেন ওঁরা।

জানতে দেননি, কাকা তাঁর স্কুলে পড়ুয়া ভাইপোটি বাবদ কতখানি 'মূল্য ধরে' নিয়েছিলেন। তা নেবেন নাই বা কেন? মস্ত কুলিন নয় তাঁরা? যাকে বলে ফুলের 'মুখুটি।' তায় আবার ঘরজামাই করতে ছেড়ে দেওয়া।

তা এসব তো কোন্ আমাদি কালের কথা! কবে কোন্ ফাঁকে যে সেই কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে দুটো এই প্রায় সত্তরে এসে পৌঁছে গেল, কেউ খেয়ালই করেনি।

এ সংসারটিতেও তেমনি কত ভাঙা কত পরিবর্তন। কর্তা গিন্নী গত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ প্রাসাদখানা জুড়ে কত কত যারা ছিল তারা যেন চটপট কোথায় উপে গেল। উপে গেল রাজাদের রাজগিরি স্বাধীন সরকারের একটি কলমের খোঁচায়। পাঁচপুরুষের রাজবাটির জীর্ণ দশা ঘটতে ঘটতে

শেষ অবস্থা। মেরামতের পয়সা নেই, মেরামতের উৎসাও নেই। প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এই ভগ্নদশাগ্রস্ত বাড়িতে যে তিনটে বুড়োবুড়ি এখনো যৌবনের মানসিকতা নিয়ে আর রাজাই মেজাজ নিয়ে রাজার হালে বাস করছে, তারা মরে যাবার পর তো সব চুকেই যাবে। বাড়িতে বাস করবে 'চামচিকে আর ছুঁচোরা।'

তবে? তবে আবার জীর্ণ বাড়ি সংস্কারের চিন্তায় ক্লিষ্ট হওয়া কী আহাম্মুকিতে? বাড়ির এ অংশটা বাসের অযোগ্য হয়ে গেছে? ও অংশটায় গিয়ে আস্তানা গড়ো। অগাধ ঘর বারান্দা দালান সিঁড়ি, কত লাগবে তিনটে প্রাণীর?

তা এদের সঙ্গে অবশ্য সমানভাবে রয়ে গেছেন সরকারমশাই শিবশম্ভু পাল। তাঁরই বা কে আছে? জন্ম হাঁপানি রুগী লোকটা বিয়েই করে নি সাহস করে। কর্তাদের আমলে বসবাস করতো 'কাছারি বাড়িতে'। সেটির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটলে এই 'রাজবাটির মধ্যেই কাছারি' ঘর স্থাপন করে বাস! দুবেলা ভেতর বাড়িতে এসে খেয়ে যান। নিষ্ঠাবান মানুষ, নিরামিষাশ্রী! শ্রীনাথের মার হেঁশেলের সদস্য তিনি। তিনিও নিষ্ঠাবতী বিধবা, ব্রাহ্মণ কন্যা। তিনি অবশ্য একালের আহরিত। আর আছে বলরাম ভুবন এবং নিরাপদর পিসি। সকলেই হালের লোক। তবে সংসারের হালটা ভালই ধরতে পারবে।

আসল কাণ্ডারী অবশ্যই পরমেশ্বরী রায়।

যিনি এখন পর্যন্ত এদের দিয়েই নিঃশব্দে দুই অবোধ বৃদ্ধকে সাপ্লাই করে চলেছে অম্বুরি তামাক, চন্দ্রকোণার ধৃত হরিণের চামড়ার চটি। এবং রাজকীয় নৈবেদ্য! যদিও—'আয়ের ঘর' গুলো ক্রমেই শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছেছে। নেহাৎ 'বড় গোলার তলা' তাই।

পরমেশ্বরী বললেন, কার যুক্তিটা ন্যায্য, সেটা ভাবতে সময় লাগবে। ততক্ষণ হাত চলুক। কচুরি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভীষণ রেগে যাবো। কই দেখি আর একবার আংটিটা।

সরকার মশাই আগেই পরমেশ্বরীকে দেখিয়ে ছিলেন। এবং তাঁর নির্দেশেই

কর্তাদের কাছে গচ্ছিত করে গেছলেন।

—কৌটো খুলতেই জিনিসটা যেমন ঝলসে উঠল। কে বলবে কত যুগ যেন আগের। সোনাটাও সমান ঝকঝকে।

পরমেশ্বরী বললেন, সেকেলের জিনিসই ছিল আলাদা একদম পিওর খাঁটি এখনকার খাঁটি সোনাতে কী এমন জেল্লা ফোটে?

তারপর বললেন, পাল্লাটার বা এখন কত দাম কে জানে।

আচ্ছা, দাম কষা হোক পরে। ওটা নিয়ে তো পোদ্দারের বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না। রায়টা বেরিয়ে যাক।

হুঁ।

পরমেশ্বরীর নিখুঁত মুখে কৌতুকের ঝিলিম দেখে মনে হচ্ছে জিনিসটা জামাইয়ের হাতেই শোভা পাক। তবে—

কথা শেষ হবার আগেই কুলপতি চেঁচিয়ে ওঠে, এই পরমেশ্বরী, খবরদার। পরমগুরু পতিদেবতার দিকে ঝোল টেনে কথা বলবে না বলছি। আমি যা বলেছি তাই ঠিক।

পরমেশ্বরী হেসে বলে, আরে বাবা কথাটাতো শেষ করতেই দিলে না। বলছিলাম না 'তবে—!' হ্যাঁ তবে জিনিসটা যখন বংশের কোনো পূর্ব পুরুষের। তখন বংশধরের আঙুলেই ওঠা উচিত মনে হয়।

জানতাম।

রাঘব রায় বলে ওঠেন, জানতাম এই পরমেশ্বরী ঠাকরুণ তাঁর সোহাগের ঠাকুর জামাইয়ের কোলেই ঝোল টানবেন। তার গোড়েই গোড় দেবেন। এ রায় মানছেটা কে?

পরমেশ্বরী হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠে বলে, রায় যদি দুপক্ষরই পছন্দ না হয়, তাহলে সম্পত্তিটা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাক। এ আংটি আমিই নিয়ে নিই। সমস্যার সমাধান হয়ে যাক।

বলে নিজের আঙুলে পরেন।

কিন্তু খুব টনটন করে।

দুজন পুরুষই বলে ওঠে, আহা এ সমাধান কী আমাদেরই মাথায় আসে নি?

তো ওই ঢাউস মাপ দেখেই—কাটিয়ে কুটিয়ে মাপসই করতে গেলে হয়তো দামী পাথরটা—

পরমেশ্বরী বলে ওঠে—কাটিয়ে কুটিয়ে কী গো ? এ কী বস্তু দেখেছ ? তা ও আবার কার কে জানে। কোনো অশরীরী আত্মা হয়তো সে কাণ্ড দেখে রেগে মেগে আমার গলাটাই ক্যাঁচ করে কেটে দেবে। ঠিক আছে, এই বুড়ো আঙুলটায় আটকেছে।

বলে আংটিটাকে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে পরিয়ে ফেলে সে আঙুলটা বাড়িয়ে বলে, কলা কলা। এইবার তুই ঝগড়ুটে বুড়ো বাঘ কী নিয়ে ঝগড়া করে দেখি!

পরমেশ্বরী, অবজেকশান। অবজেকশান।

কুলপতি বলে ওঠে, আবার তুমি 'ঝগড়া' বলছ আর 'বুড়ো' বলছ!

পরমেশ্বরীর মুখের ওপর বিদ্যুৎ বাতির ঝলক। বছর তুই হলো রাজনগরে বিদ্যুতের আলো এসেছে। সরকার মশাই তোড়জোড় করে 'রাজবাটিতে' আনিয়ে ফেলেছিলেন।

কর্তারা বলেছিলেন, আর কেন সরকার ? যেমন চলছে চলুক না।

আজ্ঞে রায়মশাই কেরোসিনের বড় অপ্রাচুর্য। আপনার গিয়ে ঝাড়বাতির যুগ্যি জোগাড় করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কিন্তু এই দাবার সান্ধ্য আসরটিতে ঝাড়বাতির আলো ভিন্ন তো মানাত না! ইলেকট্রিকের আলো সে স্থান পূরণ করেছে।

পরমেশ্বরী যেখানে বসেছেন সব আলোটা তাঁর মুখেই এসে পড়েছে। সেই আলোয় উদ্ভাসিত মুখ তাঁর। পরমেশ্বরী বললেন, 'ঝগড়াটাকে' 'প্রেম' আর বুড়োকে 'যুবো' বলতে যাব নাকি ?

কুলপতি বলে ওঠে, আলবাৎ বলবে। রাঘব তোর পরিবারকে বল কথাটা 'উইথড্র' করে নিতে। এখানে কেউ বুড়ো নেই। এখানে 'প্রেম' ছাড়া আর কিছু নেই।

নিশ্চয় তো।

রাঘব রায়ও সোৎসাহে বলেন, কুলপতির কথা হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট।

পরমেশ্বরী তোমার কথা প্রত্যাহার কর।

ইস। কথা প্রত্যাহার করতে আমার দায় পড়েছে। তোমার প্রাণের বন্ধু যখন বলে 'শ্যালা'কে শালা বলব তাতে ভয়টা কী? তখন? এখানে কেউ বুড়ো নেই? আহারে। তো তোমার দুই বুড়ো খোকা যদি খোকাই থেকে থাকো তো থাকবে। এই পরমেশ্বরী বামনী বিলকুল বুড়ো হয়ে গেছে।

এই খবরদার।

কুলপতি বলেন, এ কথা আর নয়।

আহা! আর নয়। বলি দুজনের চার চারটে চোখ তাকিয়ে দেখতে পাও না পরমেশ্বরীর মাথার চুলগুলো যেন চুণকাম হয়ে গেছে।

কিন্তু পাকাচুলের নীচে আশ্চর্য রকমের কাচা। যে মুখটাকে রাঘব রায় তরুণ বয়েসে বলেছিল, ঠিক ডাঁসা পেয়ারার মতো।

সত্যি স্রেফ ডাঁসা পেয়ারা। দেখলেই কামড় দিতে ইচ্ছে করে।

সেই সুডৌল মুখটি কিন্তু তেমন কিছু বদলায় নি। হয়তো বন্ধ্যানারীর দেহ সৌন্দর্য অদৃশ্য একটি রিজার্ভ ফাণ্ডে রক্ষিত থাকে। তাঁর ষাট পার হবার পর থেকেই চুলে পাক ধরতে শুরু করেছিল। তার পরও তো বছর দুতিন পার হয়ে গেল।

একটু অবশ্য অতিশয়োক্তি করেছেন পরমেশ্বরী। মাথায় অর্ধেকটা 'চুণকাম' হয়ে যায় নি। তবে রগের দুটো পাশ গেছে।

বলরাম এসে খালি কাপডিশ রেকাবি উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।

পরমেশ্বরীর এ সময়টা তেমন কোনো কাজ থাকে না। তিনি এ সময় এই ফরাসের একাংশে বসেন খানিকক্ষণ। তখন আব দাবার ঘুঁটি চলে না, চলে কথার ঘুঁটি। আর মজা—এই সবদা বিবদমান দুটি পুরুষ একা মেয়েটার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লড়ে যেতে আঁতাত পাতিয়ে বসে।

কুলপতি বলেন, পরমেশ্বরী, শখ করে মাথায় হোয়াইট ওয়াশ করে বাহাদুরি দেখানোর কি দরকার?

রাঘব রায়ও বলেন, ঠিক বলেছিস কুলপতি, বাহাদুরি দেখাবার জন্যই কিছু একটা করে বোধহয়।

পরমেশ্বরী হেসে গড়িয়ে পড়ে বলেন, তোমরা যেমন 'ব্ল্যাক ওয়াশ' করো? হি হি। কত শিশিই পার করলে তুই মানিক জোড়।

তো তুমিও জিনিসটা কাছে রাখ না। কটাই বা পেকেছে! ম্যানেজ করে ফেলা কোনো ব্যাপারই নয়।

হ্যাৎ, ম্যানেজ করতে যাবই বা কেন? বয়েস হয়েছে চুল পাকবে না?

কুলপতি বলে ওঠেন, পাকবে তো পাকবে। সেটা গৌরব করে দেখিয়ে বেড়াবার কোনো কারণ নেই! চালশে ধরলে লোকে চশমা পরে কেন? কাল থেকে তুমি আমাদের প্রসেসটা ধরবে। বুঝলে?

গলায় দড়ি! এখন লোকসমাজে হঠাৎ কাঁচা চুলের শোভা নিয়ে বাহার দেবো কেমন? লোকে কী বলবে?

রাঘব রায় বলে ওঠেন, আমাদেরই ভুল হয়ে গেছে রে কুলপতি। নিজেদের দিকেই নজর দিয়েছি। তোকে অবিশ্যি বলার কিছু নেই। মাথার বারো আনাইতো গড়ের মাঠ। আমারই উচিত ছিল—

কুলপতি বিষণ্ণ ভাবে বলেন, শুধু তোর ঘাড়ে দোষ দিয়ে নিজে মাছের মাঝখানি হয়ে থাকাটা তো ন্যায্য নয়। অথচ পরমেশ্বরী যুক্তিটাও ফেলা যায় না। একবার সবাই দেখে ফেলার পর আর অবিশ্যি—বাড় বাড়তে না দেওয়া যায়। এখনো মুখটা সমান সুন্দরই দেখাচ্ছে।

রাঘব রায় বললেন, তা যা বলেছিস। এখনো প্রায় ডাঁসা পেয়ারা। তো পরমেশ্বরী, চুণকামের অগ্রগতিটা বন্ধ করতে হবে।

কাঁচকলা হবে। আমার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। ছাড়ো তো ওসব কথা। বলি কচুরিটা কেমন হয়েছে তা তো বললে না কেউ।

ও আর নতুন করে কী বলব বল? যা রাঁধো, যা খাওয়াও সবই তো অমৃততুল্য।

কুলপতি বলে ওঠেন, যা বলেছিস রাঘব। ওই অমৃততুল্য খেয়ে খেয়েই আমাদের আর বয়েস বাড়ে নি। যে বয়সেই ছিলাম সেই বয়সেই থেকে গেছি। কিন্তু তুমি কেন আমাদের সঙ্গে একটু খাও না বল তো? এতো ফার্স্ট ক্লাশ হয়—

আহা ! আমার যেন ঠাকুর ঘরে ঠাকুর শয়ান দিতে হবে না !

রাঘব রায় ভুরু কুঁচকে বলেন, আচ্ছা এসব আগে ঠাকুরমশাই করতেন না ?

তিনি আর এত রাতে আসতে চান না। সন্ধ্যের আগেই ঘণ্টা নেড়ে চলে যান। বয়েস হয়েছে তো।

তা তখনই তোমার রাধাকেষ্টকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যান কেন ?

পরমেশ্বরী একটু হেসে বলেন, ঠাকুরকে অত বেশীক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখতে নেই !

এইভাবেই কথা বলতে বলতে রাত হয়ে আসে।

পরমেশ্বরী একসময় উঠে পড়ে বলেন, যাই। এরপর তো খাওয়ার সময় হয়ে যাবে ! তোমাদের এই দুই বামুন বুড়োর তো সন্ধ্যে আহ্নিক গায়ত্রী জপ কিছুরই বালাই নেই। ততক্ষণে এই রাজবেশটি ছেড়ে রাখালবেশ ধারণ করে খাবার ঘরে চলে আসার ব্যবস্থা করো !

কুলপতি বলে ওঠেন, ওহে পরমেশ্বরী রায়। বলে যান তো ওই সব 'সন্ধে আহ্নিক গায়ত্রী ফায়ত্রী' করে কী হয় ?

ও বাবা ! এর উত্তর দেবো আমি ? এ যাবৎ কাল তো সৎ ব্রাহ্মণেরা ওসব করে এসেছেন দেখেছি। তবে এখন তো বেশীর ভাগই তোমাদের মতো পৈতে পুড়িয়ে ভগবান। বলি পৈতে গাছটা সত্যিই পুড়িয়ে ফেলেছে, না আছে।

কুলপতি বলেন, আছে বাবা আছে। সত্যি পুড়িয়ে ফেললে তুমি যদি আবার বলে বসো, ওই পাপিষ্ঠের মুখ দেখব না !

রাঘব রায়ের কুলপতির মতো এতটা বাকচাতুর্য নেই। তবে সায় দিয়ে যান। এখনও বললেন, সেই ভয়েই তো—

পরমেশ্বরী হাসতে হাসতে চলে যান।

আর তখনই কুলপতি বলে ওঠেন, রাঘব সকালে তুই একটা জোচ্চুরি করেছিলি, কাল তার শোধ পাবি বুঝলি ?

কী ! জোচ্চুরি করেছিলাম ?

করেছিলিই তো। ফস করে নৌকোটাকে আড়াই ঘর চালিয়ে বসেছিলি !

তো তখন যে বড় বলিসনি ?

ক্ষ্যামা ঘেন্না করে দেখেও না দেখার ভান করেছিলাম।

বটে। ক্ষ্যামা ঘেন্না! কালকের মতো অবস্থা করে 'দাবা' সাজায়ি বলে দিচ্ছি।

ঠিক সেই রকম ? ফটো তুলে রেখেছিলাম না কী ? তোর বৌ ঠিকই বলে 'বুড়ো খোকা'।

তোকেও বলে।

সেটা আদর করে।

ওঃ। ভারী আমার পেয়ারের ঠাকুর জামাই রে। নয় তো কী ?

ঠিক আছে। আমি এবার দেখাচ্ছি। 'বুড়ো খোকা' বলা বার করছি।

ওকে তুই এঁটে উঠতে পারবি ? বাতাসকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে পারিস ?

রাঘব রায় হো হো করে হেসে উঠে বলেন, যা বলেছিস রে কুলপতি। আচ্ছা একখানা মেয়ে জন্মেছিল বটে! আর সবাইকে নাকে দড়ি দিয়ে চরাবে, কিন্তু নিজে কোনো দড়িদাড়ার মধ্যে যাবে না।

সিঁড়ির ধারের একটা ঘরে পরমেশ্বরীর নিজের শখের রাধাকৃষ্ণ। পূর্বকালে দোল দুর্গোৎসব ছিল, সে সব কবেই উঠে গেছে। কর্তাদের আমলেই। গৃহদেবতা বললে 'শালগ্রাম শিলা' তার স্থান ভেঙে পড়া ঠাকুরদালানেরই একাংশে। ওই অংশটুকুই অটুট আছে। তাঁর পূজো করে দিয়ে যান 'ঠাকুর মশাই।' আর রাধাকৃষ্ণের ভোগটাও দিয়ে যান। বাকি যা কিছু পরমেশ্বরীই করেন। আর রেগে রেগে বলেন শাস্ত্রের বিধানটি দেখো! বামুনের ঘরে জন্মেও মেয়ে বলে ঠাকুরের ভোগটি দেওয়া চলবে না। ওই চালকলা বাঁধা বামুনটিকেই চাই।

রাঘব রায় বলেছিলেন, ওইসব পচা শাস্ত্র যারা মানতে যাবে, তারা ভুগবে। তোমার ঠাকুর তুমি পূজা করবে, তাতে কে কী বলতে আসবে শুনি ?

পরমেশ্বরী একটু হেসে বলেছিলেন, বাইরের কেউই কিছু বলতে আসে না। আসে নিজের ভেতরের সংস্কার। এটা ঠিক নয়, ওটা উচিত নয়, এই সব

বিধি নিষেধ দিয়েই তো ভেতরটা গড়া। যা ভালো লাগে, যা ইচ্ছে হয়, তাই করতে বসলে তো 'মানুষ' বলে কিছু থাকে না। পাখি পক্ষী হয়ে যায়।

তাই পরমেশ্বরী শাস্ত্রবিধি মেনে চলেন তার বাইরে যেটুকু বিবেকে সংস্কারে না বাধে, সেটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট।

ঠাকুরের খাট বিছানা মশারি ঝালরে-দেওয়া বালিশ। ছোট খাটের যুগল মূর্তিটির উপযুক্ত শৌখিন ব্যবস্থা।

'শয়ান' দেবার পর চামর ব্যঞ্জন করে মশারি ফেলে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, হঠাৎ একটি মৃদু গম্ভীর ডাক শুনে চমকে উঠলেন।

পরমেশ্বরী!

চমকে উঠেও সামলে নিলেন।

এই হয়ে গেল। যাচ্ছি। রাত হয়ে গেল তো বামুনদি এতক্ষণ—

আমি খাবার তাগাদা দেবার জন্যে এসেছি?

পরমেশ্বরী বললে, তাহলে বুঝি আমার ঠাকুরের আজ কপাল ফিরল? দর্শনে এসেছ?

সব সময় তুমি এমন ঠাট্টা কর পরমেশ্বরী, বলবার কথাগুলো বাতাসে ভেসে যায়।

আচ্ছা এই গম্ভীর হলাম। বল কী বলবে?

বলছি—আমি যদি ওই সব সন্ধ্যে আহ্নিক গায়ত্রী টায়ত্রী করি তুমি খুশি হবে?

ওমা! শোনো কথা, আমার খুশির জন্যে গায়ত্রী? সেই দেবিটি শুনতে পেলে কী মনে করবেন বল তো? ছি! ছি!

আমি ওসব ছি ছি বুঝি না।। তুমি খুশী হবে কিনা সেটাই শুনতে চাই। খুশী হবে?

মাথা খারাপ! যাকে যা মানায় তার বাইরে কিছু করতে আছে? না বাপু। তুমি হঠাৎ পট্টবস্ত্র পরে গায়ত্রী মন্তর জপতে বসলে হেসেই মরে যাব।

তাহলে বলছ ওসব আমায় মানায় না?

উঁহু।

কুলপতি ঠাকুর ঘরের দরজার খুব কাছে এসে বলে, তোমায় কিন্তু এই লালপাড় পট্টবস্ত্রটি পরে ভারী মানায়। দেবী প্রতিমার মতো লাগে।

পরমেশ্বরী মুখ টিপে হেসে বলেন, সেই জন্যেই তো এই ঠাকুর-টাকুর! মানানোর জন্যে!

ধ্যাৎ!

তাছাড়া আর কী?

পরমেশ্বরী অদ্ভুত একটা হাসির আলো মুখে ছড়িয়ে বলেন, ঠাকুরকে ভালবাসাটা ছল। আসলে নিজেকে? ভালবাসা। আমাকে সুন্দর দেখাবে মহৎ দেখাবে, ভক্তিমতী দেখাবে, এইসব বাসনাতেই তো—

তুমি এক এক সময় এমন সব কথা বল। গায়ে কাঁটা দেয়।

এই মেরেছে! চলো চলো। এটা পেটজ্বলার লক্ষণ। বড়বাবু নীচের তলায় নেমেছেন?

সকালের দাবা বসেছে।

এখন জোর বিক্রম। এ সময় পরমেশ্বরীর সময় নেই যে, গিয়ে পড়ে ব্যাঘাত ঘটাবেন। নীচের দালানে বসে কুটনো কুটছিলেন। সরকার মশাই এসে দাঁড়ালেন। ধারেকাছে আর কেউ নেই।

বৌমা!

পরমেশ্বরী চোখ তুলে তাকালেন।

বলছিলাম, হরিণের চামড়ার চটি তো আর মিলছে না। আপনি বলেছিলেন আগে থেকে জোগাড় রাখতে। তো বরাবর যে লোকটা সাপ্লাই দিয়ে আসছে সে বলছে এখন আর ওটার চলন নেই।

কেন বলুন তো? দেশে সৌখিন মানুষ আর নেই?

থাকবে না কেন? খুব আছে। তবে শখের ধরন বদলেছে। এখন বাড়িতে পরতে—উঁচু থেকে নীচু গরীব বড়লোক ইতর ভদ্দর সব ওই হাওয়াই চটি।

দু চক্ষের বিষ! তাহলে বলছেন ওই হরিণের চামড়া আর মিলবে না?

একেবারে 'মিলবে না', তা বলছি না। চেষ্টা করলে অবিশ্যিই মিলতে পারে। তবে শুনলাম তেমন চল্ আর নেই। কে, নাকি কটক থেকে আনিয়েছে। ওড়িষায় খুব চলন।

তো খোঁজ নিয়ে দেখুন না আপনার ওই হাওড়া বাজারেব কারুর কেউ শ্রীক্ষেত্রের কাছে-টাছে থাকে কিনা। একসঙ্গে জোড়া চারেক এনে দেবে।

সরকার শিবশম্ভু ঘোষাল একটু বিষণ্ণ মুখে বলেন, কিন্তু বৌমা, এভাবে আর কতদিন চলবে?

পরমেশ্বরী একটু বিব্রত হাসি হেসে বললেন, দেখি ঠাকুর কতদিন চালান। ওই দুই পাগলকে এইভাবে ভুলিয়ে রেখে আপনার কী লাভ হচ্ছে আপনিই জানেন!

পরমেশ্বরী হেসে উঠে বলেন, সে তো ঠিক সরকার মশাই। কার কিসে লাভ সেটা সেই জানে। এই যে আপনি! মাইনে পত্তরের বালাই নেই, খাটুনিরও শেষ নেই, তবু এই রায়বাড়ির ভাঙা দেউলে পড়ে আছেন। কী লাভ হচ্ছে আপনার?

শিবশম্ভু মাথা নীচু করে বলেন, আপনার কাছে তো বরাবরই কথায় হার মানি না। তো যাক, আজ একবার হাওড়া বাজার থেকে কলকাতায় বড়-বাজারটা ঘুরে আসতে হবে। তামাক ফুরিয়েছে। গোলাপজল ফুরিয়েছে। গোলাপজলটা গড়গড়ার জলে মিশোতে লাগে। তারও নিয়মিত জোগান রাখতে হয়।

পরমেশ্বরী গলার স্বর নামিয়ে বললেন, আমি বলছি কী, আপনি মনস্থির করে ফেলুন। দোল দুর্গোৎসব তো আর হবে না কোনোদিন এ ভিটেয়। ওই রুপোর সিংহাসন 'কাটরা' এসব রেখে আর কী হবে? শেষ অবধি তো চোরডাকাতের ভোগে যাবে। বলে রেখেছেন কার্তিক স্যাকরাকে?

বলেছি সে ব্যাটা তো একপায়ে খাড়া। রুপোর দাম তো এখন আকাশছোঁওয়া। এখানে সিকি দামে নেবে। যেমন করে রুপোর বাসনের গাদা একে একে—

শিবশম্ভু একটু থামলেন।

গলাটা ঝেড়ে বললেন, অবশ্য বলেছেন আপনি ঠিকই। শুই মাটির নীচের

পোঁতা সিন্ধুকের গুণেই এখনো লুঠ হয়ে যেতে পারে নি। তবে ও সিন্ধুক খোলার ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে মা! ওই তালা খুলতে এখন ঘাম ছুটে যায়। অথচ আর কাউকেও তো বিশ্বাস করে বলা যায় না।

পরমেশ্বরী রহস্যের ব্যঞ্জনাময় মুখে বলেন, আর বেশী দিন কী খোলবার দরকার হবে সরকার মশাই? সাফ হয়েই তো এসেছে।

সরকার মশাই চোখের জলকে সজোরে চোখের মধ্যে আটকে রেখে বলেন, সেকথা ঠিক। তবে এই একই স্টাইলে চললে! মানে বাজার ক্রমেই আগুন হয়ে উঠছে তো? যে তামাক আগে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকায় কিনেছি, সেই তামাকই ত্রিশ বত্রিশ। তবু তেমন কোয়ালিটি আজকাল বাজারে মেলেই না।

পরমেশ্বরী আবার একটু অদ্ভুত হাসি হেসে বলেন, তেমনি আমার শ্বশুর যে সোনা দিয়ে মুড়ে বৌ ঘরে এনেছিলেন সে সোনার ভরি ছিল ষাট টাকা। শুধু ষাট! মাথা থেকে পা অবধি মুড়ে এনেছিলেন তো? এখন—সোনার ভবি কত যাচ্ছে সরকার মশাই? সাড়ে তিন হাজার না কত যেন বললেন সেদিন?

শিবশম্ভু বেজার বিরস মুখে বলেন, সেটা কেনার সময়। বেচবার সময় হয়তো দু হাজারে নামবে।

তা সে তো হবেই। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বলে কথা।

সোনার আবার 'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড'। ওই হারামজাদা কাতিকটা হচ্ছে মহা চশমখোর। ওর বাবা নীলমণি ছিল ধর্মভীরু। আর এই রাজবাড়ির প্রতি কত শ্রদ্ধাসমীহ ছিল। এ ব্যাটার সেসব কিছু নেই। কিন্তু মুশকিল কী জানেন? কাঁসা পেতল তামা পর্যন্ত ঠিক আছে। সোনারুপো নিয়েই ভাবনা। বাইরে কোথাও ছাড়তে গেলে, এই বুড়োকে চোর বলে পুলিশে দিতে চাইবে। তাই ওই চিরকেলে নীলমণির দোকানই ভরসা। নীলমণি গিয়ে অবধি—

পরমেশ্বরী বললেন, কী আর করা যাবে? যখন কাতিক ভিন্ন গতি নেই তখন দাঁও তো মারবেই।

জেনে বুঝে ঠকতে হবে, এই আর কী।

পরমেশ্বরী বললেন, সরকার মশাই ভেবে দেখুন, জেতবার পথ আর কোন্‌-দিকে আছে?···কর্তারা নিজেরা গিয়ে উচিতমতো দরদাম করে ঘরের সোনা বেচতে যাবেন, এমন আজগুবি চিন্তা করবেন না।

সরকার বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন, 'না, তা করব না।'

তবে? ওইসব ঝাঁপটা সিঁথি মুকুট সাতনরি বলতে গেলে সের কতক সোনা আমি কি আবার অঙ্গে চাপাব? বলুন? তা তো চাপাব না! তাহলে? রেখে যাব কার জন্যে? চোরে যদি নাও নেয়, ওই মাটির নীচে পড়ে পড়ে মাটি হবে। এই তো? তার থেকে ভোগে লাগাই ভালো। তাই নয় কী?

সরকার মশাই এই অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন না। সত্যিই তো কার জন্যে তুলে রাখবেন? নিঃসন্তান নারীর এই বেদনা অনুভব করেন তিনি। তারপর আস্তে বলেন, বলেইছি তো আপনার কাছে কথায় জিতি এমন ক্ষমতা নেই এই বুড়োর। তবে ওই গহনাগুলোর নাম বললেন যখন—চোখের ওপর একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। পালকীর সঙ্গে সঙ্গে হন-হন্নিয়ে আসছি, আর দেখতে পাচ্ছি ওই সব গহনা মোড়া একটি মেয়ে পালকী থেকে একটু মুখ বাড়িয়ে দেখতে দেখতে চলেছে।

পরমেশ্বরী বিষণ্ণতার ভারী বাতাস সইতে পারেন না। তেমন অবস্থা ঘটলেই পরিহাসের জোর বাতাস তুলে উড়িয়ে দেন সেই ভারীকে। অতএব হেসে উঠলেন, সে রাম নেই আর সে অযোধ্যাও নেই সরকার মশাই। তবে ভগবানের অশেষ দয়ায় আপনি আছেন, তাই এই রায়বাড়ির বৌয়ের এত লপচপানি চলছে। আপনি না থাকলে যে কী দশা হতো আমার।

সেই বারান্দা, সেই ফরাস সেই অম্বুরি তামাকের সুরভিত ধোঁয়ায় বাতাস মায়াময়। আজ আর দাবা পড়েনি। আলোও জ্বলেনি। চাঁদের আলো এসে আরো মোহময় করে তুলেছে জায়গাটা। মাঝে মাঝে দুটো গড়গড়ার মৃদু ধ্বনি!

একসময় নিস্তব্ধতা ভেঙে রাঘবেন্দ্র বললেন, আচ্ছা কুলপতি, আমরা যে

উনসত্তরে পা দিলাম একথা ভাবলে তোমার অবাক লাগে না ?
কুলপতিও বুড়বুড়ি থামিয়ে বললেন, বিশ্বাসই হয় না।
অথচ অস্বীকার করার তো উপায় নেই। এতগুলো বছর কোথা দিয়ে যে কেটে গেল।
কুলপতি একটু চুপ করে থেকে বলেন, আবার ভাবতে বসলে অনেক ইতিহাস। কর্তার জীবিতকালের সময়টা ভাব ? কেবল ছটফটিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ার ছুতো আবিষ্কারের চেষ্টা। আমাদের সেই 'ব্যবসা' করার চেষ্টা মনে আছে ?
রাঘব হেসে বলেন, তা আবার মনে নেই ? প্রথমে গেঞ্জির কল, তারপর 'পেপার মিল', তারপর 'অর্ডার সাপ্লাইয়ের' ধান্ধা ! আর বাবার কাছ থেকে টাকা হাতাতে পরমেশ্বরীর কাছে ধর্না দেওয়া।
হো হো হাসি দুজনেরই।
যাই বলিস পরমেশ্বরীটাকে বাবার সামনে ঠেলে দিয়ে খুব গা বাঁচিয়েছি আমরা।
কুলপতি !
কী ?
আর সেই 'হেয়ার অয়েল' তৈরির ফরমূলা আবিষ্কার ?
এই মরেছে ? তুই যে দেখছি ক্লাইভের আমলের স্মৃতিগুলোও মনে রেখেছিস। ওঃ সে কী উৎসাহ ! 'কুন্তলীন'-এর মতো একখানা মারকাটারি জিনিস হবে।
রাঘব বললেন, উৎসাহ আরো বাড়ল যখন পরমেশ্বরী বলল, 'আমাকেও তোমাদের পার্টনার করে নাও।'
কুলপতি একটু আস্তে বললেন, তো তুই শালা তাই নিয়ে বেচারাকে কম জ্বালাসনি। নেহাৎ না কী অতি শক্ত মেয়ে, তাই সামনে হেসে হেসে তাল দিয়ে গিয়েছিল। অন্য মেয়ে হলে কেঁদে ভাসাতো।
রাঘব রায় একটু ভেবে বললেন, ওইখানটা ঠিক মনে করতে পারছি না। ব্যাপারটা কী হয়েছিল ?
আরে, ভুলে গেছিস ? ওই যে বলেছিল 'তোমাদের পার্টনার করে নাও।'

তুই ক্ষ্যাপাতে শুরু করলি, অ্যাঁ। তোমার মনে মনে এই? শুধু আমার একারই পার্টনার বলে নিশ্চিন্ত আছি। তো দুজনের পার্টনার হলে শেয়ারটা কী ভাবে ম্যানেজ করা যাবে?

ও হো হো। মনে পড়েছে। তখন বাবা নেই, না?

না। তার কিছুদিন আগে দেহরক্ষা করেছিলেন। তা তোর তো বাবা, তোর কথা আলাদা। শ্বশুর পরমেশ্বরীর শ্বশুর। কিন্তু আমি ব্যাটার আর কতই বা লেগেছিল। বলতে গেলে শ্মশানবৈরাগ্য! দুর! আর থাকব না। ছেলের মতো ভালোবাসতো লোকটা। তাছাড়া আর কার সুবাদে থাকব! তো সে চিন্তা তো দুদিনেই মিলিয়ে গেল। কিন্তু পরমেশ্বরী সত্যিই পিতৃশোকের মতন কষ্ট পেয়েছিল। বলত, সবসময় যেন মনে হয় কোথা থেকে ডাক আসছে 'বৌমা'···তো উঠতে বসতে তো 'বৌমা'।

তো সেই তেলটার নাম মনে আছে তোর মুখুটি?

মনে থাকবে না? নামটা আবিষ্কার করেছিল কে?

তুই। তাই না? মনে পড়েছে 'পরমা' কেশ তৈল। যদিও তাতে পরমেশ্বরী রাগারাগি করেছিল। বলেছিল এ আবার কী? আমার নাম থেকে খানিকটা চুরি করার মানে? আর তার জবাবে তুই বললি, 'মানেটা হচ্ছে দেশসুদ্ধ লোক তোমায় শিরোধার্য করে বেড়াবে।' কিন্তু শেষ অবধি কী হলো বলো তো?

কী আবার? যা সব কিছুতেই হয়েছে। ফেলিওর। চললো না। তেলের অশেষ অগুণ বেরোলো। মাখলে চুল ঝরে পড়ে, মাথায় চিট্ পড়ে, বালিশে এমন লালচে ছাপ পড়ে ধোপ খেয়েও উঠতে চায় না। এই সব। তাই নিয়ে পরমেশ্বরীই ঠাট্টা করে ছড়া বানিয়ে ফেলল; দাম তিন টাকা। '···যেই কেশে মাখো কুন্তলীন, পানে খাও তাম্বুলীন' এর ছাঁচে—আর কী! তোর কী মেমারী রে মুখুটি। সেলাম জানাতে হয়। আমার তো এ সবের বিন্দুবিসর্গও মনে ছিল না।

কুলপতিনারায়ণ মুখুটি বললেন, আমার তো সবই জলের মতো পরিষ্কার মনে আছে। রাত্রে যেদিন ঘুম আসে না, চোখ বুজে পড়ে থেকে সব

দেখতে পাই। সেই সেবার—

রাঘবেন্দ্র খাড়া হয়ে উঠে বসে সন্দেহের গলায় বললেন, রাত্রে ঘুম আসে না মানে? ঘুম আসবে না কেন?

বাঃ। সব রাত্রে ঘুম আসে?

এই বাবাঃ। সব রাত্রে ঘুম আসবে না? বলি রাতটা ঘুমের জন্যেই সৃষ্টি তো না কী? আমার তো বিছানায় পড়তে যা দেরি। এক একদিন তো পরমেশ্বরী রেগেই ওঠে। বলে 'কুম্ভকর্ণ।'…শুতে না শুতেই নাকের বাদ্যি! আর বাদ্যিটাতো প্রায় ঢাকের বাদ্যির তুল্য। হা হা হা। কথা যা এক একখানা বলে!…তো তোর কিন্তু রাত্রে খাওয়ার পর একটু হজমের ওষুধ খেলে ভালো হয়।

ওষুধ শত্তুরে খাক।

না রে বাবা, অত অহঙ্কার ভালো নয়। হজমের গোলমাল ঘটলেই অনিদ্রা। পরমেশ্বরীরও দোষ আছে। খাওয়াবার জন্যে চাপাচাপি করা। আমি শালা ডাকাবুকো, এখনো কব্জি ডুবিয়ে মাংস খেতে পারি, তুই তো কোনো কালেই তেমন নয়।

রাখতো তোর বাজে কথা। কবে আবার আমি পেট রোগা বদহজুমে। অ্যাঁ।

আরে বাবা! তাই কী বলছি? তবে মা বলতেন, মনে নেই, জামাইকে খাইয়ে তেমন সুখ নেই। এতটুকু আহার।

তা তিনি যাদ একটা মুলকে রঘু জামাই চেয়ে থাকেন। নাচার।

এই একটা ভারি বদরোগ তোব মুখুটি। এককথায়, বড্ড চটে উঠিস।

আর তুই একেবারে গঙ্গাজল। কুলপিবরফ।

ঘাট হয়েছে বাবা। ক্ষ্যামা দে। 'সেবার কী যেন একটা হয়েছিল বলছিলি?

কী আবার? ও—বলছিলাম সেই একবার আমাদের চাকরি করতে যাওয়ার ইতিহাস মনে আছে তো? না কী তাও ভুলে গেছিস?

চাকরি? ও হ্যাঁ হ্যাঁ সেই রেল কোম্পানিতে তো?

থ্যাঙ্কিউ যে মনে রেখেছিস। ডেলি প্যাসেঞ্জারী চালাতে হতো মনে আছে? রেলভাড়ার পয়সা লাগতো না, কোম্পানি একটা করে 'পাশ' দিয়ে

রেখেছিল।

ওই আহ্লাদেই তো ওই চাকরি নেওয়া। নইলে চাকরি তো ভারি ! লেজারকীপারের ! তোর বোধহয় আর একটু বেটার ছিল ?

বেটার না! 'বিটার'। বয়টা যা বদমাস ছিল ! তো আমাদের তুজনকেই সাত-সকালে ভাত খাইয়ে পাঠাবার সময় পরমেশ্বরী মাঝে মাঝে কী বলতো মনে আছে ?

ওই বক্তার তো সর্বদাই কত কী বলতো। 'বলতো রাজানগরের রাজকুমার। হলেন এখন ডেলিপ্যাসেঞ্জার।' মুখে মুখে ছড়া কাটতে ওস্তাদ ছিল !

কুলপতি বললেন, তা খুব মনে আছে। তবে আমি বলছিলাম ওর সেই আবদারের কথা। বলতো না—'আমারও তোমাদের সঙ্গে সাতসকালে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।···দাওনা বাপু আমাকেও একটা চাকরি জুটিয়ে। আজকালতো মেয়েরাও দোহাত্তা চাকরি-বাকরি করছে।' বলতো না ?

হুঁ। আবার এও বলতো রেল কোম্পানির রেলগাড়ির 'পাশে' বৌদেরও ভাগ থাকে। চলো তোমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে বেড়িয়েই আসি। একা একা সারাদিন প্রাণ হাঁপায়।

কুলপতি বললেন, তা সত্যি। বেচারি চিরদিনই বড় নিঃসঙ্গ। এখনই না হয় আমরা সর্বদা বাড়িতে বসে। কম বয়েসেতে তো—

তা সত্যি। তবে ভীষণ কাজ পাগলাতো। সারাদিনই কাজ আর কাজ। এই তো এখনই ছাখ না। সংসারে তো এই তু'টো বুড়ো। তার জন্যে সরাক্ষণ কী এত কাজ ? অ্যাঁ ? অথচ টিকিটি দেখতে পাওয়া যায় না। কেন এ সময়—

কথার শেষ না হতেই ঘরের মধ্যে থেকে বারান্দায় চলে আসে একটি ব্যঙ্গবাক্য।

ও ! তুই বন্ধুতে পরমেশ্বরী বামনীর সমালোচনা চলছে। তাই এমন চুপি-চাপি।···আর আমি কিনা ভয় খেয়ে ছুটে ছুটে আসছি এতক্ষণ কাল-বাঘেদের গর্জন নেই কেন ? তো অন্ধকার কেন ? বলরামবাবুর বুঝি খেয়াল হয়নি সুইচটা জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে।

কুলপতি বললেন, না না। আমরা ইচ্ছে করেই জ্বালিনি। বেশ জ্যোৎস্না রয়েছে।

ওঃ। কাব্যি! তা ভালো। তো কাব্যির মধ্যে তো শুনতে পেলাম পরমেশ্বরী বামনীর টিকিটিও দেখতে পাওয়া যায় না।

আঃ, কী যেএক 'বামনী বামনী' বলা শিখেছ সেকালের ঠাকুমাদের মতন।

পরমেশ্বরী সেই ছায়া ছায়া বারান্দাতেই ফরাসের একধারে বসে পড়ে বলে, তা বামুনের গিন্নী হয়ে নিজেকে নাপতিনী বলব না কী? আর—

হঠাৎ একটু চুপ করে গিয়ে আস্তে বলে, আর সময়ে সব হলে এতদিনে পাঁচটা নাতিপুতির ঠাকুমাই কী হতুম না না কী?

পরমেশ্বরীর মুখে কখনও এমন বন্ধ্যানারীর বেদনাসূচক কথা বড় শোনা যায় না। দু'জন পুরুষই চুপ হয়ে যান। সান্ত্বনার ভাষা যোগায় না। কিন্তু একটু পরে কুলপতি বলে ওঠেন, যাই বলো পরমেশ্বরী, তোমায় কিন্তু নাতি-নাতনীর ঠাকুমা কী ছেলে বৌ মেয়েজামাই টামাই নিয়ে সংসার করা গিন্নী ভাবতে গেলে মোটেই মানায় না। বিশ্বাসেই আসে না।

কুলপতির গলার স্বরটা ভারি ভারি লাগে। এই বিদ্যুতের আলো না জ্বালা 'আকাশী আলোর' পরিবেশ বলেই কী?

কিন্তু পরমেশ্বরীর যা স্বভাব। কোনো সময়ই কোনো ভাবগম্ভীর ভাব টিকিয়ে রাখতে দেয় না। হেসে বলে ওঠে, হ্যাঁ, তা তো বলবেই। 'দ্রাক্ষাফল অতীব অম্ল' এ গল্প আর কে না জানে? তো খেদ হয় এই ভেবে আমার ঘাটতিতে এই রায়বাড়ির বংশের ধারাটি ঝুলে পড়ে বন্ধ হয়ে গেল।

রাঘবেন্দ্র ভুরু কুঁচকে নেন। তোমার ঘাটতি মানে?

আহা, মানে জানো না! ন্যাকা হরিদাস! তা' একালের পুরুষরা বাপু বড় দুঃখী। আইন তাদের সব সুখ বাসনা স্বাধীনতা অধিকার-টধিকার সব কেড়ে নিয়ে ফতুর করে ছেড়েছে। ছেলেপুলে না হলে, কেমন বাঁজা বৌটাকে বাতিল করে আর একটা বিয়ে করতে পেতো।

কুলপতি ভেঙিয়ে বলে ওঠেন, তাতেও না হলে একটার পর একটা। কার ঘাটতি তার হিসেব না মেনেই—

সে যাক। পেতো তো আর একটা বিয়ে করতে। আদালতে গিয়ে তালাক-এর কেলেঙ্কারি না করে। একালে ওই কেলেঙ্কারিটি না করে কিছুটি হবার জো নেই। সাধে বলছি, একালে পুরুষরা বড় অভাগা হয়ে গেছে।···শুনতে পাই এনাদের কোন্ ঠাকুর্দার তিন তিনটি গিন্নী ছিল।

রাঘবেন্দ্র বললেন, শুনেছি বাবার এক জ্যাঠামশাইয়ের। অবিশ্যি তিনজনের একজনও তাঁর মুখ রাখেন নি। সবাই ফেলিওর।

কুলপতি বললেন, তার মানে মূলেই গলদ।

সে কথা সে কালের লোক জানতো না। অথবা মানতো না। মেয়ে মানুষই বাঁজা হয়। এটাই জানা। তবে শুনেছি তিন সতীনে দিব্যি ভাব-ভালবাসা ছিল। আর ওই ঠাকুর্দাও তিনজনকেই সমান ভালবাসতেন।

কুলপতি আবারও ব্যঙ্গের সুরে বলেন, তিনজনকেই সমান ভালবাসতেন। তোকে বলে গেছেন বুড়ো না? যত্তোসব আজগুবি কথা।

পরমেশ্বরী এখন আস্তে বলেন, আজগুবি কেন? হতে পারে না?

অসম্ভব। 'ভালবাসা' একজনকেই সম্ভব।

পরমেশ্বরী বলেন, ওটা তোমার ভুল ধারণা। না পারবার কী আছে? হৃদয়টি যদি অনেকটা বড় হয়? একাধিকের জায়গা হতে পারে না?

বলেই হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে বলেন, কাণ্ডখানা ছাখো। রাত দশটা বাজতে চললো, এখন খাবার চিন্তা না করে তিনটে ষাট সত্তরের বুড়োবুড়ি 'প্রেমতত্ত্ব' নিয়ে আলোচনা করতে বসেছে।···ওঠো ওঠো আজ মাংস দিয়ে ছোলার ডাল রান্না হয়েছে। আর রাত করলে হয় অম্বল, নয় চোঁয়া ঢেঁকুর।

আঃ। পরমেশ্বরী। তুমি ইচ্ছে করে এমন বেরসিক সাজো কেন বলতো? এটা তো তোমার স্বরূপ নয়!

পরমেশ্বরী গালে হাত দিয়ে বলে ওঠেন, ওমা! এই মুখুটি মশাই কী বলে গো! সাজা বেরসিক! 'সাজা পাগল' বলে একটা কথা আছে বটে। কিন্তু সাজা বেরসিক! হি হি হি!

আঃ। পরমেশ্বরী।

কুলপতি রেগে রেগে বলেন. তোমার ওই বাজে হাসিটা থামাও তো ! এই হাসি দেখলেই আমার রাগে মাথা জ্বলে যায়।

অ্যাঁ।

পরমেশ্বরী অদ্ভুত একটা হতাশ কৌতুকের গলায় বলে ওঠেন, ও মুখুটি মশাই ! আমার হাসি দেখলে তোমার মাথা জ্বলে যায় ? বুড়ো হয়েছি বলে এতই অপমান ?

'হাসি দেখলেই' মাথা জ্বলে একথা বলেছি ? বলেছি এইরকম বানানো হাসি দেখলে—

বানানো হাসি। ওরে বাবা শুনে যে আরো হাসি পেয়ে যাচ্ছে গো। বানানো কথা শুনেছি। বানানো গল্প শুনেছি, কিন্তু 'বানানো হাসি'। বাংলা ভাষায় একটা নতুন শব্দ সংযোজন। কা বলগো ? অ্যাঁ ?

রাঘবেন্দ্র বলেন, আমি আর কী বলব ? তবে ঝগড়া শুধু এই রাঘব রায় আর মুখুটিই করে না। পরমেশ্বরী রায়ও করেন। তা দ্যাখো। আর দ্যাখো ঝগড়া বাধাতে ওস্তাদটি কে ? ওই মুখুটি। ওটি হচ্ছে টাকের জোঁক।

ভালো হবে না বলছি রাঘব রায়। ঝগড়া আমি বাধাই ?

আলবাৎ তুই বাধাস।

কখনো না।

গলার জোরে জিতবি না কী ? তোরই একটুতে মানের কাণা খসে যায়, আর আড়বুঝের মতো গোঁ ধরে বসে থাকিস। তুইই পালের গোদা।

রাঘব রায়। খবরদার ওই সব গোদা-ফোদা বলবি না বলছি।

একশোবার বলব।

গলাটা চড়ে।

ফট করে আলোটা জ্বলে ওঠে।

পরমেশ্বরী ছেলেমানুষের মতো হি হি করে হেসে উঠে বলে বাবাঃ। বাঁচলুম। আশা হচ্ছে এবার ধাতস্থ হবে বুড়োরা !

পরমেশ্বরী ! ফের ?

কী হলো ?

ফের ওই 'বুড়ো' শব্দটা ইউজ করছ ?

ওমা ! এ কী জ্বালা গো। বুড়োকে বুড়ো বলা চলবে না 'খোকা' বললেও তো রাগ।

রাঘব রায় বললেন, ওই দুটোর মাঝখানে আর কিছু নেই ?

আছে। 'বালক' 'কিশোর' 'তরুণ' 'যুবক' 'প্রৌঢ়' কোন্‌টা পছন্দ বল ?

আচ্ছা যথেষ্ট হয়েছে। এখন বলতো আমাদের সেই চাকরি করার শেষটা কী হলো ? কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

চাকরি করার ? মানে সেই রেলের চাকরি ?

হ্যাঁ। হ্যাঁ সেই তো ডেলি প্যাসেঞ্জারী করছিলাম। তাকিয়ে সবাই আমাদের দেখে আড়ালে না কি বলতো 'নবকার্তিক'। বলতো রাজনগরের রাজা-বাহাদুর।

সে তো বলবেই। ওই বয়সে কে আর চুনোট করা ধুতি গিলে করা পাঞ্জাবি আর সোনার বোতাম পরে অফিসে যায় বলো ? আমিও তো তোমরা বেরিয়ে গেলেই একপালা হেসে নিতাম।

ওঃ। একপালা হেসে নিতে ! অথচ নিজেই সেই সব সাজগোজ হাতের কাছে এগিয়ে দিতে। কই তখন তো বলনি, তোমার হাসি পায়। লোকে হাসবে।

দ্যাখ কাণ্ড। এই কথা আবার মুখের ওপর বলতে আছে ? পতি পরম গুরু না ? তো জানতুমই তো কদিন আর ?

কেন ? ক'দিন আর জানতে কেন ? চাকরিটা কী টেম্পোরারি ছিল ?

তা জানি না। তবে এ তো জানতুম রাজকীয় মেজাজে ও জিনিস টঁ্যাকে না। দু'জনেই একদিন এসে বললে, ব্যাটা বস-এর মুখের ওপর চোটপাট করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলাম ! ব্যাটা বলে কিনা আপনারা মশাই কেন আপনাদের রাজসিংহাসন ছেড়ে আমাকে জ্বালাতে এই দীনহীন চেয়ারে এসে বসেছেন ? যান যান ফিরে যান। যাকে যেখানে মানায় !

বলেছিলাম বুঝি এইসব ? মুখুটি এটা নিশ্চয় তোর মেমারিতে ছিল না ?

খুব ছিল।

তাহলে তখন বললি না যে?

তুই বলতে দিলি? কুটকচালে কথা তুলে রাগিয়ে দিলি।

কী? আমি কুটকচালে কথা বলি?

বলিসই তো। ওটাই তোর স্বভাব!

বাহবা! বাহবা!

পরমেশ্বরী হঠাৎ প্রায় তরুণীর ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে হাততালি দিয়ে বলে ওঠে নারদ। নারদ।

আশ্চর্য এই একইভাবে এই একই মঞ্চে পরমেশ্বরী নামের মেয়েটা তার অভিনয় কুশলতায় সমস্ত পরিস্থিতিটা নিজের হাতের মুঠোয় রেখে চালিয়ে চলেছে 'কৈশোর-যৌবন থেকে এই বার্ধক্যে'!

কিন্তু অপর মঞ্চে?

সেও এই রাজনগর রাজবাটিরই একাংশে। কিন্তু সেখানে পরমেশ্বরী নামের বহু চিন্তায় ভারগ্রস্তা গৃহিণী মূর্তিতে কী অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ।

সেই ক্লান্তির ছাপের সামনে দাঁড়িয়ে শিবশম্ভু ঘোষাল আরো ক্লান্ত ক্লিষ্টভাবে একখানা গহনা হাতে তুলে নিয়ে বলেন, এই গহনাটাকে কী বলে বৌমা?

এটাকে? বলে, 'রতনচূড়' হাতের ওপর পরে—

শিবশম্ভু বললেন, তা আমি জানি। আপনি যখন বৌ হয়ে পাল্কী চেপে এখানে আসছিলেন, এই গহনা পরা হাতখানি দিয়ে পাল্কীর পর্দা সরিয়ে দেখছিলেন!

পরমেশ্বরী বললেন, ওমা! সে কথাও আপনার মনে আছে সরকার মশাই? কত কালের কথা!

শিবশম্ভু ঘোষাল মনে মনে বললেন, মনে থাকবে না? সে কী একটা যেমন তেমন ছবি? সে ছবি তো মনের মধ্যে কেটে বসে আছে। তারপর কত ইতিহাস কত ঘটনা। এখন এই হতভাগ্য বুড়োকে 'সেই ছবির হাত' থেকে গহনটা খুলে নিয়ে বেচতে যেতে হচ্ছে।

মুখে বললেন, সবকালের কথাই মনে আছে বৌমা। তবে আমার মতন দুর্ভাগ্য বোধহয় জগতে আর দু'টো নেই। তাই এইভাবে একে একে এইভাবে—

পরমেশ্বরী কী আর বোঝেন না? পরমেশ্বরীর এই রোগজীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধের মুখের রেখার ভাষা বোঝবার ক্ষমতা আছে। লোকটাকে দিয়ে নিতান্ত নির্মমের মতো কী কঠিন কাজগুলো করিয়ে চলেছেন পরমেশ্বরী!

ওঁর এই যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে আঁস্তে বলেন, আমি আপনার কষ্ট বুঝি সরকার মশাই!

বোঝেন? কতটুকু বোঝেন?

এই আবেগের গলা একদম নতুন।

পরমেশ্বরী একটু চমকালেন। আবার সামলে নিয়ে বলেন, হয়তো সামান্যই বুঝি!

হ্যাঁ। তাই। সামান্যই বোঝেন।

বলে, আস্তে সেই রতনচূড় জোড়াটা তার কোটায় পুরে নেন। ফতুয়ার পকেটে ঢোকাতে গিয়ে দেখেন হলো না। হাতের থলিটায় ভরে নেন।

এক একজনের চেহারায় কোনো বয়েসেই যেন বয়েসকে ঠিক ধরতে পারা যায় না। তাদেরকে পঁচিশ বছরেও 'পঞ্চাশ' বললে বেমানান লাগে না, আবার পঁয়ষট্টি বছরেও পঁয়ত্রিশ বললে বলা যায়। কেমন একরকম পাকশিটে গড়ন আর মাংসবর্জিত শীর্ণমুখের রেখায় বয়েসটা যেন কোনো একসময় একটাই ছাপ মেরে রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। নতুন করে আর রোজ রোজ খাটে না।

পরমেশ্বরীর হঠাৎই মনে হলো, আহা বিয়ে হয়ে পর্যন্তই তো লোকটাকে দেখছি বয়েস কত হলো? সেই যে পাল্কীর সঙ্গে আসছিল তালপাতার সেপাইয়ের মতো তিড়িং তিড়িং করতেকরতে, তখন তো নেহাৎ বয়েসওলা বলে মনে হয়নি। অথচ লোকটা তাঁকে 'বৌমা' ডাকে।

ফস করে জিগ্যেস করে বসলেন, সরকার মশাই আপনার শরীরটা তো খুব খারাপ হয়ে গেছে। বয়েস কত হলো?

সরকার মশাই চমকে পরমেশ্বরীর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে ঘাড় নিচু করে বললেন, অত কী আর হিসেব আছে? বুড়োর আবার বয়েসের কথা। তবে রায়মশাইয়ের থেকে বছর দুইয়ের ছোট ছিলাম!

ক্লান্ত বিষণ্ণ চিন্তাভার পীড়িত পরমেশ্বরীও স্বভাবগুণে হঠাৎ হেসে উঠলেন, আগে ছোট ছিলেন? এখন বড় হয়ে গেছেন? আশ্চর্য! আপনি তো তাহলে আমার থেকে কিছু বড় মাত্র। অথচ সেই ছোটবেলা থেকেই এমন ভারীক্কিভাবে 'বৌমা' বলে ডেকে আসছেন। যেন কতই বৃদ্ধ!

সরকার মশাই এখন একটু হাসলেন।

বললেন, হ্যাঁ, প্রথমটা বলতে একটু লজ্জা করছিল। তা' কর্তাবাবু বলেছিলেন, তুই আমায় যখন 'দাদা' বলিস, তখন ওই 'বৌ-রানী' ডাক মানাবে না। বরং 'বৌমা' বলিস!

তাই বলেছিলেন বিক্রমেন্দ্র। বিচক্ষণ মানুষটা তখন সেই মাত্র সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ ছেলেটার আবেগ বিহ্বল অবস্থা দেখেই কী এই দাওয়াইটি দিয়ে বসেছিলেন? হয়তো তাই। সেই আপাদমস্তক সোনায় মোড়া অপূর্ব লাবণ্যময়ী কনেটিকে যে তখনকার সরকারমশাই হরিহর ঘোষালের ছেলে শিবশম্ভু, ঘোষালের পরী রাজ্যের একখানি পরীর মতোই লেগেছিল। অলৌকিক অপার্থিব কিছু।

সেই অনুভবের ছাপ তার সেই তালপাতার সেপাইয়ের চেহারাতেও হয়তো ফুটে উঠেছিল। তাই ঝুনো সংসারী বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোকটা ওই দাওয়াই-য়ের সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে বসেছিলেন।

থলিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন সরকার মশাই কার্তিকের দোকানের উদ্দেশে।

পরমেশ্বরী অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। সত্যিই মানুষটার যন্ত্রণার পরিধি পরিমাপ সম্পর্কে তেমন কোনো খেয়াল করেননি পরমেশ্বরী। লোকটার যে এইভাবে এ সংসারে অগাধ জিনিস একটি একটি করে 'বিক্রমপুরে' পাঠিয়ে দিয়ে আসতে বুক ভেঙে যায়, তা আজই প্রথম টের পেলেন।

বাপ নীলমণি পোদ্দার মরবার পর তার ছেলে কার্তিকের বেশ খানিকটা ডানা গজিয়েছে। সে এখন বাপের আমলের এই রাজনগর 'সর্বেশ্বরীতলার' দোকানটা ছাড়াও স্টেশন রোড ছাড়িয়ে সেই হাওড়া হাটের কাছ বরাবর আর একখানা দোকান ফেঁদেছে শালাকে সঙ্গী করে। তাই কার্তিককে পেতে হলে হয় বেশ সকালের দিকে নয় একটু বেশি রাত্তিরের দিকে। সারাদিনের জন্য বসে কার্তিকের ছোট ভাই কানাই। কার্তিক ধীরে সুস্থে এসে দোকানে বসলে তবে তার ছুটি।

শিবশম্ভু দেখতে পেলেন কানাই দোকান থেকে ফিরছে। বললেন এই দাদা আছে দোকানে?

আছে। এতোক্ষণে আমার ছুটি।

বলে চলে গেল। শিবশম্ভু কর্তিকের দোকানে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

কার্তিক দাঁত বার করে বলল, বারে! বেড়ে জিনিসটা তো। তবে আজকাল আর এসব ফ্যাশান নাই। পাবেই বা কোথায় এত সোনা?

শিবশম্ভু বললেন, কথা থামিয়ে চটপট ওজনটা করে ফেলে দামটা কষে ছ্যাখ দিকি!

কার্তিক নিক্তি বার করতে করতে আবার দাঁত বার করে বলল, রাজবাড়ির পেতল-কাঁসা বাজনা বাড়ি তবলা হারমোনিয়াম থেকে শুরু করে রুপো পর্যন্ত সব পাচার করে এবার বুঝি সোনায় হাত পড়েছে সরকার জ্যাঠা?

কথার ভঙ্গিতে মাথা থেকে পা অবধি জ্বলে গেল। তবু কষ্টে বললেন, কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। আমি আর কী করব। ছ্যাখ চটপট।

কার্তিক তবু তেমনি মস্তানি ভঙ্গিতে বলল, কার ইচ্ছেয় তা খোদা মালুম!

কী বললি?

বলি নাই কিছু। এই যে ওজন আপনার পাঁচ ভরি চার আনা!

শিবশম্ভু ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলেন, ওই দু'পাটি জিনিস মাত্র পাঁচ ভরি চার আনা? কথা বলতে বলতে ওজন করলি, বোধহয় একটু গড়বড় হয়ে গেছে। তুই আর একবার নিক্তিতে চাপা দিকিন।

কার্তিক অনমনীয়ভাবে বলে, আমার গড়বড় হয় না।

রাগ চেপে বলতে হয়, না গড়বড় হয় না। ভারি মাতব্বর হয়ে গেছিস। সেদিনের ছেলে।

কর্তিক এই ঘরোয়া ভঙ্গী কথাকে আমল না দিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, ওজন ঠিক আছে। এই নিন রসিদ। তবে এসব জিনিসে পানমরা বাদ যাবে অনেকটা! পরে কষে দেখে বলব।

শিবশম্ভু আর রাগ চাপতে পারেন না। বলে ওঠেন, 'রুপোর বাসনপত্তর খাদ আছে বলে বলে কি করলি, তা ভগবান জানে।' বাবুদের কানে তোলা চলবে না। যা কিছু ব্যবস্থা বৌমার আর আমার মধ্যে।'

কার্তিক আবার সেই শৃগাল হাসি হেসে বলে, তা তো জানিই। সেটাই তো সুবিধে। আপনারও আমারও। পানমরা বাদ বেশি নেব না। ভরি পিছু ছ'আনা। বাস।

ভরিপিছু ছ' আনা! বলিস কী কার্তিক ?

কার্তিকের দাঁতগুলো এই শীর্ণ হাতেরই এক ঘুঁষিতে গুঁড়িয়ে দেবার বাসনা কোনোমতে সামলে বলেন শিবশম্ভু, ছ' আনা সোনার কত দাম এখন ভাব!

কী করবো বলুন ? ওটাই এখনকার রেট। এখনতো সোনা বেচার হিড়িক চলছে। পুরনো কালের একখানা গহনা ভেঙে মেয়ের বিয়ের সাতখানা গহনা গড়াচ্ছে। পুরনো সোনায় মোটা বাদ যাবেই জ্যাঠা। এখন আসুন গিয়ে। খদ্দের আসবে। এই যে রসিদটা নিয়ে যান। কর্তাদের দেখলে তো 'অভাব' আছে বলে মনে হয় না! কে যে কী কলকাঠি নাড়ছে সেই জানে। হ্যা হ্যা!

সেকালে সেই যে লেখা হতো 'লগুড়াহত সর্পবৎ।' তা সেই ভাবেই কার্তিকের দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন শিবশম্ভু!

মনে যত গ্লানি তত ধিক্কার। তত রাগও।

এই এক আশ্চর্য মেয়েছেলে! চিরকালের সর্বস্ব উড়িয়েপুড়িয়ে ছ'টো বুড়ো খোকাকে অবস্থা বুঝতে না দিয়ে রাজার হালে পুষে চলেছেন। কী ইষ্টসিদ্ধি

হচ্ছে তাতে? একটা যদি বা স্বামী, অপরটা না ননদাই মাত্র। আর এও বলি, ওই দু'টো বুড়ো লোক কী এমনই অবুঝ? তাদের চোখে রুমাল বেঁধে দিয়ে কানামাছি খেলানো হচ্ছে।...উদ্দেশ্যটাই বা কী?...

আবার এখন সোনায় 'পানমরা' দেখাচ্ছিস! অত কমিশন খাসনে কার্তিক, ধর্মে সইবে না।

কার্তিক কিন্তু রেগে না উঠে আরো বেশি দাঁত বার করে বলে, ও সব ধর্ম-কথা শিকেয় তুলে রাখুন জ্যাঠা। আপনিও তো মনিব বাড়ি বাড়তি পড়তি থেকে অনেক কমিশন খাচ্ছেন, কার্তিক না হয় একটু খেল।

কী বললি?

সরকার মশাই প্রায় ছিটকে ওঠেন, খুব যে মস্তান হয়ে উঠেছিস দেখছি। ছোট মুখে বড় কথা!

কার্তিকও তড়পে ওঠে, ওসব ছোট বড়'র কাল নাই জ্যাঠা! ওসব ভুলে যান। ওই বৃহৎ রাজবাড়িটিকে ফাঁক করে আনলেন আর একটুও কমিশন খেলেন না, একথা একটা শিশুও বিশ্বাস করবে না! বাবা একটা বোকা মনিষ্যি ছিল, তাই দারিদ্রদশা ঘোচেনি। যাক বেশি কথায় কাজ নাই। জিনিসটা রেখে যেতে না চান, নিয়ে যান। তবে এ তল্লাটে আর কোনো পোদ্দারের দোকান পাবেন আপনি? তাছাড়া—তাতে আপনার 'তথ্য গোপন' থাকবে না। লোক জানাজানি হবেই।

শিবন্তুকে মাথা হেঁট করে দেঁতো হাসি হাসতে হয়। ওই পাজী বদমাস ছেলেটাকেই আবার ভোয়াজি কথায় ধাতে আনতে হয়।

ধন্যি বাবা! কী ঠাণ্ডামেজাজ বাপের কী রগচটা ছেলে গো! বলি, 'ফিরিয়ে নিয়ে যাব' একথা আবার কখন বললুম! তোরা এদের তিন পুরুষের চেনা। তোদের মতন বিশ্বাসী জন এ-তল্লাটে আবার কোথায় পেতে যাচ্ছি? জানিসই তো বাবা, এসব ব্যাপার।

শিবশম্ভুর আজীবনের ভাবশূন্য অথচ শীর্ণ পেশীবহুল মুখ আর সিঁটকে চেহারাখানার মধ্যে যে এ হেন প্রশ্নের ঝড় উঠতে পারে, তা বোধহয় তাঁর পরিচিতজনের পক্ষে বোঝা অসাধ্য। কিন্তু ওঠে। চিরকালই ওঠে। আজও

উঠছে। ওই হাড় হারামজাদা পাজী কার্তিকটার ব্যবহারে আরো উঠছে। শিবশম্ভু যে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির পাকে জড়িয়ে পড়ে কতখানি নিরুপায় হয়ে পড়েছেন, তা বুঝতে পেরে গিয়েই না বদমাসটার এতো সাহস। অথচ শিবশম্ভুর এর থেকে মুক্তি নেই।

বাড়ি ফিরে নীরবে পরমেশ্বরীর হাতে স্যাকরার দোকানের রসিদটা দিয়ে দিলেন।

পরমেশ্বরী কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করলেন না।

যেদিন ঠাকুরের রুপোর কাঠরাটা বেচে দিয়ে এসেছিলেন, সেদিনও শিবশম্ভু এইরকম নিঃশব্দে নীরবে রসিদটা এগিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন।

পরমেশ্বরী ওঁর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন একটুক্ষণ। ওঁর ঘর মানে তো সেই কাছারি ঘর।·· ভেতর বাড়ির দালান পার হয়ে খানিকটা দেওয়াল ধসে পড়া ভগ্নস্তূপ ডিঙিয়ে মাড়িয়ে বারবাড়ির দালানে গিয়ে পড়া। তার শেষপ্রান্তে সেই ঘর।

পরমেশ্বরীর এখনো মনে হলো আমি কী নিষ্ঠুর। মনে মনে বলে উঠলেন, ওরে পরমেশ্বরী, তুই কী নির্মায়িক পাষাণ আর স্বার্থপর। ওই লোকটাকে এভাবে কষ্ট দেবার আর জব্দ করবার কী এত অধিকার আছে তোর? তোর শ্বশুরের নিমক খেয়েছে ও, তোর নয়। তবু জীবনে কোনোদিন নিমকহারামি করেনি। কিন্তু কিসের বিনিময়ে তুই ওই লোকটার ওপর এতো আধিপত্য আর এত জুলুম চালাস? লোকটা ভদ্র বিনীত আর মনিববাড়ির প্রতি আনুগত্যপরায়ণ এই জন্যেই তো? তার মানে তুইও সুযোগটি নিচ্ছিস।

কিন্তু এও আশ্চর্য লোকটা এখনো মনে প্রাণে সেই আনুগত্যটি বহন করে চলেছে। নইলে কী পাচ্ছে ও? একখানা ভাঙাবাড়ির ভাঙাচোরা একটা ঘরে একটু আশ্রয় আর দু'বেলা দুটি খেতে পাওয়া। এই তো? মাইনে পর্যন্ত পায় না।

অবশ্য কর্তারা এ তথ্য অবগত নয়। তা' শিবশম্ভু নামের লোকটা তো সেটি

তাঁদের গোচরে আনেনি কোনোদিন। তার মানে বাড়ির গৃহিণীর প্রতি বিশেষ বিশ্বস্ত !!
সেই গৃহিণী এখন ভাবলেন আগামীকাল ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু ভালো করে গল্প টল্প করতে হবে!

কার্তিকের শালা বলল, তুমিও যেমন ব্রাদার ওই ছ'আনা পার্সেন্ট খাদ বাদ যাবে বলতে গেলে কেন? আট আনা বললেও পারতে। স্রেফ ফিফটি ফিফটি···যেরকম অবস্থা বলছ, তাতে মনে হচ্ছে ওই তোমার ঘোষাল জ্যাঠাটি একখানি ধুরন্ধর ধান্দাবাজ।···গিন্নীটা হয়তো বোকা সোকা তাকে কোনো রকম প্যাঁচে ফেলে ঠকিয়ে খাচ্ছে।
কার্তিক বলে লোকটাকে তেমন ধান্দাবাজ মনে হয় না বোধহয় ওই গিন্নীটিই ঘোড়েল। আমার ধারণায়—
ছাড়ো ভায়া তোমার ধারণা। ও তোমার ধর্ম কথার বুলি ঢের শোনা আছে আমার। ওই ভণ্ডগুলোই হয় বেশি ঘোড়েল।
তারপর গলা নামিয়ে মুখে কৌতুক ফুটিয়ে ফিস ফিস করে কিছু বলে। শুনে কার্তিক জোরে হেসে উঠে বলে, আরে না দাদা সে সব কিছু না। ওই ঘোষালটিকে যদি দেখতেন তাহলে আর এ সন্দেহ—হেঁ হেঁ ঠিক একখানা বৃষকাঠ।
শালা বলে, তাহলেও। জগতে কিছুই অসম্ভব নয় ব্রাদার। তো যাক, তোমারই পোয়া বারো। ও যা বুঝছি একে একে আরো গহনা বেরোবে। এদিকে যখন বলছো কর্তাদের দেখলেই বোঝা যায় অভাব তেমন কিছু নেই। এখনো রুপোবাঁধানো ছড়ি, ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ধুতি সোনার বোতাম—
সেই তো। খাওয়া দাওয়া রাজাই। আমাদের ওই সর্বেশ্বরীতলার বাজারেই তো আসে ওই জ্যাঠা। বাজারের সেরা জিনিসটা তুলে নিয়ে ঝুলির মধ্যে পুরবে। মাছওলার সঙ্গে তো বরাদ্দ রোজ দু'খানা করে মুড়ো সাপ্লাই করবে। করেও তাই। তাছাড়া লোকমুখে রটনা, সব প্রথম বৌনি বলে জেনে বেটা-বেটিরা যা গছাতে চাইবে সব নেবে। ওদের বাড়ির যে রাঁধুনি

বুড়ি তার নাতনীর সঙ্গে আমার ছোট বোনটার গলায় গলায় ভাব। তার মুখেই শুনি।

তাহলেই বোঝো? অভাব নেই, অথচ শ্বশুরকুলের সর্বস্ব পাচার হয়ে যাচ্ছে। এর ভেতরে রহস্য নেই বলতে চাও?

এই রকমই হয়। নীচজনের কাছে যদি কোনোভাবে কোনোরকম দৈন্য প্রকাশ পেয়ে যায়, ধরা পড়ে যায় কোনো কিছু দুর্বলতা, তাহলেই চির-কালের সব সম্মান সম্ভ্রম ধূলিসাৎ।

বিদ্যুৎবাতি থাকলেও নিজের ঘরে শিবশম্ভু সে বাতি নেননি। বলেছেন, চিরটা-কাল কেরোসিনের আলোয় চালিয়ে আসছি, ওটাই সুবিধে বোধকরি। অতএব এখন রাত্রে তাঁর ঘরে খুব কমিয়ে রাখা হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলো। সেই ছায়াছন্ন ঘরে একখানা হাতপাখা নাড়তে নাড়তে শিবশম্ভুও ভাবতে থাকেন, রহস্যটা কী? কেন পরমেশ্বরী রায়ের এমন অদ্ভুত খেয়াল? আর কিছু নয়, ওই জামাইটার জন্যই ওটাকে বরাবর 'জামাই আদর' পুষবার সঙ্কল্পে সর্বস্বান্ত হতে বসেছেন।···ওই উড়ে এসে জুড়ে বসাটা যদি না থাকতো তাহলে সংসারের এমন অবস্থা ঘটতো না। আর কর্তাকেও এমন চোখ বুজিয়ে রাখা হতো না। যত নষ্টের সূত্র ওই ঘর জামাইটা।···আশ্চর্য বেহায়া লোকও বটে! কোন্ জন্মে বৌ মরে গেছে, সেই তামাদি হয়ে যাওয়া সম্পর্কে সূত্র ধরে চিরকাল গেঁটিয়ে বসে থাকল আর রাজার জামাইয়ের উপযুক্তভাবে পালিত হতে থাকল! বেহায়া নির্লজ্জ!···

হাতের পাখাখানা থেকে ঠকঠক শব্দ ওঠে।

নীলমণি পোদ্দারের ছেলে কার্তিক পোদ্দারের শালা যে বলে জগতে 'অসম্ভব' আর 'অবিশ্বাস্য' বলে কিছু নেই। সেটা সত্যিই। ওই চির-নিরীহ নম্র ভদ্র মার্জিত মিতবাক লোকটাকে দেখে কী কেউ কল্পনা করতে পারবে ওর ভেতর এরকম হিংস্র ক্রুদ্ধ কটু কথার চাষ চলতে পারে। অথচ তাই চলছে। চলেও আসছে বরাবর!

সকালবেলার আড্ডাটি বসে দক্ষিণের বারন্দায় নয়, পুবের দিকের একটা টানা লম্বা ঘরে আগে এটা ছিল সভ্যভাষায় যাকে বলা যেতে পারতো 'গেস্টরুম'। তবে যাঁরা এটি বানিয়েছিলেন এবং কাজে লাগাতেন তাঁরা বলতেন, 'আসুন্তি যাউন্তি'-র ঘর! অর্থটা অবশ্য একই।

একদা ঘরটার দেওয়ালে পেন্টিং ছিল। নিচে থেকে ফুট চারেক পর্যন্ত গাঢ় সবুজ রঙের প্রলেপ। তার সীমানা লতাপাতা আঁকা একটি বর্ডার, যাতে মেরুন রঙ আর কালো রঙের মিশ্রণ। বাকি ওপর দিকের দেওয়ালটা ছিল বাদামী রঙ। প্রতিটি দেওয়ালে ফাঁকা জায়গাটুকু ভরাট করে বড় বড় আলোয় পেন্টিং ঝোলানো। সবই প্রায় পোর্ট্রেট। কয়েকটা নিসর্গ চিত্র।···ঘরে জানলা দরজার সংখ্যা অনেক। জানলাগুলো সবই শার্সি খড়খড়ি সম্বলিত। শার্সিগুলোর গায়ে গায়ে কাচের ওপর ছাপ লক্ষ্মী সরস্বতী রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি নানা দেবদেবীর ছবি। যেটা নাকি তখনকার কালের বড়লোকদের খুব শখের ব্যাপার ছিল। ঘরের মেঝেটা অবশ্য মার্বেল নয় সিমেণ্টেরই। লাল। সিমেণ্টের মেঝের ধার জুড়ে চওড়া কালো বর্ডার।

দেওয়াল ধারে ঢাউশ একটা ড্রেসিং টেবিল। তার টেবিলটা সত্যিই একটা রাইটিং টেবিলের কাজ করতে সক্ষম, এত বড়। আরশিটা দু'পাশে দুটো স্ট্যাণ্ডকে অবলম্বন করে তার ওপর আটকে আছে। ঘরখানার দু'দিকে দু'খানা বৃহৎ তক্তপোষ। তার একটাতে শুধুই জীর্ণ হয়ে যাওয়া একটি শতরঞ্চি বিছানো, অন্যটিতে তার উপর ধবধবে সাদা চাদর পাতা। এই-খানেই দুই কর্তার প্রভাতী আড্ডার আসর বসে।

কিন্তু ঘরে যা কিছু 'আছে' বলে বর্ণিত হলো, সে সব কি 'আছে?' না 'ছিল?' হ্যাঁ ছিল। এখন তার কঙ্কালগুলি আছে। দেওয়ালের রং সবই চটা উঠে উঠে একটা দাঁত বার করা চেহারা নিয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ এক এক জায়গায় বর্ডারের পুরনো কারুকার্যের খানিকটা নমুনা যেন ওই কঙ্কালকে ব্যঙ্গ করে উঠছে।···শার্সির কাচের দেবদেবীরা সকলেই প্রায় 'গোলক-ধামে' পৌঁছনোর পথে। খানিক খানিক খাবলানোর মধ্যে থেকে শুধু

আন্দাজ করা যায় ইনি এই দেবতা উনি এই দেবী।...দেওয়ালের অয়েল পেন্টিং পোট্রেটগুলোও প্রায় ঘন অন্ধকার। প্রতিকৃতিদের সঙ্গে 'প্রকৃতি দৃশ্যের' তফাৎ করা শক্ত। ঘরের মেঝের লম্বা লম্বা ফাটল।...এই সবের মধ্য থেকে আগের 'রমরমা'টা অনুমান করা যায় মাত্র।...তবে একটা জিনিস অবিকল আগের মতোই রয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে জানলা দিয়ে এসে পড়া রোদের রেখাচিত্রগুলি। রেলিং-এর ছায়া ফেলা ওই ঘরে এসে পড়ে মেঝের ফরাসের শুয়ে পড়া জানলা মাপের রৌদ্র রেখাগুলি তিনপুরুষের আগেও ঠিক একই জায়গায় শুয়ে পড়ে থাকতো!

এ সবের সংস্কার সাধন সম্ভব, এমন কথা এখন আর কেউ ভাবে না। ভাবতেন রাঘবেন্দ্রর বাবা বিক্রমেন্দ্র! ক্রমশঃ তিনিও এই অলীক ভাবনাটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তু'টো কারণ এক 'সাধ্যের' অতিরিক্ত এই বোধটি তুই স্ত্রী কন্যা বিয়োগে মন ভেঙে যাওয়া।

রাঘবেন্দ্রর ও বাসনাই আসেনি।...

গরীবেরা বৃষ্টির রাতে ছাদ দিয়ে জল পড়লে যেমন ছেঁড়া মাতুরের বিছানাটা এখান ওখান সরিয়ে নিয়ে নিয়ে বাকি ঘুমটুকু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করে, রাঘবেন্দ্র তেমনি বাড়িটার যখন যে অংশটা জবাব দিচ্ছে, সেখান থেকে সরে এসে 'আড্ডা' বসিয়ে বসিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবার সঙ্কল্পে আছেন। তবে সেই সরিয়ে আনার কাজটিতে পরমেশ্বরীরই বুদ্ধি আর ব্যবস্থা!

এই বিবর্ণ মলিন বয়েসের ভারে জীর্ণ ঘরখানা কিন্তু সকালের দিকে তেমন নিষ্প্রভ দেখায় না। তাছাড়া অভ্যস্থ চোখ আর নতুন করে পীড়িত হয় না। যেমন চোখে সয়ে থাকে পিতামহের 'কাশফুল কেশ' পিতামহীর লোলচর্ম। এসব কী চোখকে পীড়িত করে।

দাবা সাজিয়ে রেখে রাঘবেন্দ্র বললেন, মুখুটি কালকের মতো করে দাবা সাজা। মনে করে দেখ, কোথায় কোথায় তোর ঘুঁটিগুলো ছিল, কোথায় কোথায় আমার।

কুলপতির তুধে আলতা রঙা মুখ শুধু 'আলতা' হয়ে উঠল। বলেছিলাম না

সে দৃশ্য কেউ ফটো তুলে রাখেনি।

তোর তো সাংঘাতিক মেমারি।

ওই সব ফালতুর জন্যে 'মেমারি' ব্যয় করতে আমার বয়ে গেছে।

ও। তার মানে আমি 'হেরো' হয়েই থাকবো ?

তুই তো নাইনটি পার্সেন্ট 'হেরো' হোস। কবে আবার জিতিস ? 'চাল' দেবার তুই জানিস কী ?

মুখুটি ! ভেবেচিন্তে কথা বলবি।

খুব ভেবে চিন্তেই বলা হয়েছে।

তুই বলতে চাস আমি 'চাল' জানি না ?

বলতে চাওয়া আবার কী ? বলছিই তো। চালের তুই কিস্যু জানিস না। তোর সঙ্গে খেলতে বসা মানে 'খেলা' নয়। 'খেলাকরা।,

পর্দায় পর্দায় স্বর ওঠে দু'জনেরই।

ঠিক আছে। এই ঘুঁটিগুলো নিয়ে পরমেশ্বরীর রান্নাঘরে গিয়ে উনুনে ফেলে দিয়ে আয়। এইখানেই খেলা শেষ।

উনুনে দিলে পুড়ে যাবে না কী ? আইভরির জিনিস না ?

আইভারি পোড়ে না ?

কক্ষনো না।

আমি বলছি পোড়ে। জোর আগুনে সব পোড়ে।

যাদের বুদ্ধিটি আগেই পুড়ে বসে আছে, তারাই এমন এঁড়ে তর্ক করে। মানুষের দাঁতই পোড়ে না, তো হাতীর দাঁত।

মানুষের দাঁত পোড়ে না ? চিতায় ভস্ম হয়েও না ?

হাড় দাঁত এসব ভস্ম হয় না।

তুই জানিস ?

জানব না কেন ? তোর মতোন চোখ বুজে তো পৃথিবীতে চলি না।

আমি চোখ বুজে চলি ?

কুলপতি একটু সূক্ষ্মহাসি হেসে বলেন, চলিস কী না নিজেই ভেবে ছাখ। মুখুটি যত বয়েস বাড়ছে তোর কথাবার্তাগুলো যেন ততই প্যাঁচালো হয়ে

যাচ্ছে। আর তোর যত বয়েস হচ্ছে, বুদ্ধি তত ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।

বটে? প্রমাণ? দেখা প্রমাণ।',

হুঙ্কারটা বেশ জোরেই ছাড়েন রাঘবেন্দ্র।

কুলপতিও হুঙ্কার ছাড়েন—তা দেখাতে গেলে তো আর সংসার করতে হবে না রে শালা। গেরুয়া পরে পরে বিবাগী হয়ে যেতে হবে।

বটে না কী? রাঘব রায় তত কচি খোকা নয় যে, মনের দুঃখে বনে যাবে। ···হেরে মরবার ভয়ে শুধু শুধু বাকতাল্লা করে সময় নষ্ট করছিস। চাল দে।

তুই আগে দে।

না তুই আগে দে!

কেন?

কুলপতি বিদ্রূপ হাস্যে বলেন, কেন? আমার চালটা দেখে তবে বোড়ে নাড়বি বুঝি?

কী তোর দেখে? ভারি অহঙ্কার হয়েছে দেখছি। ঠিক আছে। এই দিলাম চাল.

রাঘবেন্দ্র একটা বোড়ে নিয়ে পরের ঘরে ঠুকে বসান।

কুলপতি বলেন, আর আমিও এই দিলাম!

আমি এই—

আমিও এই—

খেলা জমে ওঠে। আর যত জমে ওঠে, ততই চাল দিতে দেরি হতে থাকে।

মুখুটি! কী হলো? ঘুমিয়ে পড়লি না কী?

তোর মতন হুড়ুদ্দুম চাল দিয়ে বল খোওয়াতে হবে নাকি রে সম্বন্ধী?

মুখুটি, ভেবেচিন্তে কথা বল। খেলতে বসে এক আধটা বল' আর কে না খোয়ায়?

শেষ অবধি সবগুলো খোওয়াবি।

আচ্ছা দেখা যাবে কে খোয়ায়। এই দিলাম গজ ঠুকে।

চমৎকার। এইখানে গজ ঠোকা হলো? তা হবে না? যা গজমার্কা বুদ্ধি! এই গেল তোর হাতির মাথা!

রাঘবেন্দ্র বলেন, তাকিয়ে দেখছিস তোর নিজের অবস্থা ?

কুলপতি তাকিয়ে দেখে মনে মনে একটু জিভ কাটেন। তবে মুখে তো হারবেন না। বলেন, ওটা তোকে জলপানি খেতে ছেড়ে দিয়েছি। খা একটা ঘোড়া খেয়ে নে।

ওঃ ভুল করে ফেলে আবার লম্বা চওড়া কথা। আগের চাল ফেরত নিবি তো নে।

কুলপতি মুখুটি ওসব খেলোমির মধ্যে নেই। 'এই এই। এটা কী হলো। খেলি না যে ?

খেলাম না আমার ইচ্ছে।

খবরদার রায়কর্তা ! ওসব দয়াধর্ম দেখাতে আসিসনি। কুরুক্ষেত্র করব। খা বলছি।

খাব না। আমার ইচ্ছে।

তোকে খেতেই হবে।

না।

হ্যাঁ।

মুখুটি ভালো হবে না বলছি।

রাঘব রায় ! ভাল হবে না বলছি।

মুখুটি !

শালা।

ফের ? ডাকব পরমেশ্বরীকে ?

ডাকতে সাধ হয় ডাক না। ও ওই ছুতোয় পরিবারকে একটু ডেকে নিবি। এই তো।

হঠাৎ একটি কণ্ঠ ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়।

আর ডাকতে হবে না কষ্ট করে। তোমাদের ডাক হাঁকে 'রাধাকেষ্টকে' ফেলে ছুটে চলে আসতে হলো এখন কী নিয়ে ?

কুলপতি বলে ওঠেন, ওই শালা হঠাৎ আমায় দয়াধর্ম দেখাতে এসেছে। আমার ঘোড়াটাকে মুখের সামনে দেখেও না খেয়ে বোড়ে পিছিয়ে

নিয়েছে। ইয়ার্কি না কী? আমি বলছি খেতেই হবে। সাফ কথা।

রাঘব রায় বলে ওঠেন আমারও সাফ কথা আমি খাব না! ব্যস!

তোকে খেতেই হবে।

পরমেশ্বরী খিল খিল করে হেসে ওঠেন, তা ওর যদি ঘোড়ার মাংসের রুচি না থাকে বাপু, জোরাজুরি কেন?

কী? কী বললে, ঘোড়ার মাংস? হা হা হা।

রাঘবেন্দ্র গলা মিলিয়ে হেসে ওঠেন, হা হা হা।

গিন্নীটি যা এক একখানি ঝাড়েন!

কলহ কেন্দ্র ফরাসের ওপর পড়ে থাকে তার দোরঙা রাজামন্ত্রী হাতী ঘোড়া নৌকো পদাতিকদের বাহিনী নিয়ে।

পরমেশ্বরীর উপস্থিতিই এখন প্রধান।

আচ্ছা পরমেশ্বরী! সারাক্ষণ তুমি ওই পাথরের রাধাকেষ্টর মধ্যে কী এত রস পাও?

পরমেশ্বরী পরম কৌতুকের দৃষ্টি হেনে বলেন, প্রাণে প্রেম থাকলে পাথর থেকেও রস মেলে হে ঠাকুরজামাই।

রাঘবেন্দ্র বলে ওঠেন, ওসব মনকে চোখঠারা রস না ঘোড়ার ডিম। 'ঠাকুর ঠাকুর' করে মেয়েরা নিজেকে একটু 'বিশেষ' দেখাতে যায়।

তাই না কী?

পরমেশ্বরী তেমনি কৌতুকের কটাক্ষ হেনে বলেন, মেয়ে-জাতটাকে খুব চিনে ফেলেছ দেখছি। এত দেখলে কবে?

'এত' দেখার দরকার কী? তোমরাই তো বলো, 'ভাতের হাঁড়ির একটা ভাত' না কী? একখানিতেই বিশ্বরূপ দেখা হয়ে গেছে।

হুঁ খুব উন্নতি হচ্ছে দিন দিন। তুমিও বুঝি আমার মতো গল্প উপন্যাস পড়া ধরেছ? ওই থেকেই না কী আমি কথা শিখেছি!

কুলপতি বলেন, তুই তো একখানি জলজ্যান্ত উপন্যাস হে। সেটাই তো রাতদিন পড়ে চলেছ বড়কুটুম্বু।

'টুনটুনি' নামের সেই মেয়েটা কত কতকাল আগেই মুছে গেছে, তবু এরা

এদের জীবনীশক্তির জোরে বাঁচিয়ে রেখেছে। তার সম্বন্ধ সূত্র ধরেই এদের সম্বোধন ভঙ্গী।

পরমেশ্বরী বললেন, সকলের জীবনই এক একটি উপন্যাস। ওই যে আমাদের সরকার মশাই! হয়তো ওঁর জীবনটা নিয়েও

সরকার মশাই! আমাদের সরকার মশাই।

জোর গলায় হেসে ওঠেন রাঘবেন্দ্র, ওই বৃষকাষ্ঠটি? তোমার এ কথাটি মানতে পারলাম না পরমেশ্বরী। তাহলে বলতে হয় ওই সুপুরি গাছটাকেও নায়ক করে একখানা উপন্যাস বানিয়ে ফেলা যায়।

পরমেশ্বরী ওঠেনা, যাই।

কুলপতি বলে ওঠেন, কী যে এত কাজ তোমার রায় গিন্নী। সর্বদা যাই যাই। —বসে পড়ো না বাবা আমাদের খেলার আসরে।

তোমাদের এই রাজা, মন্ত্রী, হাতী, ঘোড়াদের দল নিয়ে? খেয়ে দেয়ে তো কাজ নেই।

খেললে বুঝতে হাতী ঘোড়া মারায় কত মজা।

সে মজা না খেলেও আছে হে। এই সংসারের রণক্ষেত্রে কত প্রাণী মারা পড়ছে। তো এ তো আর তিনজনে খেলা যায় না।

তা অবশ্য যায় না। বেশ একজন না হয় দর্শকের ভূমিকায় থাকা যায়। তুমি আর একজন। খেলাটা শিখে রাখা ভালো।

ও। আমি আর 'কোন' জন? তাকে তো আমার প্রতিপক্ষ হতে হবে।

রাঘবেন্দ্র বলে ওঠেন, তো এই হতভাগা তো চির প্রতিপক্ষ আছেই। এর সঙ্গেই হয়ে যাক একহাত।

পরমেশ্বরী। হেসে গড়িয়ে পড়েনা এ হতভাগ্যের সঙ্গে তো সারাক্ষণই একহাত নেওয়া চলছে।

তবে মুখুটিই যুদ্ধে নামুক। আমি দর্শকের চেয়ারে। না বাবা—

পরমেশ্বরী ভয়ের ভান করে বলেন, যদি হেরে যাই?

তা খেলায় তো হার জিৎ আছেই। আর তুমি তো হচ্ছ শিক্ষানবিস। হারলে লজ্জা কী?

ওরে সর্বনাশ। হারলে লজ্জা নেই? তাও বরের কাছে নয়। পরের কাছে।

আসলে পরমেশ্বরীর এখন মস্ত পিছুটান। সরকার মশাই বলে রেখেছেন বেলা দশটা এগারোটা নাগাদ তিনি কলকাতা যাবেন। যা যা দরকার লিষ্ট করে দিতে। তাছাড়া যদিও শ্রীনাথের মা যত্ন করেই খেতে দেয় লোকটাকে, তবু পরমেশ্বরী মনে করেন, খাবার সময় একবার তদারকি করাটা তাঁর কর্তব্য।

কিন্তু এরা চায় পরমেশ্বরী আরো কিছুক্ষণ থাকুক এখানে। পরমেশ্বরীর উপস্থিতিতে আলাদা স্বাদ। অন্তত কুলপতির সেটা বেশি বেশি মনে হয়।

কুলপতি তাই বলে ওঠেন, তবে তাসজোড়াটা পাড়া যাক।

তাস? আহা সেইবা তিনজনে কী এমন? তিনজনের খেলা তো 'গোলাম চোর।' তো তার মধ্যে দু'টি গোলাম তো চিরজন্মই চোর হয়ে বসে আছে। নতুন করে আর কী খেলব?···সরকার মশাই আজ সকাল করে খাবেন, দেখি গিয়ে রান্নার কতদূর কী হলো?

কুলপতি বিদ্রূপ গলায় বলে ওঠেন, ওঃ। তাই বল।···পরমেশ্বরী তোমার পিঁপড়ে টিপড়ে যখন খেতে আসে দ্যাখভাল করতে হয় বোধহয়?

পরমেশ্বরী হঠাৎ ভারি গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন, তাও করতে হয় বৈকি। না পারলে সেটা ত্রুটিই।

নেমে চলে যান।

রান্নাঘরের সামনের দালানে আসন পেতে জল ছিটিয়ে 'ঠাঁই' করে দিয়েছে শ্রীনাথের মা। ভাতটিও বেড়েছে পরিপাটি করে। পরমেশ্বরীকে দেখে বলে উঠল, তুমি আবার ব্যস্ত হয়ে নেবে এলে কেন বৌদি? আমিই তো দিচ্ছিলুম। নির্বিরোধী নিরীহ মানুষ! খাওয়া নিয়ে তো হাঙ্গামা নেই।

পরমেশ্বরী হাসলেন একটু। নির্বিরোধী নিরীহ বলেই তো আরো চিন্তা বামুনদি। বলরামের জন্যে কী আর চিন্তা করতে হবে?

'বামুনদি' প্রায় ছিটকে ওঠেন, তোমার ওই বলরামের কথা বোলোনা বৌদিদি। গুণের গুণমণি। দু'বেলা খেতে বসে বায়নাক্কা, 'মাছটা যেন বেছে

বেছে ছোটখানা দেওয়া হয়েছে।' ··ডালে যেন আজকাল একটু বেশি জল পড়ে যাচ্ছে।···আলুতো ক্ষেতের জিনিস, সেটায় এতো কেপ্পনতা কেন? ···আমি নাকি ওর খাওয়ার বেলায় কেপ্পনতা করি।

পরমেশ্বরী বলেন, ও তোমাকে ইচ্ছে করে রাগায় বামুনদি।

কেন? ও কী আমার সাতকালের নাতি? ভারি বজ্জাত ছেলে!

বলরামের ওপর শ্রীনাথের মা'র কোনোদিনই বাৎসল্য স্নেহের বন্যা নেই। একফোঁটা ছেলেটার সঙ্গে সারাক্ষণ ঝগড়া। তবে সম্প্রতি রাগের আরো একটা কারণ ঘটেছে। বয়েস হয়েছে আর বাতের প্রকোপ ঘটেছে বলে শ্রীনাথের মা নিজের সাহায্যার্থে নাতনিটাকে নিয়ে আসে তাছাড়া নাতনির মাও আজকাল একটা কাজ ধরেছে। না হলে আজকালকার দিনে সংসার চালানো যায়। শ্রীনাথ যা সামান্য চাকরি করে, তাতে আগে যদিও বা চলছিল এখন অচল।

বুলিকে কাজের সাহায্যার্থে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য দুটো। একটা হচ্ছে বড় হয়ে যাওয়া মেয়েটাকে ছাড়া গরুর মতন একা বাড়িতে রেখে আসা যায় না। আগে ইস্কুল যেতো, এখন সে পাট ঘুচেছে। এখানে কাছে পিঠে মাত্র 'অষ্টম শ্রেণী' পর্যন্ত পাঠক্রম সম্বলিত স্কুল। হাইস্কুলে যেতে হলে অনেকটা হাঁটতে হয়। তো ওই আওপাতালি মেয়েটির আমার রোদ লাগলে মাথা ব্যথা করে। অতএব এখানেই ইতি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এ বাড়িতে এসে নিজের ঠাকুমা অধ্যুষিত রান্নাঘর থেকে খাওয়াটি জুটবেই। ভালোমতোই জুটবে। এখানে নিত্যই কত চর্ব্য চোষ্যের আয়োজন। নিজেদের সংসারে কী রান্না কী বা খাওয়া! আর এ সংসারের গিন্নীর এমন নিচু মন নয় যে ভাবতে যাবেন, 'এই দ্যাখো একটা মেয়ের বাড়িতে খাচ্ছে।'

এ পর্যন্ত বুলির ঠাকুমার হিসেবটি ছিল খুবই ঠিকঠাক। অপছন্দ করা তো দূরের কথা, পরমেশ্বরী নিজে থেকেই বলেন, অ বামুনদি, আঁশ ছিল তোমার নাতনিকে দাওনি? অ বামুনদি, নাতনিকে তো একটু সন্ধে সন্ধেয় খাইয়ে দিতে পারো। ওর বাবা ওকে নিতে এসে বসে থাকে।···কোনো কোনোদিন এও বলেন, আহা তোমার ছেলে বেচারি মেয়ে নিয়ে যেতে

কতক্ষণ বসে থাকবে ? তুমি বরং ওর খাবারটা গুছিয়ে সঙ্গে দিয়ে দাও।' আর শোনো, তোমার ছেলেকেও একটু চা-টা খাইয়ে দাওনা কেন ? ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করে অফিস থেকে তেতেপুড়ে আসে।

কিন্তু কপালে সুখ সইলে তো ?

এমন পরম সুখময় অবস্থার মধ্যে হঠাৎ আবিষ্কার—বুলি আর বলরাম 'ভাব ভালবাসা' করে মরেছে। গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে করে শ্রীনাথের মা'র।··· কী আসপদ্দা। গয়লার ঘরের ছেলে হয়ে তুই বামুনের মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা করতে আসিস ?···আর বুলিকেও বলিহারী দিই। তোরই বা এমন নিঘিন্নে প্রিবিত্তি হলো কী করে ? আজই না হয় তোর মা ঠাকুমা অবস্থায় পড়ে লোকের বাড়ি রাঁধুনিবিত্তি করে পেট চালাচ্ছে, বাপ কারখানার কাজে ঢুকেছে। তোর ঠাকুদ্দা আর তার গুষ্ঠির সবাই যজমানী ব্রাহ্মণ ছিল না ? বাড়ি বাড়ি পুজো আচ্চা করে বেড়াতো না ?···আর তুমি ধিঙ্গী মেয়ে ওই চাকর ছোঁড়ার সঙ্গে গুজ গুজ ফুস ফুস চালাচ্ছে হি হি করে ইয়ার্কি মারছে।···ওই বলরামের বাপ একদা এ বাড়িতে দুধ জোগান দিত না ? তো সে হঠাৎ মরে গেল বলে ছেলেটা এ সংসারে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। ···এরা মহৎজন, ছেলেটাকে মানুষ করতে ইস্কুলেও দিয়েছিল, তো মাথায় ঘিলু থাকলে তো ? পড়ালেখা ছেড়ে চাকরগিরিই ধরলো। হলে কী হবে, সাজের কী ঘটা ! সর্বদা মটমটে শার্ট পেণ্টুল। এ যুগে হয়েছে ও যা। কী ভদ্দর কী ইতর কোনো ছেলেটা আর কাপড় পরে না। সব ওই পেণ্টুল পায়জামা। চিনতে পারবে না তুমি, কে বাবুর বাড়ির ছেলে, কে খেটে খাওয়া ঘরের ছেলে।···ওই সাজই কাল করেছে। তাতেই ছোটবড়জ্ঞান কমে গেছে। যেন 'তুমিও যা আমিও তা'। তাই তুই ছোঁড়া গোকুল ভটচার্য্যির নাতনি শ্রীনাথ ভটচার্য্যির মেয়ের সঙ্গে 'ভাব' করতে আসিস।

সর্বদা মনে মনে গজরায় বুলির ঠাকুমা, কিন্তু করার কিছু খুঁজে পায় না। ···ডেকে ডুকে বুলিকে কিছু শাসন করতে গেলে হয়তো উল্টো উৎপত্তি হবে। যে মুখরা মেয়ে হয়তো ঠাকুমাকে একশো কথা শুনিয়ে থুড়ে দেবে। আর

বেমালুম নিজের দোষ অস্বীকার করে মায়ের কাছে ঠাকুমার নামে সাত-খানা করে লাগাবে মা কী আর মেয়ের কথা উড়িয়ে দিয়ে শাশুড়ির কথা বিশ্বাস করবে ?

আবার এদিকে ওই লক্ষ্মীছাড়া পাজী বলরামকে টাইট দিতে গেলে, কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। হয়তো পাড়ায় বলে বেড়াবে বুলির ঠাকুমার কী নিচু মন ! এই সব বাজে কথা বলেছে। তাতে বুলিরই ক্ষেতি। আই-বুড়ো মেয়ে। আজ পনেরো বছরের আছে কাল কুড়ি হয়ে বসবে। এখন পনেরোয় খুকি। মা বাপ বিয়ের কথা তোলেই না। 'মেয়ে তোমাদের 'ভাব' করতে শিখেছে' বলতে গেলে রেগেই যাবে।

অতএব করবার মধ্যে বলরামকে আরো বেশি করে হু'চক্ষের বিষ দেখা। কিন্তু 'টাইট' দেবার উপায় থাকলেই কী কিছু কাজ হতো ? টাইট দিয়ে কখনো কোথাও কেউ কারো প্রেম করা আটকাতে পেরেছে ? সেই কোন্ কালের ইতিহাস। জাঁহাবাজ জটিলা কুটিলা পেরেছিল ?···এঁটে ওঠা যায় না।

ওটি হচ্ছে একাল সেকাল চিরকালের।

তাছাড়া শহরের ছেলেমেয়েদের থেকে গ্রামের ছেলেমেয়েদের 'প্রেমে পড় প্রেম করা' এ সবের সুবিধে অনেক বেশি। শহরের মেয়েগুলোর অন্তত গতি-বিধির ওপর মোটামুটি কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকে। গ্রামের মেয়েদের তো তা নেই তারা মাঠে জঙ্গলে আগানে বাগানে কখন কোথায় ঘুরছে কে হিসে রাখতে চায় ?

সমীক্ষা নিলে দেখা যাবে বাল্যপ্রেমের চাষ গাঁয়ে গঞ্জেই বেশি।

শ্রীনাথের মা নেহাৎ আগের আমলের না হলেও কম দিনেরও নয় পরমেশ্বরীকে 'বৌ' অবস্থায় দেখেছে। তবু সাহস করে তার গোচরে খবরটা আনতে পারে না।···

আবার ভাবে ওনাকে বলেই বা কী হবে ?

'মনের দেওয়ালেরও কান আছে' এইরকম একটা মনোভাব নিয়ে চুপি চুপি ভাবে বুলির ঠাকুমা, 'নিজেই বা কী বাবা। মিথ্যে বলব না এদিকে

অবিশ্যি গুণের আধার মায়ামমতা কর্তব্যবোধ, মানুষকে মনিষ্যিজ্ঞান কিন্তু ওই একটি জায়গায় ? চিরটাকাল ওই সোহাগের ননদাইটিকে নিয়ে কী আদিখ্যেতা। সোয়ামী দেবতুল্য তাই। নচেৎ অন্য হলে ওই আপদকে কবে বিদেয় করে দিত চিরকালে কথা 'বৌ নেই শ্বশুরবাড়ি যায় পূর্বের সম্বন্ধে।'…তোর এ তো যাওয়া নয়, শেকড় গেড়ে বসে থাকা। আজন্মকাল জামাই আদরের ওপর রইলেন। হায়ালজ্জার বালাই নেই।

তার মানে মনের মধ্যে কথার চাষটি সকলেরই। বাইরে থেকে বোঝা যায় না কার ভেতরে কী! আর ওই সত্যি যাদের বোকা মুখ্যু অবোধ ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়, তারাই ডেঞ্জারাস।

পরমেশ্বরী ধারণা করতে পারেন, ওই চোখে খাটো কানে খাটো নিরক্ষর বুড়িটি তাঁর সম্বন্ধে এমন চিন্তা করে চলে। আর এও কী ধারণা করতে পারেন এ যাবৎকাল যে কাজটিকে তিনি নিতান্ত নিঃশব্দে করে চলেছেন এবং ভেবেছেন তিনি আর সরকার মশাই ছাড়া আর কারো জানা নেই, সেটি অনেকেরই জানা। কার্তিক অবশ্য নিজের স্বার্থে 'মন্ত্রগুপ্তি' করে এসেছে খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে। কারণ এই লাভজনক বিজনেসটি সে 'একান্তই নিজের' খাতে রাখতে চায়। তার জন্যেই শালার সঙ্গে শেয়ার করে আলাদা দোকান করা। এই সর্বেশ্বরীতলার দোকানটির লাভ লোকসান হিসেবটি তো বিধবা মাকে আর ছোট ভাইকে দেখাতে হয়। তাদেরকে শুধু 'লোকসানের' হিসেবটা দেখানোই নিরাপদ।

কিন্তু আর কারো তো মন্ত্রগুপ্তির দায় নেই।

ফিচেল আর ঘোড়েল 'বলরাম' সবই জেনে বসে আছে। ঠিক করে রেখেছে তার ওপর কোনো সময় কোনো কারণে 'আক্রমণ' এলে ওই ঘুঘুবুড়ো শিবশম্ভু ঘোষালের সব কিছু ফাঁস করে দেবে। এই রাজবাড়ির কত কী তলে তলে পাচার করছ তুমি, বলরাম জানে না ? কোরগে যা। তো বলরামও যে কিছু না করছে তা নয়। তবে ওরা কাজটা রয়ে সয়ে ভয়ে ভয়ে এই সরকার বুড়ো গিন্নীমাকে 'হাত' করে এন্তার করছে। সে তুলনায় বলরাম তো নস্যি। তবে একটা পুরনো কালের বড়লোকের বাড়ির বাইরের

চৌকাঠ থেকে ছাদের মাথা পর্যন্ত কত কত জিনিসই ছড়িয়ে থাকে। কে হিসেব রাখে? এখন সব কিছুরই অনেক দাম। সারা বাড়িটার দরজা জানালায় যে সব পেতলের কব্জা ছিটকিনির হরিরলুঠ, তার থেকে বিশ পঞ্চাশটা সরিয়ে নিলেও কারুর নজরে পড়বার প্রশ্ন নেই অথচ আজকের বাজারে এক একটি বেচলেই—

এইভাবে হয়তো পুরনো কালের বনেদী বাড়িগুলো আস্তে আস্তে নিঃস্ব হয়ে যায়।···দৈন্যদশাগ্রস্ত উত্তরাধিকারীরা থাবা বসায় মূল ভাঁড়ারে আর এইসব 'অভাজন' সাফাই করে চলে ভাঁড়ার বহির্ভূত মাল। সেকালে বড়-লোকেদের বেহিসাবী অপচয়ের তো সীমা ছিল না। ভাত খাবো রুপোর থালায়, পান খাবো রুপোর ডিবেয়, স্নান করবো রুপোর ঘড়ার জলে। ঠাকুর ঘরে বাজবে রুপোর কাঁসর ঘন্টা! কর্তারা গত হলেও সে সব হাওয়া হয়ে যাবে না?

বলরাম ওই উঞ্ছবৃত্তি করেই আস্তে আস্তে পকেট ভরাচ্ছে। যেমন ভরিয়ে থাকে 'পড়তি ঘরের' লোকজনেরা। বলরামের তাই বুকে বল।

ওদিকে বুলি আবার কার্তিকের বোনের প্রাণের বন্ধু। সেখানে থেকেও অনেক খবর বিনিময় হয়। অথচ এই রাজবাড়ির আসল বাসিন্দা তিনজন কানামাছি খেলা খেলে চলে!

শিবশম্ভু খেতে বসেই অনুযোগের গলায় বলে ওঠেন, আচ্ছা বামুন মা এই সাতসকালে এমন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করার কী দরকার ছিল বলুন তো? ভাতে দু'টো আলু কাঁচকলা ফেলে দিলেই তো খুব ভালো খাওয়া হয়ে যেতো।

বামুন মা গলা নামিয়ে বলেন, সে তো তুমি বললে বাবা। আমিও বুঝলুম। কিন্তু বাড়ির গিন্নীর যে হুকুম দশটার মধ্যেই যেন সমস্ত রান্না হয়ে যায়, সরকার মশাই ভাত খেয়ে কলকাতা যাবেন।

কোনো দরকার ছিল না—

সুক্তর বাটিটা পাতে উপুড় করে বলেন, কতো আনাজ। শুধু এতেই খাওয়া

হয়ে যেতো। চার পাঁচটা বাটি সাজিয়ে—খেয়ে ওঠা যায় না।

জানি তো বাবা তোমার পাখির আহার। তবে মাছ, মাংস খাও না, নিরিমিষ পদ ছু' চারটে করতে হয় বৈ কি।

না না। কোনো দরকার হয় না। গরীবের ছেলে এক তরকারি ভাত খেয়েই মানুষ। রাজবাড়িতে এসেই—

সামনে ছায়া পড়ে।

পরমেশ্বরী। হাতে একটা ছোটবাটিতে দৈ। নামিয়ে দিয়ে একটু হেসে বললেন, আমিও গরীবের মেয়ে সরকার মশাই। এক তরকারি ভাত খেয়েই মানুষ। আমারও রাজবাড়িতে এসে অভ্যেসের বদল। ভাত তো যৎসামান্য খান, মাছও খান না। ছু'টো শাক পাতা না খেলে শরীর বইবে কী করে? ওই তো হাওয়ায় উড়ে যাওয়া শরীর।

শিবশম্ভু খেতে খেতে মুখ তুলে একবার দেখে নিয়ে আবার মুখ নামিয়ে বলেন, আর বেশিদিন বইবার কী দরকার?

পরমেশ্বরী জোরে হেসে ওঠেন, কী বলেন সরকার মশাই? রাজবাড়ির গিন্নীকে গঙ্গাপার করা পর্যন্ত আপনার ছুটি মঞ্জুর হবে না কী?

বৌমা ঃ এ শাস্তিটাও আমার জন্যে ভেঁজে রেখেছেন!

তা নিজে শান্তি পাবার তালে সর্বদাই তো আমরা অপরের শান্তি ঘটাতে ওস্তাদ। বামুনদি দৈ-তে একটু চিনি দাও।

সরকার মশাই দৈ-তে চিনি খায় না। লবণ দে খায়।

ও। তাই বুঝি? আচ্ছা সরকার মশাই, এই আপনার ফর্দ রইল। আর টাকা তো—

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো দেওয়াই আছে।

উঠে পড়লেন খাওয়া সেরে।

বাঁ হাতে সেই ফর্দর কাগজটা তুলে নিয়ে।

কী আশ্চর্য! আবার চারটে গেঞ্জি। ছু'টো ছত্রিশ ইঞ্চি ছু'টো বেয়াল্লিশ ইঞ্চি।...আবার বিছানার চাদর ছু'জোড়া। একজোড়া ডবল, একজোড়া সিঙ্গল।...

পড়তে পড়তে এগোতে থাকেন শিবশম্ভু।

এই তো কবে যেন এসেছিল এসব।…আর আশ্চয্যি ব্যাপার দু'টো ঘরের জিনিস কী ষড়যন্ত্র করে একই সঙ্গে জবাব দেয়?…আরো রয়েছে—

১। তেল ৩ শিশি

২। টুথপেস্ট ২টো

৩। সেফটি রেজার ২ প্যাকেট

৪। সাবান ছ'খানা

৫। ক্রীম ২ শিশি

৬। বডি পাউডার ২টি

পড়তে পড়তে শিবশম্ভুর মনের মধ্যেকার মুখে একটু ব্যঙ্গহাসি ফুটে ওঠে। …না আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 'ঘরজামাই আর পুষ্যিপুত্তুর'—সমাজে এদের জন্যে তো এইরকমই ব্যবস্থা।

একটা নিশ্বাস ফেললেন। টুনটুনি নামের সেই মেয়েটা যদি অমন অকালে চলে না যেতো! এ সংসারের চেহারা কত অন্যরকম হতো!

আশ্চর্য! ঠিক এই একই সময় পরমেশ্বরীও ঠিক ওই কথাটাই ভাবছিলেন, টুনটুনিটা যদি থাকতো, আমার দায়িত্বটা কত কম হতো। বড় ভালো ছিল মেয়েটা—সরল সাদাসিধে। একটু অবশ্যি বোকা। তা হোক। আপন স্বামী সংসারটি নিয়ে তো সুখে থাকতে পারতো।…আচ্ছা আমার পজিশানটা তখন কী রকম হতো? তাকেও কী এদেরই মতন আমার একটা 'পোষ্য' হিসেবে ধরে নিয়ে এইভাবে কত্তাত্বি চালিয়ে চলতাম?… না কী চিরকালীন ননদ ভাজের বিরূপ সম্পর্ক নিয়ে—কী জানি। তবে মেয়েটা অকালে অসময়ে মরে গিয়ে আমাকে চিরকালের মতো বিপদের আগুনে ঝলসাতে রেখে গেছে।

হঠাৎ মনে পড়ল, সরকার মশাইকে 'দেয়' বস্তুটা দেওয়া হয়েছে তো?… হ্যাঁ, কাল বিকেলেই দিয়ে রেখেছেন।…বিয়ের আগে পাকা দেখার সময় শ্বশুর একখানা 'গিনির মালা' দিয়ে আশীর্বাদ করে এসেছিলেন। তখন বনেদী ঘরে ওটা একটা প্যাটার্ন ছিল। সদ্যোজাত নাতির মুখ দেখতে

গিনি, তার মুখে ভাতের সময় গিনির মালা!…তো পরমেশ্বরী এখন তাঁর সেই গিনির মালা থেকে দু'খানা একখানা করে গিনি খুলে নিয়ে সরকার মশাইয়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন। মালাটা ছিল একুশ গিনির।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা ভয় গ্রাস করে বসে পরমেশ্বরীকে—আমি তো ভাবছি আমার জীবদ্দশাটা এইভাবেই চলে যাবে।…কিন্তু সেই জীবদ্দশাটা যদি হঠাৎ নিকট সীমায় চলে আসে?…মাঝে মাঝেই যেন মনে হয় ভেতরে কোনো বলশক্তি নেই। হঠাৎ মরে গেলে ওই অসহায় লোক দু'টোর কী অবস্থা হবে? কী দেখবে লোক দু'টো চিতার ধোঁয়া থেকে সরে এসে? 'পরমেশ্বরী' নামের একটা বিশ্বাসঘাতক মেয়ে তাদের স্রেফ ধনে প্রাণে মেরে গেছে।

তা প্রাণেও বলতেই হবে। পরমেশ্বরী তো ওই দু'-দু'টো পুরুষেরই প্রাণ-পাখি।

পরমেশ্বরী নিজের জন্যে দীর্ঘজীবন কামনা করে। বলে ঠাকুর পরে আমার যা হয় হোক, এরা থাকতে যেন আমি না মরি।…বাঙালির মেয়ে হয়েও এমন অদ্ভুত একটি কামনা করেন পরমেশ্বরী।…আর এও আশ্চর্য কোনো সময়ই, নিজস্ব জীবনটিকে নিয়ে ভাবতে পারেন না।…সেখানে আরও একটা উজ্জ্বল উপস্থিতি পরমেশ্বরীকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে, এলোমেলো করে ফেলে।

সত্যিই গরীবের মেয়ে ছিলেন পরমেশ্বরী।

বাবা ছিলেন যৎসামান্য একটি প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার।…তখন পরাধীন দেশ। স্কুলমাস্টারদের সম্পর্কে কোনো মর্যাদা বোধ আসেনি সমাজে। সমাজে আর আসবে কী করে? যতক্ষণ না প্রশাসনে আসছে? আইনে আর প্রশাসনে স্কুলমাস্টারদের জাতে না তোলা পর্যন্ত এরা ছিল একটা নেহাৎই দুঃখী জাত। পরমেশ্বরী তেমনি একটা দুঃখীর মেয়ে। এই রূপনগর থেকে দুটো গ্রাম দূরে রাধানগর। সেখানেই পরমেশ্বরীর শৈশব এবং বাল্য কেটেছে।

তবে ভাগ্যের অশেষ দান মাস্টারের মেয়ের অনবদ্য রূপ।···মা বাপ দুজনেই সাধারণ দেখতে, অথচ মেয়ে জন্মালো অ-সাধারণ।···সবাই বলতো রংটা একটু 'চাপা' তাই। না হলে বলতে পারা যেত তুলনা খুঁজতে লক্ষ্মী সরস্বতীর কাছে যেতে হতো! সেই মেয়ে রোদের বিকেলে স্কুল থেকে ফিরছিল, মুখে ঘাম, চুলে ধুলো। সস্তামার্কা একখানা রঙীন শাড়ি পরনে। মেয়েদের স্কুল সে অঞ্চলে ওই একটিই ছিল, বাড়ির থেকে অনেকটা দূরে।··· অতএব রোদে জলে অনেকখানিই পথ হাঁটা।

হাঁটছিল নিত্যদিনের মতোই। কিন্তু কী ছিল বিধাতার মনে।···বিক্রমেন্দ্র রায়ের ঠিক সেই সময়ই সেই রাস্তায় দরকার পড়েছিল।···জুড়ি ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। কাছে এসে বললেন, কাদের মেয়ে?

মেয়েটা গম্ভীরভাবে বলল, মাস্টার মশাইয়ের মেয়ে।

মাস্টারমশাই? কোন্ স্কুলের?

রাধানগর প্রাইমারি স্কুলের।

নাম কী?

সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়।

মুখোপাধ্যায়। সত্যব্রত। বাঃ।

মেয়েটা হঠাৎ ভুরু কুঁচকে ওই 'জমিদার সদৃশ' মানুষটি আর তাঁর জুড়ি ঘোড়ার গাড়িটির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, এতে আবার 'বাঃ'-র কী আছে?

আছে। আছে। আর তোমার নাম?

পরমেশ্বরী মুখোপাধ্যায়।

বাঃ বাঃ। আমায় তোমাদের বাড়িতে নিয়ে চলো তো!

আমাদের বাড়িতে? কেন?

দরকার আছে গো মালক্ষ্মী।

সাড়ে তেরো বছরের পরমেশ্বরী হঠাৎ এই 'মালক্ষ্মী সম্বোধন' আর উপযাচক হয়ে তাদের বাড়িতে যাবার প্রস্তাবে একটা ভয়ের আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে আস্তে বলে, সে অনেকটা দূর।

বাঃ তুমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছ!

আমাদের অভ্যাস আছে।
বলেই স্বভাবগত প্রগল্‌ভতায় বলে উঠেছিল, না থাকলে চলবে কেন? আমাদের তো আর জুড়িগাড়ি থাকে না।
হ্যাঁ, চিরদিনই প্রগল্‌ভা। মা বলতো, তোর কথার তোড় একটু কমাবি খুকু?...
আর পিসি বলতো, এতো কথার মেয়ে। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বুঝবে ঠ্যালা।...
কিন্তু এই প্রগল্‌ভতাই যেন বিক্রমেন্দ্র নামের মানুষটাকে অধিকতর আকর্ষণে টেনে নিয়ে যেতে চাইল।
ছ্যাখো আমিও পারি কিনা হাঁটতে।
তা আর পেরেছেন। চলুন বরং আপনার ওই গাড়িটাতেই উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেখিয়ে দিইগে।
এতে বিক্রমেন্দ্র আরো মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেটা পরে বলেছিলেন। হেসে হেসে। তিনি অবশ্য একবার ভেবেছিলেন এ কথাটা। কিন্তু প্রস্তাব করতে সাহস পাননি। যদি মেয়েটা এটাকে 'ভয়ঙ্কর' কিছু একটা ভেবে বেদম ছুট দেয়।
গাড়িতে উঠে অবশ্য মাস্টারের আস্তানায় পৌঁছতে সামান্যই সময় লেগেছিল। নামবার আগে বিক্রমেন্দ্র বলেছিলেন, আচ্ছা তুমি তো আমায় চেননা, জীবনে কখনো দেখওনি। সাহস করে আমার গাড়িতে উঠে পড়লে যে? আমি যদি গাড়ি অন্যমুখো ছুটিয়ে তোমায় আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলতাম?
এ প্রশ্নটি করেছিলেন কা মেয়েটার বুদ্ধির পরীক্ষা করতে? না কি সাহসের? তা পরীক্ষায় ফেল মারেনি পরমেশ্বরী নামের সেই বালিকা। বলে উঠেছিল, মানুষকে দেখলেই বোঝা যায় সে খারাপ না ভালো।
তুমি এতটুকু মেয়ে বুঝতে পারো?
কেন পারবো না? না পারলে গাড়িতে চড়তুম নাকি? বোঁ করে পালিয়ে যেতুম।
সেই তখনি 'পরমেশ্বরী' নামের মেয়েটা আপন ভবিষ্যৎ চোখের সামনে

দেখতে পেয়েছিল। রূপকথার বা ব্রতকথার গল্প-টল্পর মতো এই রাজতুল্য ব্যক্তিটি নিশ্চয় তাঁর ছেলের বৌ করতে সত্যব্রত মাস্টারের মেয়েটাকে নিয়ে চলে যাবেন।

তা যা ভাবনা, তাই ঘটনা।

বৌ সর্বাঙ্গে সুন্দর। কিন্তু রংটি তেমন নয়। গৌরাঙ্গী বলা চলে না। রংটি অনেকটা সন্থ মোচড় খুলে ছড়িয়ে পড়া কচি কলাপাতার মতো। যাতে তখনো সবুজের আভা ধরেনি। কী বলা হয় এমন রংকে ?

বিক্রমেন্দ্র গিন্নীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তা জামাই তো এনে দিয়েছি হুধে-আলতা। ছেলের বৌ না হয় ততটা নাই হলো।···আমি বলব, এই মুখশ্রী আর গড়ন পেটনে তোমার গিয়ে মেমের মতো ফর্সা হলে ঠিক খাপ খেত না।···তাছাড়া সেটা পাচ্ছিই বা কোথায় ? বিধাতাপুরুষ একা-ধারে সব ঢেলে দেন না। হিসেব করে দেন। এই যে তোমার।···রাগ কোরোনা, কাঁচা হলুদের মতো রং হলেও নাকটি থেবড়ির মতো। এর কারণ কী ? ওই ? একধারে সব ঢেলে মেপে দিতে রাজি হন না বিধাতা ! তবে বৌয়ের প্রগল্‌ভতায় শাশুড়ী ঠ্যাঙাতে আসেননি। বলতেন, বৌমা চুপ করে থাকলে যেন চেহারা খোলে না। ওই যে চোখে-মুখে কথা কয় চোখমুখ দিয়ে আলো ঠিকরোয়।···কথাও তো মধুমাখা !

ভাগ্যবতী বৈকি ! খুবই ভাগ্যবতী পরমেশ্বরী নামের মেয়েটা। তখন তাই বলেছিল সবাই। কিন্তু 'নিঃসন্তানত্ব' লোকের চোখে অনেকটা নামিয়ে আনে।

কিন্তু সেই অপ্রাপ্তির শূন্যটিই তো পরমেশ্বরীকে হাওয়ায় ভাসতে পাওয়ার সুখটি দিয়েছে।

এও অবশ্য সেই মনের গহনের চিন্তা-ভাবনা। বাইরে প্রকাশ না হয়ে পড়লে ছি ছি ক্কারে কান পাতা যাবে না। আমসত্ব চাখতে চাখতে বুলি বলল, এই বলা, বলেছিলি যে নতুন 'হল'-এ সিনেমা দেখাবি। তার কী হলো ?

তুই আমায় বলা ডাকটা না ছাড়লে ওসব হবে টবে না।

তবে কী বলতে হবে ? বলু ?

গাঁট্টা খাবি। কেন একটু সভ্যভাবে ডাকা যায় না ? 'বলা'। শুনলে মাথা জ্বলে যায়।

আচ্ছা এরপর থেকে বলরামবাবু বলব। এখন এই নে-আমসত্ব খা।

বলো 'বলাইদা' তবে নেব।

বুলি মুখ ভেঙিয়ে বলে, আহা মরে যাই। কী বুদ্ধি! 'বলাইদা' বলে মরব কেনরে ? ভবিষ্যৎ খোয়াতে!

বুলি!

এই কাঁধ ছাড়। বাবাঃ। কি শক্ত আঙুলরে। যেন লোহার সাঁড়াশী!

বুলি আমাদের কী 'ভবিষ্যৎ' বলে কিছু আছে ? তুই ভট্‌চাযি্য ঘরের মেয়ে, আর আমি গয়লা ঘরের হ্যাৎ! ওসব আবার আজকাল কেউ মানে নাকি ? বলছিস ?

বলবনা কেন ? এসব পচা নিয়ম উঠে গেছে।

বলরাম তবু বলে, সে উঠে যায় তেমন জুৎসই পাত্তর পেলে। আমি তো একটা 'ক' অক্ষর গোমাংস।

তা কুড়ি বছরের ধাড়ি অমন গোমুখ্যু হয়ে অছিসইবা কেন ? জন্মানোটা না হয় নিজের হাতে নয়, ভগবান যাকে যে ঘরে চালান দিয়েছে। কিন্তু বিদ্যে-বুদ্ধিটা অর্জন করা নিজের হাতে।

বুলি হি হি করে হেসে উঠে বলে, হ্যাঁ। আমি হামা টানতে টানতে তোকে বুদ্ধি দিয়ে যেতুম। তুই আমার থেকে ছ'সাত বছরের বড় না তো ? ঠাকমার মুখে তো শুনি বাবুরা তোকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল।

ওই তো। মন লাগেনি। তবে—

মুখে মুখে একটু তুখোড় হাসি ফুটিয়ে বলে বলরাম, তবে যার জন্যে লেখা-পড়া শেখা, সেটা হলেও তো চলবে ?

কী ?

আরে বাবা টাকা পয়সা উপায়। সে আমি খুব শিখে যাব!

বুলি আমসত্বর হাতটা চাটতে চাটতে বলে, তাতেও হয়। তবে এখনকার

কালে একেবারে মুখ্যুর বাজার দর নেই।

আহা তাই না হয় চেষ্টা করব। কিন্তু তোর আমার মিলন কী সত্যিই হবে?

নাটুকে কথা বলিসনে বলা। হতে আবার পারবে না কেন? তবে নিজেরা ম্যারেজ আপিসে গিয়ে বিয়ে করতে অনেক ধৈর্য্য ধরতে হবে। তুজনে সাবালক না হলে তো চলবে না।

একথা কে বলেছে তোকে?

বলবে আবার কে? কতোকি আপনি দেখা হয়ে যায়।···তো হি হি, আমি তো কোন্ পেতনী। ঠাক্‌মার থেকেও এককাঠি সরেস। আমার জন্যে হা হুতোশই বা কেন? তোদের ঘরে কত সুন্দরী মেয়ে আছে।

খবরদার অমন কথা বলবি না বুলি। তোর সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছে। এখন অন্য মেয়ে দেখাতে আসছিস?

ঠিক আছে থাক ধৈর্য্য ধরে। দিন এলে হবে। ততদিন খুব টাকা জমা। টাকাই আসল বস্তু। নে তেঁতুলের আচার খা।

এতসব কে তৈরী করে রে? বড় মা?

ধ্যেৎ! বড়মা এইসব করতে বসবে? ঠাক্‌মা করে। কেউ বলেনা, তবু বুড়ি খেটে খেটে মরে। বলে, এতো জিনিস ঘরে। আর হেলায় ফেলায় নষ্ট হয়।

তোকে দেয়?

তা দেয়। চুপি চুপি ডেকে খাবলা-খাবলা দেয়। এদিকে তো আমায় বিষ নজরে দেখে।

বিষ নজরে দেখে? তোকে?

আগে দেখতো না, এখন দেখে?

কেন?

আহা ন্যাকা। তোর সঙ্গে প্রেম চালাচ্ছি। ঘুঘুবুড়ি সেটা বুঝতে পারেনা বুঝি?

আচ্ছা বুলি, বুড়োরা এতসব বুঝতে পারে কী করে রে?

আহা ন্যাকা চণ্ডী। তারা যেন আর কখনো যুবো ছিল না! তো বুড়োরাই

কী আর 'প্রেম' জানেনা রে ?

বুলি হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে 'ওপরতলার দিকে তাকিয়ে দেখিস' হাড়বুড়ো-রাও-হি হি খবরদার বলবিনা কাউকে।

বলরাম হঠাৎ চমকে উঠেই সন্দেহের গলায় আস্তে বলে, কেন রে? 'কিছু' দেখেছিস নাকি ?

মরণ !

বুলি পাকা গিন্নীদের মতন মুখ করে টেপা হাসি হেসে বলে নতুন করে দেখবো আবার কী রে! ওই ষাট সত্তরের বুড়ো-বুড়িদের? হি হি হি! কেন এমনি দেখিসনা, তিন বুড়োবুড়িতে যখন গালগল্প করে, মুখে কী আহ্লাদের জেল্লা ফোটে ! ওর নামই 'প্রেম' ? এই হলো রাজনগরে ওই বয়েসের বুড়ো-বুড়িদের দেখিস দিকিনি তাকিয়ে। সব সময় যেন নিমপাতার পাঁচন গিলে বসে আছে।

আচ্ছা বুলি।

কী

তিনজনে আবার 'প্রেম' কী ?

ওমা কেন হবে না ? এ হচ্ছে বন্ধুতা-প্রেম। ও তুই বুঝবি না। বড়মা অন্য স্টাইলের মেয়ে।

কাউকে বলবি না ? তলে তলে এই রাজবাড়ির সব জিনিস বেচে দিচ্ছে।

জানি।

জানিস ?

হ্যাঁ আমার বন্ধু মুনমুন তো কেষ্ট স্যাকরার বোন। তো বেচছে তার কী ? তোর জিনিস বেচছে ? মরে গেলে তো তোর আমার মতন বাইরের লোকেরা বেচে খাবে বাবা! এই তুইই তো ওৎ পেতে আছিস। এই রাজবাড়ির ইট কাঠ কাচ পাথর বেচে খেতে খেতে তোর জীবন কেটে যাবে।

তোর কথাগুলো বড্ড ঝাঁজালো বুলি। যেন ধানি লঙ্কা।

তো সাধ করে তো এই ধানি লঙ্কার চাষ বুনতে চাইছিস। সারা জীবন জ্বলে মরতে হবে, তা মনে রাখিস।

বলরাম মুচকে হেসে বলে, ওই তো মজা। ঝালে হুশহাস করবো, চোখ দিয়ে জল ঝরবে, তবু খাবো। সেটাই তো সুখ। আচার আর আছে না কী? মানুষ যখন একটা নিশ্চিন্ত সুখের অবস্থায় কাটাতে পায়, ভাবে এই রকমই বোধহয় চিরদিন চলবে।

এই রাজবাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে হয়তো সেই কথাই লেখা আছে। যাঁরা এই প্রাসাদ গড়েছিলেন, বাহুল্য আর অপচয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এবং জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছিলেন সেই মনোভাব নিয়েই, তাঁরা ভুল করেছিলেন না ঠিক করেছিলেন, সে রায় কে দেবে? তবে দেওয়ালই বলে দেয়, চিরদিন সমান যায় না। যাবার নয়।

রাঘবেন্দ্রর মতো জনেদেরই পূর্ব-পুরুষেরা বেড়ালের বিয়েতে লক্ষ টাকা খরচ করতেন। হাতি চেপে বিয়ে করতে যেতেন, যে হাতির গলায় রুপোর ঘণ্টা ঝুলিয়ে, আর হাওদায় কিংখাব মুড়ে।

রাঘবেন্দ্রর মাতামহকুলের না কি পূর্বে কলকাতা শহরে বাইশ চব্বিশ খানা বাড়ি ছিল। বাড়ি ছিল বিখ্যাত বিখ্যাত সব তীর্থস্থানেও।

যে সবের কোনো চিহ্নই নেই। বংশের কে কোথায় ছড়িয়ে আছে তার হিসেব নেই।

রাঘবেন্দ্র নিঃসন্তান বলেই বোধহয় এই রাজানগরের ভাঙা ইট কামড়ে পড়ে আছেন। পুত্র পৌত্র থাকলে হয়তো তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়ে জুতোর দোকান খুলতো, কিম্বা বড়বাজারের কোনো বড় গদিতে বিল সরকারের চাকরি করতো।

পুরুষানুক্রমে অমিতব্যয়িতা আরম্ভ বর্তমানের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ'-এর সংমিশ্রণে যেমন হয়ে গেছে এদের সমাজের অবস্থা।

না। আরো একটা কারণও ছিল বৈকি! মহৎ কারণ। নেশা! রাঘবেন্দ্রর বাবার আমল থেকে অবশ্য এখানে নেশার চাষ নেই! যার পিছনে শেষ পয়সাটি পর্যন্ত চলে যায়! রাঘবেন্দ্রর ছেলে থাকলে কী করতো বলা শক্ত। হয়তো এই ভাঙা ইটগুলো বেচেও নেশায় চুর হতো।

কিন্তু পুত্র না থাকলেও সে কাজটায় কী আর কেউ রপ্ত হয়নি? রাঘবেন্দ্রর

স্ত্রী ? যে না কি রাঘবেন্দ্রর কাছে যথার্থই 'পরমেশ্বরী'। সেও কী একটা অদ্ভুত নেশায় মেতে সেই একই কাজ করে চলছে না?

নেশা। নেশা ছাড়া আবার কী? নেশায় ডুবে আছে সে। আর ভেবে চলেছে এই ভাবেই বাকিদিনগুলো কেটে যাবে।

কিন্তু হঠাৎ যেন একদিন কী খেয়াল হলো রাঘবেন্দ্রর। এইভাবেই কী চলবে? কবে? কবে হলো সে খেয়াল?

যেদিন বলরাম এসে বলল, রাজাবাবু, আজ আপনাদের বিকেলের আসর উই পশ্চিমের দিকের ঘরটায় বসাতে হবে! বড়মা বলেছিলেন।

রাঘবেন্দ্র বললেন, কেন রে? হঠাৎ এ হুকুম?

আজ্ঞে ক'দিনের জোর বর্ষায় ওই দক্ষিণ বারান্দার একদিককার কার্নিশ ঝুলে পড়েছে, হঠাৎ ধসে পড়তে পারে। আর ছাত থেকে জলও পড়ছে।... তো অসুবিধার কিছু নাই। আপনার গিয়ে চৌকি ফরাস গড়গড়া আরাম চেয়ার ফুলদানী ধূপদানী সব চলে গেছে ওখানে। আর পোড়ো ঘর বলে সকাল থেকে ধুনোর ধোঁয়া দেওয়া চলছে।

আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। বড্ড বকিস বাবা তুই। তোর বড়মাটি কোথায়?

আজ্ঞে ওই ঘরেই কী যেন করতেছে।

বর্ষার আকাশ। ঘরটাও ছায়া ছায়া। একটা জানলার ধারে নীচু একটা জল-চৌকির ওপর বসে পরমেশ্বরী খুব মনোযোগ দিয়ে কী যেন পড়ছেন। কী ওটা? বই তো নয়। হলদে হয়ে যাওয়া একটা পুরনো খাতা মতো না? রাঘবেন্দ্রকে এসে দাঁড়াতে দেখে তাড়াতাড়ি খাতাটি মুড়ে বললেন, কী ব্যাপার? তুমি এ সময়? সাধের ঘুমটি ছেড়ে?

আমি বুঝি সারা দুপুর শুধু ঘুমোই?

ঘুমনোই তো নিয়ম। রাজা জমিদারদের 'দিবানিদ্রা' একটা কিংবদন্তী।

আর রানী জমিদারনীদের?

সে কথা ইতিহাসে লেখে না। আজ থেকে তোমাদের এই ঘরেই খুব ভালো লাগছে না। কিন্তু—ওই বারান্দাটা।

হ্যাঁ বলরাম বলেছে।

রাঘবেন্দ্র ফরসা ধবধবে ফরাসটার ওপর বসে পড়ে বললেন, এধারে যে এই একটা অংশ ছিল আস্ত, একটা ঘরও রয়েছে মনেই ছিল না। বড় হয়ে এ ঘরে কোনোদিন এসে বসেছি বলে মনে পড়ে না। দেয়ালের ছবিগুলো চেনবার অবস্থা নেই। এইটা কার ছবি বুঝতে পারছো?

পরমেশ্বরী বললেন, কারুর নয়। বোধহয় মা সরস্বতীর। এ ঘরে সবই দেব-দেবীর ছবি। ওই উঁচুতে বোধহয় দশমহাবিদ্যার। এই ঘরটা বোধহয় তোমার ঠাকুমার নিজস্ব একটা বিশেষ ঘর ছিল।

ঠাকুমার!

হ্যাঁ গো। 'শতদলবাসিনী' তো তোমার ঠাকুমারই নাম। খুব সৌখিন ছিলেন না?

তা তো জানি না। চোখেই দেখিনি। শুনেছি আমার বাবার জন্মাবার আগে ওনার দুই তিন ছেলেমেয়ে ছোটবেলায় মারা যাবার পর বাবা। বাবার বিয়ে দেবার পরই বোধহয় মারা যান। কিন্তু সৌখিন ছিলেন তা কী করে জানলে?

পরমেশ্বরী হাসলেন, কিছু প্রমাণ কিছু অনুমান। জানো ওই যে কাঠের সিন্দুকটা দেখতে পাচ্ছো? ওর ওপর কত রাজ্যের যেবাজে জিনিস ছিল। তোমায় কী বলব।

কী জিনিস?

কী নয়? বড় বড় ছবির ভাঙা ফ্রেমই বোধহয় দশটা। আরো কতো কী! তোমাদের এখানে প্রতিষ্ঠিত করব বলে ঘরটা সাফ করতে এসে সিন্দুকের ডালাটা খোলালাম বলরামকে দিয়ে। মনে হলো ওটা বোধহয় সেই শতদল-বাসিনীর হাত বাক্স ছিল। কী আছে আর কী নেই। কাঠের সিঁদুর কৌটোই সাত আটটা। রুপোর গোটা তিনেক। মালা ঘুনসি, হাত আয়না। একটা আয়না রুপোয় মোড়া। রুপোর ছড়াছড়ি ছিল তখন। তাই না?

তাই তো দেখি।

এই দ্যাখো, একখানা স্যাকরা বাড়ি থেকে গড়ানো রুপোর মোটা চিরুনী। কালো ভূত হয়ে আছে। ভাবছি সাফ করিয়ে নিয়ে ওতেই চুলের জট

ছাড়াবো।

ওতে কী কাজ হয়? বোধহয় শুধুই বাহার।

বাঃ তা কেন? দিব্যিই চিরুনী। এটা ব্যবহার করলে শেষ বয়েসে একটু রানীগিরি করে নেওয়া হবে। আর

আর কী?

আর? আর সেই পুণ্যবতীর সরল জীবনের একটু স্পর্শ পেয়ে হয়তো জীবনের জটটা ছাড়িয়ে নিতে পারবো।

সেরেছে। তোমার আবার জীবনের জট কী?

পরমেশ্বরী বলে ওঠেন, এ যুগে সকলেরই জীবন জট পাকানো। সেকালে মানুষ অনেক সহজ সুখে ছিল।

ওঃ। তত্ত্বকথা। এত মন দিয়ে কি পড়ছিলে?

শতদলবাসিনী দেবীর ডায়েরির খাতা।

ডায়েরির!

না না ভুল বলা হলো। বলতে হয় হিসেবের খাতা। বড় বড় অক্ষরে কত কীই যে লিখে রেখেছেন মহিলা। এই দ্যাখো লেখা আমার পিত্রালয়ের ঠিকানা। ঈশ্বর চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটি ··লালবাগ মুর্শিদাবাদ। জেলা মুর্শিদাবাদ।···তার পরের পাতাতেই হঠাৎ 'আমার যাবতীয় অলঙ্কারের হিসাব। পিত্রালয় হইতে প্রাপ্ত···শ্বশুরালয় হইতে প্রাপ্ত। তার তালিকা পড়তে বসলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত এতরকম গহনাও যে ছিল জানতামই না।

রাঘবেন্দ্র হাসলেন, তালিকা নিয়ে কী হবে? গহনার বাক্সটা কী তাঁর নাত-বৌয়ের জন্যে রেখে গেছেন? সিন্দুকটা দেখেছো ভালো করে?

খুব দেখেছি। ফোক্কা।

হেসে ওঠেন পরমেশ্বরী তারপর বলেন, একজায়গায় নানান বারব্রতর নিয়ম কানুন ও ব্রতকথার কী সব লেখা আর ঠিক তার পাশেই কিনা হেসে ওঠেন, 'রূপটান ও মাথা ঘষার মশলা প্রস্তুত প্রণালী।'

রাঘবেন্দ্র একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে পরমেশ্বরীকে গালে একটু টোকা

দিয়ে বলেন ফর্মুলাটা শিখে নিচ্ছ না কী ?

পরমেশ্বরী কৌতুকে চোখ নাচিয়ে বলেন, এমনিতেই রক্ষে নেই। আবার রূপটান!

ঠিক। আমিও তো তাই বলছি। ওই লালচে মারা কাগজগুলো থেকে কিছুই পাবেনা।

পাব পাব। 'পাব' কী পেয়েছি। এই খাতার মধ্যে কত কী যে রান্না শেখানো রয়েছে। নিরামিষ সুক্ত থেকে শুরু করে পায়েস পর্যন্ত কত যে পদ! গুনে শেষ করা যায় না আর মাছের তো কথাই নেই। মাংস মুরগি নেই অবশ্য, 'তবে শুধু মাছেরই কত রকম হতে পারে তা ধারণার বাইরে ছিল। পোলাউ, তাই বারো চোদ্দ রকম। তাই থেকে একটা রেসিপি নিয়ে আজ পরীক্ষা করছি। রাতে খেয়ে দেখো।

একটু হাসেন, তবে কিনা এ যুগের উপযুক্ত করে নিতে কিছু কাটছাঁট করতে হয়েছে। যেমন মশলাপাতির যা ওজন লেখা রয়েছে সে আর হবে না। চালের থেকে বাদাম পোস্ত কিসমিস গরম মশলা তিনগুণ বেশী! এ যুগে আর অত খেতে হয় না।

রাঘবেন্দ্র পরমেশ্বরীর দিকে তাকিয়ে বলেন, এ যুগে যে কী খেতে হয় আর কী খেতে হয় না, সে কথা কোনোদিন ভাবো বলে মনে হয় না।

আচ্ছা বরাবর এতো সব হয়ে চলেছে কিসে ?

পরমেশ্বরী কী একবার কেঁপে ওঠেন ? হয়তো ওঠেন! তবু জোরে হেসে বলে ওঠেন এমা। রাজরাজড়াদের মুখে এসব ছোট কথা মানায় ? ছি ছি। তুমি চিরকাল আমার কাছে একটি হেঁয়ালিই রয়ে গেলে।

এই দ্যাখো। কোথায় একটু কবিত্ব করে বলবে 'রহস্যময়ী' তা নয় হেঁয়ালি। তোমাকে আর 'মানুষ' করে তোলা গেল না। মশাইগো, চিরকাল একটা কথা আছে জানোনা ? 'বড় গোলায় তলা।'

জানি। তবে গোলা যত বড়ই হোক একদিন তো শেষ হবে ?

আর আমরাই বুঝি অজয় অমর অশ্বত্থ ? আমরা আর শেষ হবোনা ? এ সব মন মেজাজ খারাপ করা কথা বোলো না বাপু। আজ কোথায় তোমার

ঠাকুমার রন্ধন প্রণালী থেকে গোলাপ পাপড়ির পোলাউ রাঁধছি। আচ্ছা এই শতদলবাসিনী খুব সুন্দরী ছিলেন?

খুব সম্ভব। বড় লোকেরা তো চিরদিনই সমাজ ছেঁকে যত সব সুন্দরী মেয়ে খুঁজে বার করে বৌ করে নিয়ে ঘরে পুরে ফেলতেন। তবে ওনার ওই আপাদমস্তক গহনা পরা আর পুরো জরিতে বোনা বেনারসী কাপড় জড়ানো অয়েল পেন্টিংখানা থেকে সে সৌন্দর্য কী আর খুঁজে বার করা যাবে?

সত্যি বাপু! এত জবড়জং সাজ!

বাঃ! তা না হলে 'রাণী' বলে মানাবে কেন?

তা হলেও। আর্টিস্টদেরই উচিত ছিল এ বিষয়ে বুদ্ধি দিতে।

আর্টিস্ট তো সাহেব।

তারা জানতো রেসপেক্টবল ইণ্ডিয়ান লেডিদের এই স্বাভাবিক সাজ।

পরমেশ্বরী ভুরু কোঁচকালেন। সবাই সাহেব?

সেকালে অধিকাংশই। তাছাড়া ধনীজনেরা সেটাই বেশী পছন্দ করতেন। স্বজাতির সামনে বসে সিটিং দেওয়ার থেকে বিদেশীই ভালো। তারা তো আর দেশী সমাজে গল্প করে বেড়াবেনা, কোথায় কোনো সুন্দরী মহিলাকে দেখেছেন, এঁকেছেন।

এদিকে পর্দাপ্রথাও তো খুব ছিল তখন। আর্টিস্টের সামনে ফটোগ্রাফারের সামনে মেয়েদের বার করা হতো কী করে?

সে এক ধরনের পাসপোর্ট। বংশের ছবিটবি না থাকলেও তো অভিজাতদের মানায়না।

বলেই রাঘবেন্দ্র বলে উঠলেন, আমি হতভাগ্য একেবারে কিস্যু না।

হঠাৎ এমন আত্মনিন্দা?

ভাবছি আমার ঠাকুর্দার মতো প্রেমিক স্বামী হলে তোমার একখানা অয়েল পেন্টিং পোর্ট্রেট করিয়ে রাখতাম।

পরমেশ্বরী একটু হেসে বললেন, পরে কে দেখতো?

এই প্রশ্নটির মধ্যেই অনেকখানি অভিব্যক্তি। পরে কে দেখতো?

দেখে খুশি হবার জন্যে কাকে রেখে যাবে এরা ?

ঘরের মধ্যে একটু বিষণ্ণতার ছায়া।

তারপরই উড়িয়ে দেন সে ছায়া পরমেশ্বরী।

দিদিশাশুড়ীর পুরনো সিন্দুক হাতড়াতে বসে একটু গা ছমছমে ভয় ভয় ভাবও হচ্ছিল জানো ? মনে হচ্ছিল—হঠাৎ কোনো অদৃশ্য কণ্ঠ না বলে ওঠে আঁমার জিঁনিসেঁ কে হাঁত দিঁয়েছিস রেঁ ?

হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

তারপর বলে উঠলেন, তোমার ফ্রেণ্ডটি কোথায় ? এমন বিরহীর মতো একা ঘুরে বেড়াচ্ছো ?

পরমেশ্বরীর জীবনের একটি মস্ত ট্র্যাজেডি, টুনটুনির মৃত্যুর পর থেকেই এই স্বামী নামক প্রিয় পুরুষটির সঙ্গ সুখ বড় বেশী কমে গিয়েছিল। একজন বিপত্নীক পুরুষের নিঃসঙ্গতার ক্ষতে প্রলেপ দিতে রাঘবেন্দ্র সর্বদাই তার সঙ্গে।

পরমেশ্বরীও লজ্জা করতো স্বামীকে নিজের জিনিস বলে সম্পূর্ণটা দখল করে রাখতে। রাত্রিটা ব্যতীত অন্য সব সময়ই রাঘবেন্দ্র মানেই সঙ্গে কুলপতি।

যৌবনে অবশ্য কিছু কিছু 'কাজ'-এর চেষ্টা ছিল রাজবাড়ির বংশধরের। যদিও ব্যর্থ চেষ্টাই, তবু সে সব সময়ে ছুটির দুপুরেও পরমেশ্বরীর দুপুরে স্বামীর সঙ্গে নিজের ঘরে কাটাবে ভাবতে লজ্জা বোধ হতো। ফলে সেই দ্বিপ্রাহরিক আসরটি কমে উঠতো নিদ্রাবিহীন তিন সঙ্গীর খেলায় আর আড্ডায়।

খেলাটা কী ?

হয়তো লুডো, হয়তো বা গোলাম চোর ? আর আড্ডা ? তার কি মাথামুণ্ডু থাকে ? তবে মাঝে মধ্যে হয়তো বর্ষার দুপুরে কুলপতি বেহালা বাজাতেন। ওইটি জানা ছিল তাঁর। হলেও গরীব ঘরের ছেলে, শিখেছিলেন কোনো ভাবে।

কিন্তু শ্বশুর বেঁচে থাকতে ওসব বাজনাটাজনায় হাত পড়েনি।

আসলে ভারী মুখচোরা আর লাজুক প্রকৃতির ছিলেন তখন। পরে অবশ্য রাঘবেন্দ্রর পাল্লায় পড়ে এবং সত্যি বলতে পরমেশ্বরীর পাল্লাতেই পড়ে। লোকটার যেন নির্মোক মোচন হলো।

কিন্তু সে সব কবেকার কথা?

তারপর তো গঙ্গায় অনেক জল গড়িয়েছে। তবে এই রাজনগর রাজবাটির মূল কেন্দ্রটি একই ভাবে আছে। কারণ যেখানে কেন্দ্রবিন্দুতে 'পরমেশ্বরী' নামের এক আশ্চর্য উজ্জ্বল দীপশিখা। সে শিখার সংকল্পই যেন শুধুমাত্র ওই সমবয়স্ক দুটি বয়স্ক পুরুষকে আপন আলোকে আলোকিত করে তাদেরও প্রজ্জ্বলিত রাখা।

আর সংকল্প তাদেরকে রাজবংশীয়র পরিচয় রাখা। কুলপতি এ বংশের নয়? তাতে কী? সেকালে ধনীজনেদের 'ঘরজামাই' তো একটি বিশিষ্ট সদস্য ছিল সংসারের।

সেই সংকল্পে স্থির পরমেশ্বরী এখনো দুই 'বয়স্ক যুবার' আহার বিহার পরিচ্ছদ প্রসাধনে রাজকীয় প্রলেপ বজায় রেখে চলতে চান। এই নেশা! নারী হৃদয়ের শিশুপালনের ব্যাকুল বাসনাটি এইরকম এক অন্য মূর্তিতে পরিতৃপ্ত রাখে পরমেশ্বরীকে?

রাঘবেন্দ্র বললেন, আর বোলোনা। হঠাৎ আজ কী খেয়ালে কুলপতি তার কোন কালের ফেলে রাখা বেহালাটাকে টেনে বার করে ঠিক করতে বসেছে।

তাই বুঝি?

পরমেশ্বরী বললেন, হঠাৎ এ খেয়াল?

কী জানি!

আমার কিন্তু বেহালা শুনলে কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়।

সে তো সুরের নির্বাচনে।

যখন বাজাতেন, তখন বোধহয় ওই সুরটা নির্বাচিত হতো 'দুঃখ দুঃখ' ভাবের! মনে হতো কে যেন করুণ সুরে কেঁদে কেঁদে বিলাপ করছে। বিরহ বিরহ বিলাপ।

যাক গে। একথা যেন বলে ফেলোনা ওর সামনে। তাহলে আবার তার বাঁধা যন্ত্রটাকে ঠেলে ফেলে রাখবে।

হয়েছে। তুমি আর ওর হৃদয় বৃত্তান্ত আমায় শেখাতে এসোনা। ও আমার পড়া পুঁথি।

রাঘবেন্দ্র বললেন, তোমার তো সব পুঁথিই নিমেষে পড়া হয়ে যায়। শুধু তোমাকেই আজ পর্যন্ত কেউ পড়ে ফেলতে পেরে উঠল না!

পরমেশ্বরী একটু প্রায় হতাশ হাসি হেসে বললেন; তোমাকে নিয়ে মুশকিল, কথার মধ্যে লাগসই দুচার লাইন কবিতা আবৃত্তি করে একটু রোমান্টিক হবো, তার উপাই নেই। কিছুই যে পড়া নেই ছাই। ধরে ভদ্র করে পড়ালেও মনে রাখতে পারনা।···

হঠাৎ এখন কোন কবিতার লাইন মনে উদয় হলো।

কত সময় কত হয়। মনের মধ্যেই লয় পায়।···বেরসিককে নিয়ে ঘর করলে যা হয়।

তবু তোমার ননদাইটি একটু বোঝে সোঝে মনে হয়।

ওই জন্যেই তো তার প্রেমে পড়ে মরে আছি।···

বলে হাসতে হাসতে চলে যায় পরমেশ্বরী!

পরমেশ্বরীর মাস্টারমশাই বাবার বাড়িতে অবস্থার অতিরিক্তই ছিল বইয়ের সংগ্রহ তখন। 'রবীন্দ্ররচনাবলীর' জন্ম না হলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই ভদ্রলোকের সংগ্রহশালার মধ্যমণি হয়ে। তাঁর একান্ত চেষ্টা ছিল ছেলেমেয়েকে কবিতা মুখস্থ করানোর। পরমেশ্বরী প্রথম সন্তান, তার ওপর দৃষ্টি ছিল বেশি। আজও পরমেশ্বরী সেই কোন ছোটবেলায় মুখস্থ করা মাঝে মাঝে মনে মনে আবৃত্তি করে।

কিন্তু মনে মনে কেন?

মুখে নয় কেন? পরমেশ্বরীর তো কম বয়েস থেকেই অবাধ জীবন। তবে? ওই তবেটার কারণ পরমেশ্বরীর মতে 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম।' যারা ঠিক বুঝতে পারবেনা রসগ্রহণ করতে পারবে না, হয়তো সেটা পারবেনা বলেই মন দিয়ে শুনবেনা তাদের সামনে, আবার আবৃত্তি। বাস্তবিকই

গান জিনিসটা অল্পবিস্তর সবাই বোঝে। কবিতা খুব কম জনই বোঝে। যে কোনো ভাষাতে হলেও গানের অর্থাৎ সুরের আবেদন সকলের মনকেই ছুঁতে পারে নিরক্ষরের বোবা মনকেও। কিন্তু কবিতা তো তা নয়। কবিতার আবৃত্তির জন্য চাই রসগ্রাহী শ্রোতা।

আগে আগে মাঝে মাঝে পরমেশ্বরী দুটো লোককেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলতো, উঃ, এই রাজবাড়িতে এসে পড়ে আমার সব গুণটুন মাঠে মারা গেল গো। এর থেকে বাবা যদি নিজের মতো একটা ইস্কুল মাস্টার জামাই জোটাতেন গো। তবু সাহিত্য টাহিত্য কাব্য টাব্য একটু বুঝতো। আর এই দুই বুদ্ধু। এঁরা 'গান' বুঝতে বোঝেন কালোয়াতি গান। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত। যার জন্যে বাজনাবাদ্যি নিয়ে বসতে হয়। শুধু গলার 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত'! এর মর্মই বুঝবে না। আর আবৃত্তি? হা কপাল। বড় জোর 'দুই বিঘা জমি' কী 'পুরাতন ভৃত্য' পর্যন্ত। ধ্যাৎ।

একদিন কুলপতি বলেছিল (অবশ্যই অনেকদিন আগে। যখন পরমেশ্বরী এরকম সব কথা বলতো) আচ্ছা তুমি শোনাওতো তোমার কবিতা। বুঝি কিনা দেখি।

রাঘবেন্দ্রও বলেছিল ঠিক আছে। আনো তোমার বই।

বই এনে আবৃত্তি?

পরমেশ্বরী হেসে উঠেছিল।

তারপর হঠাৎই বলে উঠেছিল—

হে আমার চির ভক্ত।

এ কী সত্য? সবই সত্য?

চির মন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কী?

চরণে আমার বীণা ঝঙ্কার বাজে কী?

নিশির শিশির পড়ে কি আমারে হেরিয়া?

প্রভাত আলোকে পুলক আমারে ফেরিয়া?

এ কী সত্য?···

মোর সুকুমার ললাট ফলকে—

লেখা অসীমের তত্ত্ব ?

হে আমার চির ভক্ত।

বলতে বলতেই হঠাৎ বলে উঠেছিল ধ্যাৎ! কেউ কিছু বুঝছেনা! বকে মরে কী হবে ?

বাঃ। কে বলেছে কেউ কিছু বুঝছিনা ?

বলেছে ? বলেছে এই তুই বুদ্ধুর দুজোড়া চোখ।...তার থেকে সহজে যার রসগ্রহণ করতে পারবে, তাই আনি।

চলে গিয়েছিল কিছু আগে তৈরী করে রাখা পাটিসাপটা আনতে।...

কিন্তু আজ রাঘবেন্দ্রর কথার পিঠে অনায়াসেই বলে উঠল, ওই জন্যই তো ওর প্রেমে পড়ে মরে আছি।

কুলপতি নামের লোকটার কী দিনে দিনে তিলেতিলে কিছু উন্নতি হয়েছে ? অথবা এমনিই মজা করে বলল, যেমন তার স্বভাব। তবে মনে মনে আবৃত্তি করে উঠল, 'আমার হৃদয়প্রাণ সকলই করেছি দান, কেবল শরমখানি রেখেছি—চাহিয়া মুখের পানে সযতনে সাবধানে, আপনারে লাজ দিয়ে ঢেকেছি।'

কিন্তু স্কুল মাস্টারের প্রাণের পুতুল মেয়েটা।

কিন্তু এই রাজবাড়িতে কী 'বই' নামের জিনিসটার প্রবেশাধিকার ছিল না ? তাই কখনো হয় ? 'রাজবাড়ি' বলে কথা। আগে কত বিজ্ঞজনের আগমন ঘটেছে। সাহেব-সুবোরাও পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তাঁদের সামনে কী একটা ত্রুটিপূর্ণ রাজবাড়ি ধরে দেওয়া হতো ? রীতিমত একটি 'লাইব্রেরী ঘরই' ছিল। ঢাউস ঢাউস আলমারি সাজানো সোনার জলে নাম লেখা চামড়ায় বাঁধানো বইয়ের রাশি ছিল। তার মধ্যে কিছু ছিল 'ল' বুক। শতদলবাসিনীর স্বামী বিজয়েন্দ্র রায় ওকালতি পড়েছিলেন। তবে ওকালতি করেছিলেন কতদিন, তা জানা নেই। বইগুলো ছিল তাঁর বিদ্যাবত্তার সাক্ষী। বাকি বই সবই ইংরাজি কাব্য সাহিত্য। যা সাজিয়ে রাখা বিধি। তবে কিনা সোনার জলে দাগ পড়েনা খোলেনা কেউ পাতা—'অ-স্বাদিত

মধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা।'

তা 'তখন অবশ্যই ভৃত্য নিত্য ধুলো ঝাড়তো—' যত্নটত্ন পুরোমাত্রাতেই ছিল।... কিন্তু পরমেশ্বরী যখন এসেছিলেন, দেখেছিলেন সদর আর অন্দর এর মাঝামাঝি একটা ছায়া ছায়া দালানের দেয়াল ধারে সেই সব আলমারিরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন 'শেষ রায়' শোনবার অপেক্ষায়।

যে দাসীটি—নতুন বৌকে পুরো বাড়িটা দেখাচ্ছেন তার কাছেই জানা গেল 'বহির্বাটির যে একটা বড় অংশের ছাদ ধসে পড়ে গাছ গজাচ্ছে, সেটাই ছিল লাইব্রেরী ঘর। খোলা র‍্যাকে থাকা বেশ কিছু বই নাকি ওই ছাত চাপা পড়ে কবরিত আছে। উদ্ধার করার চেষ্টা হয়নি। কারণ তার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়জলও তো বয়ে গেছে। উদ্ধার করতে পারলেও তাদের কী আর জীবন্ত পাওয়া যেত? ছিন্নভিন্ন শবদেহগুলিই হয়তো—

হ্যাঁ। দাসী শঙ্করী ঠিক সেই কথাটিই বলেছিল। কে আর মিথ্যে চেষ্টা করতে যাবে বৌরানী? সে সব বই কাগজ কী আর জ্যান্ত আছে?

ওই আলমারিগুলোর ধারে—পাশে ছড়ানো ছিটানো ছিল কতকগুলো নাক কান থ্যাঁদা হাত পা ভাঙা উলঙ্গিনী পাথরের পরী মূর্তি, কিছু ঘাড় ভাঙা বড় বড় ফুলদানী, আর বৃহৎ দুটো 'ফোয়ারার' কোণ ভাঙা মুণ্ডু।

সে সবের কী হলো, তা আর জানতে পারেন নি পরমেশ্বরী। বাইরে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ মালেদের অদৃষ্টে যা হয়, তাই হয়েছিল নিশ্চয়।

সদরের বাকিঅংশটাও পড়ে যাওয়ায় ভগ্নস্তূপে গজানোর আগাছার জঙ্গলটা ভেতর বাড়ি থেকে বারবাড়িটার মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। সাপ-খোপের ভয়ে ওদিকটায় কেউ হাঁটেই না। ঠাকুরবাড়িওতো পড়ে গেছে।

তবু এই তিন মহলা বাড়ির ভিতর অংশের কিছুটা বাসযোগ্য আছে বৈকি। তা নইলে আর এরা বাস করছে কী করে?

এই যে পরমেশ্বরী তার শোবার ঘরে এসে ঢুকলো, এ ঘরের মেঝেটা এখনো মার্বেল মোড়া।

একখানা করে সাদা আর একখানা করে কালো চৌকো মার্বেল টালি দিয়ে

দাবার ছকে-এর মতো চেহারার মেঝে।

দেওয়াল জোড়া প্রকাণ্ড পালঙ্ক, তার বাজুতে দারুণ কারুকার্য। ছত্রিগুলো ইস্কুপ পাকের। অন্য দেওয়াল ধারে তেমনি কাজকরা চূড়ো বসানো মস্ত আলমারি, অন্য একদিকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা ড্রেসিং টেবিল আর তার দুধারে তিন থাক ড্রয়ার প্রায় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলেরই তুল্য।

সে কালের সবই যেন বৃহৎ। কাপড় রাখবার আলনাটাও মাথা ছাড়ানো উঁচু। চার চারটে ডাণ্ডার নিচে টানা লম্বা বাক্স জুতো রাখবার। ঘরটাও তেমনি বিরাট। ঘরের মাঝখানে একটা মার্বেল টপ বসানো একপায়া টেবিল, সেটাই যা কিঞ্চিৎ ছোট। টেবিলটা পালঙ্ক আর একখানা বৃহৎ কৌচের মধ্যবর্তী জায়গাটায় বসানো। জানলার ধারে একখানা চওড়া হাতা আরাম কেদারা।

ঘরের সামনেটা দালানের দিকে পিছনটা বাগানের দিকে। সেদিকেও একটা মার্বেল মোড়া বারান্দা। দরজা জানলা সবই প্রকাণ্ড। বেশ কয়েকটা জানলার শার্সির কাচে লম্বা লম্বা ফাটল। এসব আর সারাবার প্রশ্ন নেই। ওই কোয়ালিটির কাচ আর এখন মিলবেনা।

ঘরটা পরমেশ্বরীর শাশুড়ীর দরুন। ছেলের বিয়ে দিয়ে তিনি নিজের সাজানো ঘরটি ছেলে বৌকে উৎসর্গ করে নিজে অন্যত্র আস্তানা নিয়েছিলেন।

হয়তো তিনিও পেয়েছিলেন ওই একইভাবে শাশুড়ীর কাছ থেকে। শাশুড়ীর পরবর্তী মহলটি ছিল মেয়ে জামাইয়ের মহলের কাছাকাছি। সেদিকটারও ভগ্নদশা।

তিনতলার ছাতে নাকি একটা পাখিমহল ছিল। পরমেশ্বরী এসে দেখেছিলেন বৃহৎ ছাদটার অনেকখানি জায়গা জুড়ে তারের জাল ঘেরা সেই পাখি মহলের কাঠামো। জালগুলো ছেঁড়া খোঁড়া।

এক পুরুষের শখে অপচয়ের নিদর্শন যতটা প্রখর, পরবর্তী প্রজন্মের অবহেলাটাও তত বেশি প্রকট।

কিন্তু ছাদ তো এই একটাই নয়, 'রাজবাটিতে' ভাগে ভাগে মহলে মহলে বিভক্ত ছিল। এ ছাদে উঠলে অন্য অন্য ছাদের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে।

পরমেশ্বরী যখন ঘরে এলেন, তখন পড়ন্ত বেলা। মেঘলা আকাশে তখন শেষ সূর্যের একটু বিদায় হাস্য!

পাখাটা চালিয়ে দিয়ে সোফাটার ওপর এসে বসলেন। সেও বয়েসের ছাপে জীর্ণ।

তাকিয়ে দেখতে লাগলেন চারিদিক, বিছানাটা বাদে সব কিছুতেই বয়েসের ছাপ বড় বেশি প্রকট।

একটু হাসলেন মনে মনে। এইসব ধ্বংসপ্রায় বড়লোকেদের বাড়িগুলো এখন সিনেমা পরিচালকদের কাছে দারুণ আকর্ষণের। লোকেশান খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে কেউ হয়তো একদিন এই রাজবাটিটা আবিষ্কার করে ফেলে মোহিত হয়ে যাবে!

তাদের কাহিনীর কাল-এর সঙ্গে এইসব আসবাবপত্র আর ঘরবাড়ি দালানের সামঞ্জস্য পেয়ে আহ্লাদে অধীর হবে।

রাঘবেন্দ্রকে ধরলে এই বাড়ি নাকি সপ্তম পুরুষ।

যার নাম সাত পুরুষের ভিটে।

তবু—

হয়তো বাড়িকে তেমন ভাবে লালন-পালন করলে অনেক তাজা থাকতো। কিন্তু তা করা হয়নি। কোনো পুরুষই সে চেষ্টায় মন দেননি এবং উপার্জনেরও না। সকলেই কেবল বহিরঙ্গের ঠাটবাট আর বিলাসিতা নিয়েই মজে থেকেছেন। আর মজে থেকেছেন মদে। ব্যতিক্রম শুধু বিক্রমেন্দ্র আর তাঁর পুত্র রাঘবেন্দ্র।

কিন্তু তখন তো অন্তঃসারশূন্য অবস্থা।

তবু পরমেশ্বরীর এই মহলটি বাসযোগ্য।

এ ঘরের সব কিছুই বুড়ো থুথুড়ো।

ভাবলেন পরমেশ্বরী।

আমি যেন একটা মিউজিয়ামের বাসিন্দা। কিন্তু আমি নিজে?

কৌচ থেকে উঠলেন, ড্রেসিং আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বুড়ির

মুখের 'মেচেতার' মতো আয়নাটার গায়ে মাঝে মাঝেই কালো স্পট। তবু একদার আসল 'বেলজিয়াম গ্লাস।'

দেখলেন নিজেকে। হাসলেন।

শুধু ঘরের অধিশ্বরী পরমেশ্বরী দেবী এখনো তরতাজা। বছরখানেক আগে ষাট পার করে এলেও। শুধু রগের দুপাশে রুপোলি রেখাগুলো। কিন্তু খুব কি বুড়ো দেখাচ্ছে তাতে? মনে হয় যেন অকালপক্কতা। এরও একটা সৌন্দর্য আছে!

নিজেকে দেখতে লাগলেন অনেকক্ষণ ধরে। আস্তে আস্তে পড়ন্ত বিকেলের আলোটা মিলিয়ে এল। হঠাৎ মনে হলো, কিন্তু ভিতরটায় যেন এই পড়ন্ত বেলার মতো অবসাদ অনুভব করছি আজকাল। মনে হয় যেন শরীরের সব জোর ফুরিয়ে আসছে।

শরীরের? না মনের? কে জানে।

বেহালার আওয়াজ আসছে না? বেহালাটাকে তাহলে সারিয়ে তুললেন মুখুটিমশাই।

পিছনের বারান্দার মেঝেটা খানিকটা বসে গিয়ে ঝুলে পড়েছে। রেলিং-গুলো তার দিয়ে বেঁধে আটকে রাখা হয়েছে। বাড়িতে ছোট ছেলে মেয়ে নেই, তাই রক্ষে।

আস্তে আস্তে সন্তর্পণে বারান্দাটা পার হয়ে একটা চাতালে এসে পড়লেন পরমেশ্বরী। চাতালের শেষ প্রান্তে গোটা দুই সিঁড়ি উঠে গেছে, একটা সরু প্যাসেজের মুখে। এ বাড়িতে যেখানে সেখানে এমন অনেক জায়গায় দু চারটে সিঁড়ি আছে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে। যেখানে সেখানে উঁচু নীচু। যদিও বাড়ির কাঠামো চকমিলানো ধাঁচের তবু, প্রয়োজন হিসেবে এসব পরবর্তী সংযোজন।

সিঁড়িতে পা রেখে একটুক্ষণ দাঁড়ালেন পরমেশ্বরী।

প্যাসেজটা পার হলেই দুখানা ঘর এল্ সাইজে। একটা ঘর থেকে ওই সুর আসছে। পরমেশ্বরী যাকে বলেন মন খারাপ করা সুর।

আস্তে এগিয়ে এলেন।

ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ঘরটা টুনটুনির।

এ ঘরের সাজ সজ্জাও অনেকটা পরমেশ্বরীর ঘরের ছাঁদের। তবে সব কিছুই কিছুটা ছোট মাপের। ঘরও। এখন অবশ্য দেখা যাবে না কিছু। ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালা হয়নি। পালঙ্কের ওপর বসে রয়েছেন কুলপতি, সেইটুকুই বোঝা যাচ্ছে।

কুলপতির তো টের পাবার কথা নয়। পরমেশ্বরী তো নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। তবু কুলপতির বাজনা থেমে গেল। তারপর অস্ফুট একটু উচ্চারণ, কে?

পরমেশ্বরী কী এ ঘরে বড় একটা আসেন? কদাচ। বহু দিনের বিপত্নীক এই বৃদ্ধ ব্যক্তির ঘরটা কিন্তু সেই যুগলজীবন যাপনের চিহ্নবাহী। দরজার সামনের দেওয়ালে টুনটুনির একখানা এনলার্জড ফটো। যার ভালো নাম ছিল 'চারুহাসিনী'। চেহারার ধরনটা অনেকটা দাদার মতো। বড়সড় শক্ত-পোক্ত। তবু কত অকালে চলে গেছে। ছবিতে তার চারু হাসিটি চির দীপ্যমান।

কিন্তু এখন তাকেও দেখা যাচ্ছে না।

ধ্যান ভাঙালাম তো?

খুব আস্তেই বললেন পরমেশ্বরী।

কুলপতি দিশেহারাভাবে বাজনাটা বিছানায় নামিয়ে রেখে খাট থেকে নেমে পড়লেন।

খুব অবাক গলায় বললেন, কী আশ্চর্য। তুমি!

পরমেশ্বরী বললেন, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? অশরীরী আত্মা তো নয়।

কুলপতির মুখে কৃতার্থমন্যের ভাব।

এদিকে তো বড় আসোনা।

'এদিকটা' যে আজ সারাদিন 'অদৃশ্য'। মন কেমন করল, তাই দেখতে এলুম!

বানিয়ে বললেও শুনতে খুব ভালো।

বানিয়ে বলেছি? বটে? তবে এই চললুম।

আরে আরে! কী মুশকিল। হঠাৎ এতটা ভাগ্য! বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছিল না।

হুঁ। আমার সঙ্গে মিশে মিশে খুব কথা শিখেছ দেখছি। তো ধ্যান যখন ভঙ্গই হলো, আলোটা জ্বালা হোক।

বসবে?

কৃতার্থ কুলপতি আলোটা জ্বেলে দেন। আর পরমেশ্বরীর প্রথমেই মনে হলো টুনটুনি যেন হেসে উঠল। কিন্তু হাসিতে তীক্ষ্ণতা নেই। বড় শুভ্র নির্মল হাসি।

বসি একটু। অনেকদিন এদিকে আসাই হয়না। আমি কিন্তু একদম নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কী করে টের পেলে?

কুলপতি বললেন, কী করে? কী জানি। বোধহয় তুমি চুলে যে তেল মাখো, কিম্বা গায়ে যে সাবান মাখো, না কী তোমার শাড়ির বিশেষ একটা গন্ধ, এরাই কেউ বলে দিলো।

হুঁ। বুঝলুম। তো আজ তাহলে তোমাদের দাবার আসর বন্ধ?

না না, বন্ধ হবে কেন? এইতো যাচ্ছিলাম।

এই সাজে?

কুলপতি অপ্রতিভ ভাবে নিজের দিকে তাকালেন। পরনে পাট করে পরা একটা ধুতি আর গায়ে একটা মেরজাই। গেঞ্জি লাগে আদ্দির পাঞ্জাবির নিচে পরতে। দুপুরে রাত্রে এই বনেদি কাট-এর মেরজাই।

অপ্রতিভ কুলপতি বললেন, এই বাজনাটা নিয়ে সারাদিন—এখনি ঠিক হয়ে নিচ্ছি।

তো আজ না হয় খেলার বদলে বাজনাই হোক!

য্যাঃ। শালাবাবুর ভালো লাগবে কেন?

নাইবা লাগল। সব সময় অন্যের ভালো লাগাটাই দেখতে হবে তার কী মানে? 'নিজেরটাই' বুঝি ফ্যালনা?

কুলপতি হাসলেন।

আলো পড়ে মাথার টাকটা চকচক করছে, তবু নমনীয় ধরনের ফর্সা মুখটায় হাসিটা ছেলেমানুষের মতো লাগল। বললেন, অন্যের ভালো লাগাটা দিয়েই তো সুখের স্বাদ।

আমি অতশত বুঝি না বাবা। নিজের যা ভালো লাগে তাই করি।

এটা তোমার মনকে চোখ ঠারা পরমেশ্বরী! অন্যকে 'ভালো লাগার'-সাগরে ডুবিয়ে রাখাটাই তো তোমার নিজের 'ভাললাগা'।

ওরে বাবা। বড্ড যেন গোলমেলে কথা। বুঝতে সময় লাগবে। তাহলে আসরে আসছো তো এখনই!

হ্যাঁ। হ্যাঁ, এই গেলাম বলে।

বলেই বলে ওঠেন, আচ্ছা পরমেশ্বরী, নিজেরাই তো শুধু আছি, তবু সত্যি 'আসরে' গিয়ে বসার মতো এত সব সাজসজ্জায় দরকার কী বলো তো? যেমন আছি তেমন চলে গেলে কী হয়?

এ মা। এ লোকটা রাজবাড়ির জামাই হয়ে কী বলে গো! ছি ছি। না বাপু, ওটি চলবে না। কর্তাদের মতো নটবর সাজটি সেজে কানে আতরের তুলো দিয়ে গড়গড়া হাতে বসবে, তবে তো মানাবে।

মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা যেন একটা নাটক করে চলেছি।

তা শুনিতো জীবনটাই নাটক। তোমার অরুচি ধরে গেছে? খারাপ লাগে?

আঃ। কী যে বল? খারাপ লাগবে কেন?

তবু ভালো। আমার তো বাপু ভাবলেই খারাপ লাগে, তোমরা সরকার মশাইয়ের স্টাইলের সাজসজ্জা করে আর আমি পারুলের মতন সেজে বসে গালগল্প করছি।

তুমি পারুলের মতো। সর্বনাশ। এই চললাম সাজতে।

হঠাৎ বুকটা কেমন ব্যথা-ব্যথা লাগল পরমেশ্বরীর। ক'দিনই যেন মাঝে মাঝে লাগছে। এ কী কোনো ব্যাধির ওয়ার্নিং যেন?

ভাবলে ভয় করে।

নিজের জন্যে ভয়। মেয়েদের পক্ষে নাকি ব্যাপারটা গর্হিত। তবু পরমেশ্বরী নিজের জন্যে ভয় করে।···নিজেকে পরমেশ্বরী যেন ওই অসহায় মানুষ দুটোর পায়ের তলার মাটি আর মাথার ওপরকার ছাদ বলে মনে করেন। আমাকে ভালো থাকতে হবে। আমাকে ভালো থাকতে হবে। এটাই পরমেশ্বরীর ইষ্টমন্ত্র।

পোড়ো ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ তাকে তাড়াতে দীর্ঘক্ষণব্যাপী ধূনোর গন্ধ, সব ছাপিয়ে চিরপরিচিত অম্বুরি তামাকের গন্ধে ঘরের বাতাস ম ম করছে। শব্দ উঠছে গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুড়, গুড়া।

রাঘবেন্দ্র বসে আছেন ফরাসের ওপর নয়, পাশে রাখা আরাম কেদারাটায়। তার মাঝখানের বেতটা বেশ নেমে গেছে, তবে চট্ করে ছিঁড়ে পড়বে এমন ভয় নেই।

রাঘবেন্দ্রর পরনে সেই সাজ। অনেকটা চওড়া মুগা ধাক্কা চুনট করা লম্বা কোঁচা শান্তিপুরি ধুতি, গিলে কোঁচানো ঢিলে হাতা আদ্দির-পাঞ্জাবী, তাতে সোনার বোতাম চিকচিক করছে। তিনটি আঙুলে তিনটি আংটি (কড়ে আর বুড়ো বাদ) গায়ে হরিণের চামড়ার চটি। কেদারার গায়ে ঠেসানো রয়েছে রুপো বাঁধানো ছড়ি, আতরের গন্ধ আর তামাকের গন্ধের মিশ্রিত একটা উগ্র গন্ধ যেন বিগত যুগকে এনে উপস্থাপিত করেছে।

রোজই করে ব্যতিক্রম নেই।

শুধু আজকের ব্যতিক্রম, এই ঘরটায় যে ইলেকট্রিক লাইটের বাল্‌বটা অনুপস্থিত, সেটা পরমেশ্বরীর খেয়ালে আসেনি। দিনের বেলায় চোখ পড়বার কথাও নয়।

কিন্তু ঘরের সীলিং তো এ যুগের বাড়ির মতো নয়, বিরাট উঁচু মই না আনালে কাজটা করানো যাবে না। তাছাড়া এখন বাল্‌ব আনানোও শক্ত। অতএব ঘরে কেরোসিন ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে গেছে হরিপদ। এই ধরনের কাজগুলো সে করে দেয়। মাইনে করা চাকর নয়, সরকার মশাইয়ের স্নেহাশ্রিত। ওঁর ফাইফরমাস খাটে, বিনিময়ে এ বাড়িতে খায় শোয়।

দিনমানে বাল্‌বের কথা বললেন না—বলে হরিপদ এই বনেদি-মার্কা টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। তাতে ঘরটা আরো পিছনের দিকে চলে গেছে।

কুলপতি ও রাঘবেন্দ্রর সাজেই সজ্জিত হয়ে এসে ঘুরে ঢুকেই বলে উঠলেন বাঃ।

রাঘবেন্দ্র ফরসির নলটা মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, কোন্‌টা দেখে বাঃ বললে হে মুখুটি ?

সবটা দেখেই। এ তো বেশ একটা ঘর আবিষ্কার করা হয়েছে। তোকে মনে হলো ঠিক এক মধ্যযুগীয় জমিদারমশাই।

তোকে দেখেও তাই মনে হচ্ছে।

তোর গিন্নীর নির্দেশে একদিনও তো এদিক-ওদিক করার জো নেই। রোজ এই নাটকের নায়ক সেজে বসে থাকা।

যা বলেছিস। এই যে কী এক শখ ওর।

কথা শেষ হবার আগেই পরমেশ্বরী এসে ঢুকলেন। অন্যদিন এখনই আসেন না, থাকেন পূজোর ঘরে, আজ আলোক বিভ্রাটের জন্যে তদন্ত করতে এসে পড়েছেন।

বলে উঠলেন, কী ? তুই স্যাঙাৎ আড়ালে বসে আমার নিন্দে চালানো হচ্ছে তো ?

রাঘবেন্দ্র বললেন, নিশ্চয়। ওই তো কাজ আমাদের।

জানি এখনো ছক পড়েনি যে ? এ আলোয় অসুবিধে হবে ?

কুলপতি বলে উঠলেন, হওয়া উচিত নয়। তুমি যখন আমাদের কর্তাদের আমলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাও, তখন রোজই এই আলো থাকা উচিত।

রাঘবেন্দ্র বললেন, আলোর জন্যে নয়। মুখুটি ওর পিড়িং পিড়িংটাকে নিয়ে সারাদিন কী করল, একবার টেস্ট করলে মন্দ হতো না।

কুলপতি বলে উঠলেন, পরমেশ্বরী বলেছে বুঝি ?

পরমেশ্বরী বলে উঠলেন, কখন আবার আমি বলতে গেলাম ? যত দোষ নন্দ ঘোষ !

রাঘবেন্দ্র বললেন, হঠাৎ পরমেশ্বরীকে দোষী ঠাওরালি যে? আমি বুঝি নিজের বুদ্ধিতে আর স্বাধীনতায় একটাও কথা বলতে পারি না? আমি বলছি আজ খেলা থাক। বাজনা হোক!

এ তো তোর বেড়ালের কান্নার মতো লাগে।

এটা আবার কখন বললাম।

আগে বলতিস। যখন বাজাতাম।

ওঃ। তখন? বয়েসে রুচি বদলায়।

তা নয়। তুই আমায় সিমপ্যাথি করে বলছিস।

তোকে সিমপ্যাথি করতে আমার দায়ে পড়েছে। আমার এই বর্ষার সন্ধ্যার ওই পিড়িং পিড়িং শুনতে ইচ্ছে করছে।

কুলপতি বললেন ঠিক হ্যায়।

দীর্ঘদিনের অনভ্যাস। তবু আস্তে আস্তে সুরের মায়াজাল বিছিয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে। একসময় কখন পরমেশ্বরী বসে থাকতে থাকতে ফরাসটার ওপর শুয়ে পড়েছেন, দুই বৃদ্ধের কেউ লক্ষ্য করেননি।···

লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন পরমেশ্বরীর চোখের কোণ বেয়ে জল পড়ছে।···

এই সুরটা কী কুলপতি নামের এক তরুণ যুবক তার তরুণী স্ত্রীকে দাহ করে শ্মশান থেকে ফিরে ছাদের ওপর উঠে গিয়ে বাজিয়েছিল?

আচ্ছা পরমেশ্বরী কী এখন কুলপতিকে বলবেন, আমি যেদিন মরে যাব, তুমি এই সুরটা বাজিয়ো ছাদে উঠে গিয়ে।

হঠাৎ চট্ করে উঠে বসলেন।

বলে উঠলেন, এবার অন্য সুর বাজাও মুখুটিমশাই। প্রাণ কেমন করছে। এই লোকটা ঠিকই বলে তোমার বাজনার সুর ঠিক কান্নার মতো।··· হিংসে করে অবশ্য বেড়ালছানার কান্নার মতো বলে। তা নয়, বিরহিনী রমণীর কান্নার মতো।

কুলপতি বেহালাটা নামিয়ে রেখে মৃদু হেসে বললেন, জিনিসটা বড় ভয়ানক। ভুলে ফেলে রাখলে তো রাখলে। কিন্তু একবার ঘাড়ে তুলে নিলে তো গেলে। ঘাড় থেকে নামতে চাইবে না। নেশার মতো।

সরকার মশাই সন্ত্রস্ত ভাবে বললেন, অসময়ে তলব করেছেন কেন বৌমা ?
পরমেশ্বরী একটু লজ্জিত হাসি হেসে বলেন, আর বলবেন না সরকার মশাই। কী যে হয়েছে! গায়ের জোরটা ভীষণ ফুরিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মীর ঘরের সিন্দুকের ডালাটা তুলতে পারছি না। মনে হচ্ছে ডালাটা হঠাৎ দশ মণ ভারী হয়ে গেছে। আপনাকে একটু আসতে হবে।

সরকার মশাই ইতস্তত করে বলেন, লক্ষ্মীর ঘরে ?

তাতে কী। আপনি কী অব্রাহ্মণ ?

হেসে উঠলেন একটু।

লক্ষ্মীর ঘরের মেঝেতেই ভয়ঙ্কর সব দামী জিনিসের সিন্দুকটি মাটিতে পোঁতা। পুঁততে হলে তো মাটি চাই। দোতলা তিনতলায় শোবার ঘরের মেঝে সেখানে অকেজো। সেকালের লোকেরা তো মাটির নীচেটাকেই সব থেকে নিরাপদ মনে করতেন। উপায় কী ? তখন কী ব্যাঙ্কের লকার নামে এমন একটা সুবিধেজনক ব্যবস্থা আবিষ্কার হয়েছিল ?

সিন্দুকের ডালাটা অদ্ভুত কৌশলে গড়া। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় একখানি নীচু অথচ প্রশস্ত জলচৌকি বসানো রয়েছে দেয়াল ধারে।··· সেই চৌকির ওপর একটি কড়ির ঝাঁপে আর নানাবিধ মাপের শাঁখ, কড়ি, ঝিনুক আর দুটি রুপোর গাছ কৌটো।···ঠিক তার উপরের দেয়ালে কুলুঙ্গীতে লক্ষ্মীর ঘট বসানো আছে। সিঁদুরের পুতুল আঁকা।···পঞ্জিকা নির্দেশিত দিনে পুজো হয়।

একটা বেতের ডালায় ওই সব শাঁখ কড়ি ঝিনুকদের নামিয়ে রেখেছেন পরমেশ্বরী। কলাকৌশল সমন্বিত চাবিটাও খুলেছেন কিন্তু টেনে তুলতে পারছেন না, লোককে ধোঁকা দেওয়া সেই জলচৌকি আকারের সিন্দুকের ডালাটি।

এই ঘর থেকে দুদিক চাপা একটি সরু সিঁড়ি উঠে গেছে একেবারে পরমেশ্বরীর শোবার ঘরের মধ্যে, এক কোণে। যে ঘরটা আগে পরমেশ্বরীর শাশুড়ীর ছিল।···রাত্রে ওই নীচের ঘর ভিতর থেকে সাত তালা দিয়ে বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে সিঁড়ির মুখের দরজাটিতে ও তালা লাগিয়ে

তবে শুতেন।…এও এক রকমের 'লকার' বলা চলে।…শুধু মোটা দাগের ব্যবস্থা।

তবে কার্যকরী ছিল বোধহয় বেশী?

শাশুড়ী মারা যাবার পর পরমেশ্বরীর ওপর সব দায়-দায়িত্বই বর্তেছিল, তার সঙ্গে এই চোরা সিঁড়ি আর ছদ্মঘরের তালা দেওয়া দিইই।…তখনই প্রথম জেনেছে ওই চৌকীরহস্য।'

প্রথম প্রথম তরুণী পরমেশ্বরীর গা ছমছম করতো। ঘরটা বন্ধ করে লক্ষ্মীর ঘট প্রণাম করে বোঁ করে সিঁড়িটা পার হয়ে যেতো। আর তখনি ওর মনে হতো এই যেন এক রূপকথার রাজবাড়ি। আর পরমেশ্বরী সেখানে এক বন্দিনী রাজবধূ।…

গরীব গেরস্থ স্কুল মাস্টারের মেয়ে দুখানা ঘরের সংসারে মানুষ হয়েছে; এখানে এসে এই বৃহৎ প্রাসাদের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যেত। হলেও ভাঙাচোরা তবু তার প্রতিটি অংশই যে সাধারণোত্তর।…একতলার দালানের দেওয়ালে দেওয়ালেও কত আশ্চর্য কত কারুকার্য। হয়তো একজোড়া 'পরীশিশু', ও একজোড়া 'ফুলদানীর' আদল…মাঝে মাঝে দেবদেবীর মুখ।…

এই বাড়িটাই পরমেশ্বরীর বাড়ি হয়ে গেল।…পরমেশ্বরী কি আড়ালে ডুকরে কেঁদে উঠবে তার মায়ের, রান্নাঘরের সামনের দাওয়াটার জন্যে? যেখানে শীতকালে রোদ এলে মাদুর পেতে বসে দুই ভাই-বোন দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করতো!

অতঃপর এই লক্ষ্মীর ঘরের মালিকানা। তখন থেকেই কী পরমেশ্বরী দুটো পুরুষকে নাটকের কুশীলব বানিয়ে এক অদ্ভুত নাট্য পরিচালনায় মাতলো? বাড়িটা যখন রাজবাড়ি আর এরা যখন এই বাড়িরই তখন কেন এরা সাধারণ হয়ে যাবে?…পরমেশ্বরী তাদের অ-সাধারণ করে রেখে রানীগিরি রানীগিরি খেলা খেলে যাবে।

এই আপনার ভারী ডালা তুলে দিলাম বৌমা। যা নেবার নিন। আবার চেপে দেবো।

বললেন, শিবশম্ভু!

পরমেশ্বরী আবার একটু লজ্জিত হাসি হাসলেন।

কী আশ্চর্য দেখুন। অনায়াসে অবহেলায় তুলেছি এই সেদিনও। হঠাৎ কী যেন হলো।

বৌমা।

সরকার গাঢ় গভীর গলায় বলেন, ভেতরে ভেতরে আপনার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে। ডাক্তার দেখানো দরকার!

ডাক্তার?

হেসে ওঠেন পরমেশ্বরী, কী যে বলেন। ডাক্তার ডাকার মতো কী হলো?··· আপনি যেন আবার দুই বুড়ো ভদ্রলোকের কানে এই কথাটি তুলে বসবেন না। তাহলে দুশ্চিন্তার ঠ্যালায় ওনাদের জন্যেই ডাক্তার ডাকাবার অবস্থা করে তুলবেন।

সরকার মশাই তেমনি গাঢ় গলায় বললেন, এই বুড়ো লোকটারাও আপনার জন্যে—

একটু গলা ঝেড়ে নিলেন, বললেন. সাবধান হওয়া ভালো বৌমা।

সরকার মশাই।

বলুন।

বলছি—সিন্দুকের মধ্যে খুব বেশী তো আর অবশিষ্ট নেই। যা আছে তুলে নিয়ে বরং ইয়ে করে টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দিন।···একটু হাসলেন, আমার তো দেখছেন? এটা এইরকম। বারবার আপনাকে জ্বালাতন করতে হবে সিন্দুকের ডালা তুলতে।

আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন, শুধু মাথার মুকুট আর পাঁচ-খানা গিনি রইল। আর এই আপনার গিয়ে গহনাপত্রগুলো যা ছিল দিয়ে দিচ্ছি।···মুকুটটা আমার শাশুড়ীর দরুন। নতুন বৌয়ের মাথায় চাপিয়ে তাকে রাজবাড়িতে ঢোকানো হয়েছিল। বলেছিলেন—আমিও।

আর একটু হাসলেন পরমেশ্বরী।

কী বলেছিলেন সেটা, অনুক্ত থাকলেও অবোধ্য থাকল না।

সরকার মশাই বললেন, বাবার কাছে শুনেছি ও মুকুট তারও আগের। বংশানুক্রমে নতুন বৌয়েরা মাথায় পরে এসে ঢোকে।

তারপর নির্নিমেষ চোখে পরমেশ্বরীর ধরে দেওয়া গহনা ক'খানার দিকে তাকিয়ে বললেন, কখনো কোনো সময় গায়ে দেবার জন্যে দু'একখানাও আর রইল না তাহলে ?

পরমেশ্বরী ওঁর ব্যথিত মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে হাসলেন, এইসব জিনিস গায়ে দেবার আর বয়েস আছে সরকার মশাই ? এই বাজুবন্ধ, তাবিজ, জশম আর চিক আর মটরমালা ? এ বয়েসে কেউ এসব পরে না।

সরকার মশাই বললেন, এ সবের নামও আমার জানা নেই, কোন বয়েসে পরতে হয় না হয় তাও জানা নেই। চোরের মতো চুপি-চুপি নিয়ে গিয়ে পোদ্দারের দোকানে বেচে আসি।—এই পর্যন্ত। তবু—

আবার গলা ঝাড়লেন, মানুষের কাঠামোর মধ্যে মন প্রাণ বলে একটা জিনিস তো থাকে! আর পারছি না।

পরমেশ্বরীর চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে উঠল। ভান করা হাসিটা আর মুখে এল না। বললেন, আপনার ওপর যে খুব শাস্তি চালানো হচ্ছে তা বুঝতে পারি বৈকি। কিন্তু আপনি ছাড়া আর কে এত জুলুম সইতো বলুন তো ?···আপনি হয়তো ভাবেন, মিথ্যে একটা খেয়ালে আমি এতো বাজে খরচ করে সব উড়িয়ে দিচ্ছি। মেপে মেপে চললে অনেক থাকতো।··· কিন্তু কার জন্যে থাকতো ? এই রাজবাড়ির কোনো রাজপুত্তুরকে তো রেখে যেতে পারলাম না। বরং রাজামশাই আর রাজবাড়ির জামাইকে উচিত মর্যাদায় রেখে চলেছি। আর নিজের গহনা পরে সাজার কথা বলছেন ?···বাঙালী মেয়েদের 'খাওয়া-পরা' তো অন্যের হাতে। নয় কী ? বলুন ? এক মিনিটে সব ঘুচে যেতে পারে।···এই জিনিসগুলো নিজের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগবে ভেবে তুলে রাখবো, ভাবতেই নিজের ওপর অছেদ্দা এসে যায়। যাঁদের পিতৃপুরুষের জিনিস তাঁরাই ভোগ করে যান। আমি কে ? আপনি একদম মন খারাপ করবেন না সরকার মশাই।···

সরকার মশাই জিনিসগুলো তুলে নিয়ে আস্তে বলেন, আপনার জীবন-দর্শনটি অদ্ভুত!

অদ্ভুত কেন? এ বাড়ির পুরনো কর্তাদের মতোই। 'হেসে নাও দুদিন বৈতো নয়। কি জানি কখন সন্ধ্যা হয়।' তাই নয়? বলুন?

সরকার মশাই জিনিসগুলো থলিতে ভরে আর একবার বললেন, ন্যায্য-দামে পেলে কতো বেশী পাওয়া যেতো। হাড় বজ্জাত কার্তিকটা ছাড়া আর গতি নেই বলেই—ব্যাটাকে দেখলে বিষ ওঠে।

পরমেশ্বরী হেসে ফেলে বলেন, সুযোগ পেলে তো লোকে সুযোগ নেবেই সরকার মশাই। আর কারো কাছে গেলেই কি সে ন্যায্য দাম দেবে? গরজ যার। লোকসান তার। এই তো চিরকেলে কথা।…এইভাবেই তো বড় বড় ধনী মানী রাজা-মহারাজাদের অগাধ ঐশ্বর্য বৈভব কোথায় হারিয়ে গেছে। এ তো কোন্ ছার। তো যাক একটাই কথা আপনাকেই বলে রাখি মুকুটটার তো কোনো অধিকারিণী আসবে না এ সংসারে তবু ওটাকে কেন রাখলাম জানেন? আমাকে যখন সাজিয়ে-গুজিয়ে এ বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যাবেন, তখন মাথায় পরিয়ে দেবেন। রাজনগরের শেষ মহারাণী। মুকুট পরে এ বাড়িতে এসে ঢুকেছিলাম, মুকুট পরে চলে যাব। মনে থাকবে তো? এটা যে কোথায় রইল বাড়ির মালিক তো জানেনই না। আপনারই জানা—

শিবশম্ভু হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলে ওঠেন, ওঃ। সে কাজটাও করে তবে এই হতভাগার ছুটি?

ওমা। তা আবার নয়? এই পরমেশ্বরী বামনী না মরা পর্যন্ত আপনার ছুটি আছে?

আমি এবার চলে যাব।

তাই আর কী! আমি যাবার আগে কেমন চলে যান দেখি।

কেবল কেবল চলে যাবার কথা তুলছেন কেন?

বাঃ। যেতে তো হবেই একদিন?

সে সকলেরই হবে।

আমাকে ফেলে ? না বাপু না। তা চলবে না। আমায় সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে তবে—

অথচ এই কিছুদিন আগেও ভেবেছেন পরমেশ্বরী 'ওদের' জন্যে আমার বাঁচা দরকার। আমি আগে চলে গেলে ওদের দেখবে কে ?···'কিন্তু হঠাৎই যেন ভিতর থেকে একটা বিদায়ের বাজনা বেজে উঠছে।···মনে হচ্ছে এবার বোধহয় যেতে হবে। হঠাৎ হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন একটা যন্ত্রণা চমকে ওঠে।

কার্তিকের শালা হেসে হেসে বলে, খুব একখানা দাঁও জুটেছিল বটে তোমার ? ভবিষ্যৎটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিলে। তো ওই বুড়ো ঘুঘু সরকার মশাইটি কমিশন খান কতো ?

ও এক মজার মানুষ। কমিশনের কথা মুখেও আনে না।

তার মানে আগেই মেরে নেয়। ওর হাত দিয়েই তো 'সোনার ঝুড়ি' পাচার হলো!

তা হতে পারে। সবই তো কর্তাদের অগোচরে। গিন্নীর সঙ্গে 'ষড়'।···

অ্যাই।···শুঁটকো বুড়োকে গিন্নী এত বিশ্বাস করে কেন বল তো ?

খোদা জানে।

কিছু বুঝতে পারিস না ?

আমার বোঝবার দরকারটাই বা কী ? দরকার তো ওর বোকামির। সেটা ভালোই আছে। ঘুঘু হলে আর অমন হালে থাকে ? গেছলাম একদিন বুড়োর কাছে। একখান গহনায় পানমরা বেশী বেরিয়েছে সেটা জানান দিতে। সেকালের ডিজাইনে পানমরাতো থাকতো প্রচুর। তো বুড়োর ঘরে ঢুকে মনে হলো ভিখিরির ঘর। মরে গেলে টেনে বার করার পর ঘরে থাকবার মধ্যে পড়ে থাকবে একটা মেটে কলসী, একটা কাঁসার গেলাস আর একটা ফাটাচটা চৌকি ! রাজবাড়ির চৌহদ্দিতে যে অমন একখানা চৌকি কোথা থেকে জুটিয়েছিল বুড়ো। আশ্চর্য। অথচ ওইখানেই পড়েও

থাকলো চিরকাল। না বিয়েসাদী না ঘর সংসার।

তা তুমি যা বলছ ব্রাদার তাতে তো মনে হচ্ছে না, আখের গুছিয়েছে। তবে কিসের লোভে অমন হাড়ির হাল করে ওখানে পড়ে আছে?

কার্তিক হ্যা হ্যা করে হেসে বলে বোধহয় রাজা যুধিষ্ঠিরের কুকুরের মতন। প্রভুভক্তি। (শেষ অবধি সঙ্গ ছাড়বো না।)

সেকালের বুদ্ধু গুলো মাইরী ছিল এক একটা এইরকম। বাপ পিতমোর নুন খাওয়ার গুণ শুধে মরছে।

যা বলেছ। তো হিসেবটা দেখে নাও।

শালা-ভগ্নিপতি এখন লাভের হিসেব কষতে বসে মনের আনন্দে।

আর এক শালা-ভগ্নিপতি এই সময় তাঁদের 'বৈঠকখানায়' দাবার ছক সামনে রেখে হিসেব কষছেন একটা বিগতকালের তিথি তারিখ নিয়ে।

আমি বলছি পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে।

আমি বলছি হয়নি। এই সামনের পূর্ণিমার দিন হবে।

আমি বলছি তোর হিসেব ভুল।

আমি বলছি তোর হিসেব ভুল।

বেট্ ফ্যাল।

ফেলছি।

কী বাজি? সে এখন চট্ করে মনে আসছে না। পরে বলব।

আরে বাবা টোপরটা পরলাম আমি, আর নির্ভুল হিসেবটা রেখেছিস তুই?

সেটাই স্বাভাবিক। যে যখন মাথায় টোপর চড়ায় তখন কি আর তার মাথায় 'মাথা'টা থাকে? পরীরাজ্যে উড়ে বেড়ায়। আমি বলছি এই সামনের পূর্ণিমায়—

দেখ মুখুটি, তুই ভাবছিস তোর স্মৃতিশক্তিটাই খুব প্রখর কেমন? আমি বলছি, তোর হঠাৎ এখন কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙলো। ওসব হয়ে গেছে দু'এক বছর আগে। তখন তোর বাই চাগল না—আর এখন।

পরমেশ্বরীকে ডাকা। ছ্যাখ সে এসে কী বলে।

সে এসে আবার নতুন কী বলবে? আমি যা বলছি তাই বলবে।

ডাকাতে হলো না। পরমেশ্বরী নিজেই এলেন তর্কের স্বরে আকৃষ্ট হয়ে। কাছাকাছিই ছিলেন। ঠাকুরের জন্যে ফুলের মালা গাঁথছিলেন ভিতর দালানে বসে।

হেসে বললেন, এখন কি নিয়ে?

রাঘবেন্দ্র বললেন, কী আবার। ওই মুখুটিটার মস্তানি নিয়ে। আচ্ছা পরমেশ্বরী আমাদের বিয়ে হয়েছে কতো বছর হলো?

অ্যাঁ। কী বললে? আমাদের বিয়ে?

পরমেশ্বরীর পরণে পুজোর গরদ শাড়ি। ফরাসে বসলেন না। একটা বেত-ছাওয়া চেয়ারে বসে পড়ে হেসে হেসে বলে উঠলেন হঠাৎ সেই তামাদি কালের কথা উঠল যে? আমাদের বিয়ে।···ও বাবা।

বাকতাল্লা রেখে উত্তুরটা দাওতো।

হ্যাঁ হ্যাঁ দাও।

বললেন কুলপতি।

কিন্তু হঠাৎই এ প্রশ্ন উঠল কেন সেটাতো জানতে হবে?

সেটা পরে জেনো। আমি বলছি এই সামনের পূর্ণিমায় তোমাদের বিয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে। আর ওই শালা বলছে সে নাকি দু'এক বছর আগে হয়ে গেছে। তো তোমার তো আর ভুল হবে না? বলো চটপট। আমায় বলে কিনা কুম্ভকর্ণ।

পরমেশ্বরী কুলপতির উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, পঞ্চাশ বছরই হোক আর একশো বছরই হোক সে হিসেবে লাভটা কী?

আছে লাভ।···রাঘবেন্দ্র বলে ওঠেন ধরো তর্কে জেতার লাভ।

তো আমারই যে ভুল হবে না এর কী গ্যারান্টি?

সে গ্যারান্টি আছে। বলো আমার ঠিক, না ওর ঠিক?

পরমেশ্বরী বলেন, এ তো বড় মুস্কিলে পড়লাম গো। তুমি হচ্ছো পতি পরম গুরু. তোমায় যদি হারিয়ে দিই, তাহলে তো মহাপাপ।

ওঃ। তার মানে আমারই ভুল?···রাঘবেন্দ্র বলেন, এখনো পঞ্চাশ হতে

বাকি আছে ? অ্যাঁ।

দেখলি দেখলি শালা ? ভারী অহঙ্কার দেখানো হচ্ছিল যে 'টোপর পরলাম আমি ! আর হিসেব রাখলি তুই ?'…হলো ?

রাঘবেন্দ্র মাথা চুলকে বলেন, হ্যাঁগো এখনো পঞ্চাশ হয়নি ? আমার যে মনে হচ্ছিল যে অনেককালের কথা। আচ্ছা বলো সে কী আজকের কথা ? সেই তুমি কাঁদতে কাঁদতে পালকীতে চড়ে বসলে।…সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় ভয়ে ভয়ে বললাম, কাঁদছ কেন ? আর তুমি বলে উঠলে—

কুলপতি হো হো করে হেসে উঠে বলেন, এসব তো খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে আছে ?…হা হা। তো তোর নতুন কনে কী বলল ?

বলল ?

রাঘবেন্দ্র বললেন, যা একখানা বলল না ! ভেবেছিলাম বোধহয় বলবে মা-বাবার জন্যে মন কেমন করছে। তা নয় বলল কিনা সর্বশরীরে গয়না ফুটছে। এত গয়না পরতে পারে মানুষ।

অ্যাঁ। বলিস কী ? ও পরমেশ্বরী। এই তোমার প্রথম প্রেমবচন ?

তা বলব না কী করব ? গরীব স্কুল-মাস্টারের মেয়ে হাতে দু'গাছা কাঁচের চুড়ি ছাড়া কিছুই থাকতো না। আর কিনা ঝুড়িখানেক গহনা নিয়ে গিয়ে গায়ে চাপিয়ে—

রাঘবেন্দ্র বললেন, আরো একটা কথাও বলেছিলে মনে আছে ?

কুলপতি বললেন, তোর যে দেখছি স্মৃতি উথলে উঠছে। তো কী বলেছিল ? পাবলিকের সামনে বসে বলা যাবে না ?

রাঘবেন্দ্র বললেন, পাবলিক মানে তো তুই ? হ্যাৎ। কী বলেছিল জানিস ? আমায় বলল, 'গলার গয়নাটা খুলে দাওনা। বড্ড ফুটছে—' তো ওসব খোলাখুলি আমার সাধ্যি ? তাছাড়া প্রাণে ভয় নেই ? বললাম খুলে দিলে সবাই আমায় বকবে। তো বললো কিনা বুঝেছি। একটা ভিতুর রাজা। আমার কপালে অশেষ দুর্গতি আছে বুঝতে পারছি।

অ্যাঁ। পরমেশ্বরী। এই তোমার প্রথম প্রেম নিবেদন ? হা হা হা !—রায়-মশাই ! একথা তো কোনোদিন ফাঁস করনি ?'

কে আর কবে ওই আধ শতাব্দী আগের কথা তুলেছে ?

তা এখন হঠাৎ ওঠার হেতু ? পরমেশ্বরীর কথায় দুই বিরোধী পক্ষ তাকাতাকি করে।···ভাবটা, বলে ফেলা হবে না কী ?

পরবর্তী ইসারা—'বলে ফেলা হোক।'

ইসারা—কে বলবে ?

ইসারা—তুই বল।

কুলপতিই বলে ওঠে, ঠিক করা হয়েছে এ বছর তোমাদের পঞ্চাশ বছরের বিবাহ বার্ষিকীর উৎসব করা হবে।

কেন ? হঠাৎ তুই বুড়োকে ভুতে পেল না কী ?

পরমেশ্বরী। ফের ?

ওঃ। ভারী চোখরাঙানো হচ্ছে। বুড়োকে বুড়ো না বলে তরুণ বলতে হবে। বলি কার মাথা থেকে বেরিয়েছে এটি ?

রাঘবেন্দ্র বলেন, ওই মুখুটির। আবার কার ? বলে কিনা আজকাল এসব হয়েছে। বছর বছর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি···পঁচিশে সিলভার জুবিলি, পঞ্চাশে গোল্ডেন জুবিলি—

বটে। ঘরে বসে এতো জানলে কী করে হে মুখুটি মশাই ?

কুলপতি বললেন, চোখ-কান খোলা রাখলে সবই জানা হয়ে যায়। বলি তুমিই বা জগৎ সংসারের সবই জেনে ফেল কী করে ? বাড়ি থেকে তো বেরোওনা।

মেয়েদের কথা আলাদা ! পাগলামিটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতো।

রাঘবেন্দ্র বলেন, না না সেটা হবে না।

তুমি তো বাজিতে হেরে গেছ···তুমি আবার বলতে এসেছ যে ?···পরমেশ্বরী বলেন।

কুলপতি বলেন, আমি তো হারিনি। আমিই বলছি। ওইদিন বাড়িতে সব আলোগুলো একসঙ্গে জ্বালানো হবে, তোমার সেই বিয়ের দিনের মতো সর্বঅঙ্গে গহনা পরে আর লাল জরির শাড়ি পরে সাজতে হবে। আর শালাটাকেও নতুন বর সাজিয়ে তোমাব পাশে দাঁড় করিয়ে ফটো তোলা

হবে।

বাঃ। বাঃ চমৎকার। আর কী কী হবে শুনি?

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

পরমেশ্বরী রাঘবেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমিও তাহলে নতুন বর সাজতে রাজি আছো?

তা কী করবো?···রাঘবেন্দ্র হাসেন, বাজি হেরে গেছি, এখন আর আমার ট্যাঁ ফোঁ করা চলবে না। ও যা হুকুম করবে মেনে নিতে হবে।

'ও' যদি ডিগবাজি খেতে বলে খাবে?

রাঘরেন্দ্র বলেন, যতই হোক মুখুটি আমার চিরকালের বন্ধু, ও কী আর এমন হেনস্তার হুকুম করতে পারবে? প্রাণে দরদ নেই?

তা দরদটি শুধু বন্ধুর ওপরই থাকবে? আমার ওপর নয়?

মানে?

মানে দু'টো পাগলের পাল্লায় পড়ে আমায় কনে সেজে ফটো তুলতে হবে। এও ডিগবাজি খাওয়ার তুল্য। বাহাত্তর না হতেই বাহাত্তুরে। যাই বাবা কাজ ফেলে চলে এসেছি!

এই সময় বলরাম এসে দরজার কাছে দাঁড়াল! এবং কর্তাজনেরা থাকতেও পরমেশ্বরীকে উদ্দেশ করেই বলল, বড়মা, চাঁদা চাওয়া ছেলেগুলো আবার এসেছে। তখন ভাগিয়ে দিলাম 'হবে না' বলে—

সে আবার কী? হবে না বলে ভাগিয়ে দিয়েছিস মানে?

তা কী করবে? মনসা পূজো লাগাবে তার চাঁদা।

মনসা পূজো।

রাঘবেন্দ্র বললেন, সেও আবার বারোয়ারি হয় নাকি?

পরমেশ্বরী বললেন, হওয়ালেই হয়। তো ভাগাবার দরকার কী? ছেলে-পুলের ব্যাপার!

বলরাম বীরত্বের সঙ্গে বলে, ছেলেপুলের তো বছরভোরই এসব ব্যাপার চলছে। পূজোয় ভক্তিতো কত! কেবল নিজেদের খ্যাঁট আর নাচনা গাওনা। আবার তো ক'দিন বাদে রক্ষেকালী পূজো করবে বলে রেখেছে।

পরমেশ্বরী হেসে ফেলে বলেন, তুই এমন ভাব করছিস, যেন ভাজা মাছ-খানি উল্টে খেতে জানিস না। নাটের গুরু তো তুই? ওদের সাহস দিয়ে ডেকে আনে কে?

ডাকা কী গো বড় মা। একদম নাছোড়বান্দা।

তো জিগ্যেস করগে কত চায়?

বলরাম অম্লান বদনে মুঠো থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে মেলে ধরে বলে সে আর শুধোতে হবে না। এই যে একেবারে রসিদ কেটেই দিয়েছে। দুই শত টাকা।

রাঘবেন্দ্র বলে ওঠেন, 'মনসা' পূজোর চাঁদা দুই শত টাকা।

বলরাম আত্মস্থ গলায় বলে, তা রাজবাড়ির একটা প্রেস্টিজ আছে তো? ওর কম কাটবে কী করে?···মনসার গান দেবে 'চাঁদ সদাগর' যাত্রাপালা আনাবে চিৎপুর থেকে, তবু তো বলে দিয়েছি টাকা সর্ট পড়লে পরে দেখা যাবে। এখন ওতেই সন্তোষ থাক।

হো হো করে হেসে ওঠেন রাঘবেন্দ্র। ও এসব আশ্বাস দেওয়া হয়ে গেছে? পরমেশ্বরী বলেন, সাধে বলেছি, এটিই নাটের গুরু। বলগে যা দিচ্ছি গিয়ে।

বলরাম হৃষ্টচিত্তে নেমে যায়।

পরমেশ্বরী ফিরে দাঁড়িয়ে বলেন, গ্রামের লোকের সঙ্গে রাজবাড়ির তো প্রত্যক্ষ বিশেষ কোনো যোগ নেই? যা যোগাযোগ পূজো পার্বণে বারোয়ারি তলায় আর এই চাঁদার খাতায়। এ বাড়ির নামে মোটা চাঁদা ধরেই রাখে। তো এখন দিন দিন বাছাদের 'ভক্তিভাব' বাড়ছে। নতুন নতুন পূজো আবিষ্কার করছে। এখন তো বিশ্বকর্মা পূজোয় দুর্গোৎসবের অধিক ঘটা। আগে দেখেছ কখনো এমন?

তার মানে যাতে তাতে একটা উপলক্ষ খাড়া করে আমোদ আহ্লাদ করা। পরমেশ্বরী বলেন, তা ছেলেপুলের দেখাদেখি বুড়োদেরও তো সেই হাওয়া গায়ে লেগেছে দেখছি।···আমাদের ইচ্ছে চেগেছে—বুড়োবুড়ি ধরে বিয়ে দে। বলে কুলপতির প্রতি একটি কটাক্ষ হেনে নিচে নেমে যান।

ফিরে এসে ফেলে রেখে যাওয়া কাজটায় হাত লাগান বটে পরমেশ্বরী, কিন্তু হঠাৎ যেন একটা সন্দেহের দানা মনটার মধ্যে খচ্‌ খচ্‌ করতে থাকে।…আচ্ছা ওরা কী কোনোভাবে শুনতে পেয়েছে পরমেশ্বরীর গহনার সিন্দুক এখন শূন্যগর্ভ! সেটাই যাচাই করবার জন্যে এই ধুয়ো তুলে পরমেশ্বরীকে 'বিয়ের কনে' সাজাবার বায়না?…কিন্তু কি করে শুনবে? কে বলবে? সরকার মশাই। প্রশ্ন ওঠে না।…ওই কার্তিকটা?…সে কখনোই নিজের স্বার্থ-হানি করে প্রকাশ করতে যাবে না। প্রকাশ করলেই তো প্রকাশ পেয়ে যাবে কার্তিক কতটি ঠকিয়েছে আর কতটি লাভ করেছে!…

ভাবতে ভাবতে আবার মনটা লজ্জায় গুটিয়ে যায়। ওই লোক দু'টো সম্পর্কে এমন চিন্তা করছেন পরমেশ্বরী?…ওরা ছল কৌশল করে 'তথ্য' সংগ্রহ করবে? ছি ছি।…শুনতে পেলে তক্ষুনি উত্তাল হয়ে প্রশ্ন করতো পরমেশ্বরী! এসব কী শুনছি?

নাঃ। ওদের সম্পর্কে এ সন্দেহ করা খুব গর্হিত।

তবে একটা সন্দেহের কথা কুলপতির মুখে একদিন উচ্চারিত হয়েছিল, আচ্ছা পরমেশ্বরী! তোমার শ্বশুরের ব্যাঙ্কে কত লক্ষ টাকা জমা ছিল?

শুধু আমার 'শ্বশুর' নয় হে। তোমারও শ্বশুর।

এই বলে প্রশ্নের প্রথম ধাক্কাটা সামলাবার সময় নিয়েছিল পরমেশ্বরী।

আচ্ছা! না হয় উভয়েরই শ্বশুর। সেটা প্রশ্ন নয়। বলছি—ভদ্রলোকের ব্যাঙ্কের মজুত টাকাটার সংখ্যাটা কত ছিল? এই যে বছরের পর বছর রামরাজত্ব আর রাজাগিরি চলছে—এসব আসছে কোথা থেকে?

পরমেশ্বরী আরো একটা চাতুরিতে উত্তরটা ঠ্যাকায়।

জামাই মানুষের এসব কূটকালে প্রশ্ন কেন? হাঁড়ির খবরে তোমার দরকার?

দরকার কিছুই নেই। যত দিন না 'প্রহারেন ধনঞ্জয়ে'র অবস্থা আসে, বেহায়া ঘরজামাইরা ততদিন পর্যন্ত নড়ে না। শুধু জানতে কৌতূহল কতটি টাকা জমানো থাকলে—

পরমেশ্বরী এখনো সরাসরি উত্তরে যায় না। বলে, রাজারাজড়া এমন ব্যবস্থা

করে যেতেন যে ভবিষ্যৎ বংশধরদের 'সুদেই' চলে যেতো।

সরাসরি মিথ্যা ভাষণ নয়। তখনকার রাজারাজড়ারা করতেন।...তা পরমেশ্বরীর দাদা শ্বশুরই তো তাঁদের কুলদেবী সর্বমঙ্গলার চিরকালীন পূজোর জন্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে রেখেছেন 'দেবোত্তরের' মাধ্যমে। তবে হ্যাঁ এখন ক্রমশই বাজার অগ্নিমূল্য। তাই আগের সেই জমজমাটি ভোগরাগটি হয় না।...আগে—দৈনিক আধমণ চালের ভোগ হতো, উৎকৃষ্ট গোবিন্দভোগ চালে।...কমতে কমতে এখন দৈনিক পাঁচপোয়া চালের।... 'কিলোকে সেরের হিসেবে ফেলে এই পাঁচপোয়ার মাপ।...আগে পাড়ার সব ক'টি ব্রাহ্মণ বাড়িতে 'ভোগের প্রসাদ' ওজনমাফিক বরাদ্দ ছিল, এখন ভোগের প্রসাদটি শুধুই সেবাইত মহাশয়ের ভোগে লাগে। ওতেই তাঁর সস্ত্রীক সপুত্র চলে যায়।...তবু চলেতো যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে শাক সুক্ত থেকে পরমান্ন পর্যন্ত রান্নাতো করা হয় দেবীর জন্যে? এখনো পর্যন্ত তো বাইরে থেকে যোগান দিতে হয়নি। তবে? তবে আর ভাবতে দিতে দোষ কী, ওদের ব্যাঙ্কে মজুত টাকার সুদ থেকেই পরমেশ্বরী 'রাজকুমার' আর 'রাজমাতার' রাজভোগটি ম্যানেজ করে চলেছে।

হঠাৎ একটু হেসে ফেললেন পরমেশ্বরী। আচ্ছা যেদিন সত্য প্রকাশ পেয়ে যাবে? যাবে তো একদিন। কলসীর জল তো তলায় ঠেকেছে।...সোনার দাম এতো বেশি বেড়েছে বলেই না ঠকে ঠকেও চলে যাচ্ছে।...তাছাড়া শুধুই কী সোনা? রাজবাড়ির সমস্ত শোভা যে! ভেবে কী হবে? দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত।

বড়মা!

বুলি এসে দাঁড়াল।

বলরামের সঙ্গে একসঙ্গে আসেনি। তবে অবধারিত যে সে হতভাগা অন্তরালে কোথাও আছে।

মুখ তুলে বললেন কী?

ওই 'ফাংশান' ছেলেরা আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চায়।

কেন বাবা। আবার কী? চাঁদা পাওয়া তো হয়ে গেছে।

না সে কথা না। অন্য কথা। বলছে খুব জরুরি।

কই কোথায় তারা?

কোথায় আর থাকবে? বাইরে। বারবাড়ির চাতালে। তো সেখেনের সিমেন্ট গাঁথা বেঞ্চিগুলো তো ভেঙে চুরে রাবিশ ঝরছে। দাঁড়িয়েই আছে।

ডাক বাবা ওই বৈঠকখানা ঘরের আস্ত দিকটায়।

হ্যাঁ সেখানে একটা কোণ পড়ে গেছে। সেখান থেকে রোদের সময় আলো আসে, বর্ষার সময় জল।

গোটা পাঁচ সাত ছেলেকে ডেকে নিয়ে এল বুলি।

এদের সঙ্গে যে বুলির বেশ দহরম, তা বোঝা যাচ্ছে।

পরমেশ্বরী পারিবারিক প্রথা অনুসারে ভিতর দালানের দরজার কাছে একটা বেতের মোড়ায় এসে বসলেন। বললেন, কী বাবা? আবার কী? গোটা আষ্টেক ছেলে ঝপাঝপ মুণ্ডু হেঁট পর্ব শেষ করে এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে একজন মুখপাত্র হয়ে তার বক্তব্য পেশ করল।

কিন্তু এ যে এক অদ্ভুত আর অভাবিত বক্তব্য!

পরমেশ্বরীর অনুমান তো এর ধারে কাছে দিয়ে হাঁটেনি। ভেবেছিলেন নির্ঘাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আরো কিছু টাকার জন্যে আবেদন। অথবা হয়তো ওদের সাধের ফাংশানের জন্যে রাজবাড়ির কোনো পুরনো কালের জিনিস-পত্রের নমুনা। চাদর শতরঞ্চি এসব মাঝে মাঝে নিয়ে যায়। তা সে সব তো সরকার মশাইয়ের একবার একটা পুরোনো রুপোর গড়গড়া নিয়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য ফেরৎ দেয়নি। দলের পরস্পরকে দোষারোপ করেই কর্তব্য শেষ করেছিল।

…কিন্তু আজকের প্রস্তাব তো তা নয়।

অনেক ধানাই পানাই করে ছেলেটা যা বলল, তার মর্মার্থ হচ্ছে তারা যখন তাদের যাত্রাপালা 'চাঁদ সদাগরের' বায়না দেবার জন্যে কলকাতায় চিৎপুরে গিয়েছিল তখন পালার নায়ক বিশিষ্ট সিনেমা অভিনেতা 'অনুত্তম ঘোষ' তাদের মাধ্যমে একটি আবেদন জানিয়েছেন। কী সেই আবেদন? আবেদন তাঁরা একটি পুরনো জমিদারবাড়ির বনেদী পরিবার নিয়ে কাহিনী রচনা

করে ছবি তুলতে চান। এখন সেই 'ভাঙা রাজবাড়ির' ধ্বংসোন্মুখ চেহারার জন্যে লোকেশান খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেছেন এই রাজনগর রাজবাটি। ঠিক যেমনটি চান তেমনটি। অতএব আগ্রহে অধীর। এখন 'বড়মা' যদি অনুমতি দেন তাহলে তারা দলবল নিয়ে—

পরমেশ্বরী শুনে উদ্বেল হলেন।

বাঃ এ তো বেশ রোমাঞ্চকর। বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিনের মধ্যে একটা অন্য স্বাদের শাড়ী।

বললেন, বুঝেছি। 'জলসা ঘরের' মতো?

তা বলতে পারেন। তবে গল্প অন্যরকম।

পরমেশ্বরী বললেন, আচ্ছা গল্প পরে শুনবো। কিন্তু বাপু আমি কী অনুমতি দেবো? 'রাজবাড়ির' মালিককে জিগ্যেস করো।

ছেলেটা সবিনয় দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'মালিক' তো আপনিই। আপনাকে ছাড়া আমরা কাকে জানি? আর জানি আপনার হুকুমেই সব হয়। আপনিই তো সব।

শোনো কথা। এসব কথায় আমি কে? কর্তাদের না বললে হয়?

ছেলেটার সবিনয় উক্তি, ওনাদের সামনে যাবার সাহস টাহস তাদের নেই তারা এই 'বড়মা'র কাছ থেকেই অনুমতি আদায় করে নিয়ে যেতে চায়। ক্লাবঘরে ওনাদের একজনা বসে আছেন, মতামত জানতে।

ভালো মুস্কিলে ফেললে তো।

পরমেশ্বরী ভিতরের আগ্রহ উত্তেজনা চাপা দিয়ে নিরাসক্তের ভঙ্গীতে বললেন, সত্যি তো আর ওনাদের না জিগ্যেস করে হুকুম দিয়ে বসা যায়? তবে বোসো একটু।

কিন্তু ফাংশানবাজ চাঁদা চাওয়া ছেলেগুলোর বোধবুদ্ধিতো আর কম নয়। তারা ঠিক জায়গাতেই আবেদনটি পেশ করতে এসেছে।

'রাজকুমার' আর 'রাজজামাতার' কাছে গিয়ে ওদের প্রস্তাবটি জানাতেই তাঁরা অবাধ উদারতায় বললেন, এর আবার আমাদের জিগ্যেস করতে এলে কী বলে? ছেলেগুলো কী মনে করল? তুমি যা ভালো বুঝবে তার

ওপর আবার আমরা কী বুঝতে যাব ?

তা হোক ! আমারও তো একটা স্বস্তি অস্বস্তি আছে ? কী জানি এতে ভালো হবে না মন্দ হবে ?

কুলপতি বললেন, এর আবার 'মন্দ'র কী আছে ? সিনেমাওলারা তো এই কম্মই করে বেড়ায়।

পাড়ার লোকেরা কিছু নিন্দে টিন্দে করবে না তো ?

পাগল ? পাড়ার লোকেরা নিশ্চয় মুখিয়ে আছে।

বরং ওদেরকে 'না' করে দিলেই নিন্দেয় আর রাগে ফাটবে।

তাহলে 'হ্যাঁ' করে দিই ? ও রাজামশাই ?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। এর আবার ভাবনার কী আছে ? মুখুটি যখন বলছে—

অতঃপর—

প্রস্তাবকারীদের উল্লসিত আনন্দে 'হিপ হিপ হুররে' ধ্বনি দিতে দিতে প্রস্থান।

তার আগে অবশ্য পরমেশ্বরীর দু' একটি প্রশ্ন ছিল—যারা আসবে তারা এই রাজবাটিতে থাকতে চাইবে না তো ?

না। না। তাদের একটা বিরাট দল। ইস্কুলবাড়িতে আর ক্লাব ঘরে ব্যবস্থা হবে।

তাদের কাছে যদি আমি সেই কাহিনীটা শুনতে যাই ?

বলবে নিশ্চয়।

ঠিক তো ?

ওরা অনুমতিপত্র হাতে পেয়ে গেছে। এখন আর দাঁড়ায় ?···বলল, আচ্ছা গিয়ে বলছি।···

খুব একটা আহ্লাদ হচ্ছে।

নিজের মনেই হাসেন পরমেশ্বরী, বুড়ো বয়েসে, বেশ একখানা ছেলেমানুষী? প্রায় বুলির মতো অবস্থা ঘটছে যে দেখছি।

কেমন সব লোক আসবে ? কী ভাবে এই ধ্বংসোন্মুখ 'রাজবাটির' ছবি

তুলে নেবে ? কোনো কোনো অংশের ?

আচ্ছা, আমাদের বসবাসের ঘরগুলোরও কী ছবি নেবে ? একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা উচিত না কী ?

ভাবেন আর মনে মনে হেসে ফেলেন। ওরা তো পুরনো ভঙ্গীই চায়।

বুলি এসে খবর দেয় দলেরা এসে গেছে গো বড়মা। কত কত যন্তরপাতি, কত কত জিনিস। এখনো—হিরোইন আসেনি। বলছে, 'দুদিন' বাদে আসবে। জানো বড়মা, হিরোইন না কি বলেছে রাজবাড়িতে এসে রানী-মা'র সঙ্গে আলাপ করবে।

সে তো আসেইনি বলছিস ? কখন বলল ?

লোকেদের মুখে মুখে শুনলুম।

তুই বোধহয় এইখানেই পড়ে আছিস ?

আচ্ছা। ঠাকুমা দেবে থাকতে ? বাপও বলেছে যখন তখন যাবি না।

তো এত খবর পাচ্ছিস কোথায় ?

বুলি বিগলিত হাস্যে বলে, ওই মুখপোড়া বলরাম তো সব্বো ঘটে কাঁঠালী-কলা।…

কিন্তু আমি যে সিনেমার গল্পটা শুনতে চাইলাম ?

বলি ঢোঁক গিলে বলে বলরামদা বলেছিল। তো সেই ভদ্দরলোক বলে কিনা যিনি শুনতে চেয়েছেন তাঁকেই বলব।

পরমেশ্বরী বলেন, ওমা, তা তো বলবেন। না তো কী বলরামের মুখে শুনব ? না তোর মুখে ?

বুলি উদ্ভাসিত মুখে বলে, তিনিই তো 'প্রডিউসারগো'। আপনি তার সামনে বেরোবেন ?

কেন রে ? আমিই কী এতই পর্দানসীন ?

এই যে তোদের ফাংশানের দিন আমায় বলেছে যারা মেডেল পাবে তাদের-কে আমায় দিতে হবে হাতে করে ?

বুলি বলে তা জানিনে বাবা। বলরামদা চাল ফলিয়ে বলেছে, 'রানীমা' অন্দরে থাকেন। তাঁকে কী করে শোনাবেন ? আমায় বলে দিন।…তো

সে রাজি হয়নি।

বলরামের যেমন বুদ্ধি। ডাক তাকে।

অবশেষে বলরামের বুদ্ধিকে সংশোধিত করা হয়।

'অনুত্তম ঘোষ' নামক যাত্রাপালার সেই নায়ককে রাজবাড়িতে আমন্ত্রণ করে এনে গল্প শোনার আসর বসানো হয়।

দোতলার ঘর।

যে ঘরটিতে কুলপতির আস্তানা।

ঘোষ মুগ্ধ বিগলিত বিচলিত গলায় বলেন, এ রকম যে হতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। সব কিছু যেন আমার কল্পনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।··· এইরকম ঘরদালান থাম। দরজা জানলা। এইরকম বনেদী চালের পালঙ্ক, ড্রেসিং টেবল্···উঃ। এরকম একটা কাট্ গ্লাসের ডিকান্টারের নমুনা খুঁজতে শহরে সমস্ত পুরনো বাজার চোরাবাজার খুঁজে বেড়িয়েছি। পাইনি।··· বেহালা? বেহালাও রয়েছে? কে বাজান?···ইনি?···দারুণ।···দেয়ালে ওই ছবিটি কার?···ইস! এই বয়েসে মারা গেছেন।···আবার দাবা খেলার ব্যাপারও আছে বাড়িতে? কী আশ্চর্য!

পরমেশ্বরী অতিথি আপ্যায়নের সাজানো থালা এগিয়ে ধরে ঈষৎ হেসে বলেন, ব্যাপার কী? রীতিমত চার্ম।···এই দুই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওই নিয়েই তো থাকেন।···

অনুত্তম ইতিমধ্যে দু'জনের 'পরিচয়' জেনে নিয়েছেন।···রাঘবেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি যদি স্যার আগে আপনাদের দেখতাম, তাহলে আর গল্পের আলাদা নায়ক খুঁজতে যেতাম না।

হাসলেন গলা খুলে।

'এর আগে আর একটা ছবির ব্যাপারে এরকম একটি সাবেকী বাড়ির সন্ধান পেয়েছিলাম। তো বাড়িতে কোনো বাসিন্দা ছিল না।···বাড়ি রয়েছে 'কোর্ট অব ওয়ার্ডসে।' সেখান থেকেই পারমিশান বার করে—ওঃ সেওএক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।···নাচঘরের সিলিঙে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে, মাকড়সার জালে আচ্ছন্দ।···'আচ্ছা এখানে 'নাচঘর' গোছের কিছু তো—

ছিল। সে সব পড়ে গেছে।

কুলপতি বললেন, আমি মশাই এ বাড়ির ঘরজামাই। বৌ নেই, শ্বশুরবাড়িতে থাকি পূর্বের সম্বন্ধে।···'হা হা হা। তা' আমি তো বিয়ে হয়ে এসেই দেখছি 'নাচঘরের', বৈঠকখানা ঘরের ওই ভগ্নস্তূপ।···দেখেননি? রীতিমত জালি গজিয়ে গেছে।

এহেন পরিবেশে এখনো এঁরা বাস করছেন দেখে প্রডিউসার ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করলেন। 'রিস্ক' বলে অভিহিত করলেন, আবার সাহসের এবং পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য প্রশংসাও করলেন।

ছবির নায়কও আপনি?

না, না, এ ছবির নায়ক আমি নিজে হচ্ছি না। আমি 'কাহিনীকার' চিত্র-নাট্যকার পরিচালক এবং প্রডিউসার!···কী বলব, আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে ঠিক এই রকম একজন নায়ক? আমার কল্পনায় ছিল। বয়েস চেহারা সাজ—

হঠাৎ একটু ইতস্তত করে বলেন, কিছু যদি মনে না করেন। একটা কথা জিগ্যেস করব?

রাঘবেন্দ্র বললেন, স্বচ্ছন্দে।

বলছিলাম, আজ আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলেই কি এরকম মধ্যযুগীয় জমি-দারজনোচিত সাজ করেছেন আপনারা, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে?

দুই বৃদ্ধই হেসে ওঠেন।

শুধু আজই নয় মশাই, প্রত্যহ প্রতিক্ষণ আমাদের এইভাবেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নাটকের জমিদার সেজে বসে থাকতে হয়। এদিকে তো ভাঙা ইটের বোঝার মধ্যে বাস! তালপুকুরে ঘটি ডোবে না।

'থাকতে হয়?' মানে বুঝলাম না। উইলে কী সেরকম কিছু—

আহা না, না। এই যে এই রাজবাড়ির শেষ মহারানীর হুকুম। এখানে বাস করতে হলে পরিবেশের সঙ্গে মানানসই হয়ে থাকতে হবে!···প্যান্টি শার্ট অচল। সর্বদা লম্বা কোঁচা ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি সোনার বোতাম হীরের আংটি রুপোর বাঁধানো ছড়ি, রুপোর গড়গড়া—হা হা হা। আপনা-

দের নাটকের নায়কই।

বাঃ।

অনুত্তম ঘোষ বলেন, আইডিয়াটি এনকোর···কিন্তু আপনি তো কই—

পরমেশ্বরী হেসে ওঠেন, না নিজের ওপর আর শাস্তি চাপাইনি। যা হয়ে যাক পরের ঘাড় দিয়ে।

অতঃপর অনুত্তম তাঁর কাহিনীর কাঠামোটি শোনান মোটামুটি। এবং আব্দার জানান, এই প্রাসাদের মধ্যেও তিনি কিছু শুটিং করবেন।

আমাকে তো তাহলে স্টুডিওর মধ্যে অনেক কিছুই না সাজালে চলবে।··· এই দাবার ছক পাতা ফরাস, ফরাসের পাশে গড়গড়া···ওঃ মার্ভেলাস।··· অম্বুরি তামাকের গন্ধে আমি নিজেই যেন অতীতে চলে যাচ্ছি।

কিন্তু আমিও একটি প্রশ্ন করি—পরমেশ্বরী বলেন, আপনার নামটি কি গার্জেনদের দেওয়া ?

কেন বলুনতো ?

মানে মা বাপ ঠাকুর্দা কী এ নাম রাখেন ?

ও হো হো। আপনার খুব খেয়ালতো না, নামটা তাঁদের দেওয়া নয়। রেখেছিলেন—'সর্বোত্তম' যেটাকে একটু কারেকশান করে নিয়েছি! আচ্ছা। অদ্ভুত ভালো লাগল।···

চলে গেলেন।

তাঁর কাহিনীর রেশটি ঘরের বাতাসে যেন একটু পাক খেতে লাগল। আর পরমেশ্বরীকে যেন খানিকটা আচ্ছন্ন করে রাখল।

কিন্তু কী সেই কাহিনী ?

বলতে গেলে প্রায় যাত্রাপালা ঘেঁষাই।

এমনি এক ভগ্নদশাগ্রস্ত প্রাসাদে···যার অনেকটাই মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।···চারিদিকে বিগত ঐশ্বর্যের ইতঃস্তত চিহ্ন আর তার মধ্যে বাস করছেন প্রাসাদের শেষ মালিক জমিদার বংশের শেষ বংশধর 'জগৎ নারায়ণ সিংহ রায়।' যেন পূর্বপুরুষের একটি প্রতীক।···ঠিক এদের মতোই এখনো তিনি তাঁর পিতামহের স্টাইলে সাজসজ্জা করে বসে থাকেন। এবং

দাবাখেলায় মজে থাকেন।···দাবার সঙ্গী তাঁর এক বন্ধু। সেকালের ভাষায় মোসায়েব। যাদের স্বভাব হচ্ছে 'জল উঁচু তো জল উঁচু।' তবে লোকটা তলে তলে 'জগৎনারায়ণের' যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সবই গ্রাস করে চলেছে। এই ভাঙা প্রাসাদে আর আছেন জগৎনারায়ণের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বিম্ববতী। নিঃসন্তান জগৎনারায়ণের দুই স্ত্রী বিয়োগের পরও এই তৃতীয় চেষ্টা।···

বিম্ববতীর দিন কাটে নিঃসঙ্গ।

বিরাট এই ভাঙা প্রাসাদের খাঁজে খাঁজে যেন ভয়ের বাসা।···বিম্ববতী··· সর্বদা এক অজানা ভয়ের শিকার।·· কে কোথায় যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে। কে কোথায় যেন হঠাৎ হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে।···

প্রাসাদের একান্তে আর একজনের বাস। জগৎনারায়ণের বাবা প্রলয়নারায়ণ সিংহরায়ের এক দূর-সম্পর্কের আশ্রিত আত্মীয়।···সে এক অন্ধযুবা।··· তার সঙ্গী একটি বেহালা।···

এই ভগ্নপ্রাসাদের কোনো এক কোণ থেকে তার বাজনার করুণ রাগিনী শোনা যায়। বিম্ববতী প্রাসাদের অলিন্দে বসে থাকেন কান পেতে।··· তাকে কোনোদিন দেখবার সুযোগ হয়নি।···হয়তো ভৃত্যদের সঙ্গে তার খাওয়ার ব্যবস্থা। হয়তো খুব দীনহীনভাবেই থাকে।···বিম্ববতীর ভারী কৌতূহল হয় তাকে দেখার।···কিন্তু কাকে বলবেন?···তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি তো জগৎনারায়ণ প্রায় উদাসীন। নিজের প্রয়োজনে তার মূল্য। তারও যে একটা মন আছে তা খেয়াল করেন না।···মদ আর মোসায়েব এই দুইয়ের মধ্যে তিনি আবদ্ধ।

কিন্তু বিম্ববতী ওই অন্ধবাদকের বাজনা শুনে শুনে অধীর হয়ে চিন্তা করে কেমন ভাবে তাকে একবার দেখবে।···

অবশেষে একদিন এক পুরোন দাসীকে বখশিস কবুলে তাকে রাজী করায়, সন্ধ্যার পর সে যখন তার বেহালাটা নিয়ে ছড় টানে তখন নিয়ে যাবে বিম্ববতীকে।···

কোন্‌খান দিয়ে?

সে আছে এক আশ্চর্য পথ।

প্রাসাদের এক প্রান্তে ছিল এক সুড়ঙ্গ, যার শেষ সীমান্ত প্রাসাদের বাইরে গঙ্গাতীরে। অতি পর্দানসীন রানীমা আর তাঁর পরিজনেরা যখন যোগাযোগে গঙ্গাস্নানে যেতেন তখন নেমে যেতেন এই সুড়ঙ্গ পথে। সুড়ঙ্গের মুখে অপেক্ষা করতো পালকী। পালকী সমেত চুবোনো হতো তাঁদের। এই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে চলে যাওয়া যায় বারবাড়ির চত্বরেও। যেখানে ওই অন্ধ বেহালাবাদকের আস্তানা।···

দাসী বলে, শুনতে পাই 'আত্মীয়' তো সেভাব এখন আর নাই। 'লোক-জনে'র জন্যে যা রান্না হয় তাই খেতে দেয়। বড় ভালোমানুষ ছেলে।'

বিম্ববতী আরো আকুল হয়। এবং সেই পথে গিয়ে পৌঁছে যায় শোভাময়ের কাছে।

দাসীটি বলে দেয়, ওগো দাদাবাবু, তোমার 'ব্যায়লা' শুনে এই রানীমার খুব মন লেগেছে, তাই তোমারে একটু দেখতে এসেছেন।···কাছে বসে একটুক শুনবেন!···আমি দরজায় আছি। দেখো দাদা যেন কাকেপক্ষীতে না টের পায়। তালে আর মুণ্ডু থাকবে নি।···

পাহারায় থাকে নন্দরানী। একগাছা সোনার বিছে হার পেট কোঁচড়ে বাঁধা। ত্বঃসাহসের জোগানদার।

নিঃশব্দে আবার বিম্ববতীকে ফিরিয়ে এনে নন্দরানী বলে, হলো তো দেখা! বাবা বুকের কাঁপুনি যাচ্ছে না আমার। আহা অমন চাঁদের মতো ছেলে! চক্ষু ত্বটি অন্ধ। ভগবানের কী খেলা।···

তা 'ভগবানের খেলা' মানুষকে 'অন্ধ' করেই দেয় বৈকি।·· ওই বুকের কাঁপুনি সত্ত্বেও নন্দরানী আবার বিম্ববতীকে নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে নামে।·· আবার। আবার।···

বিম্ববতীর গহনার ভাঁড়ারে কত হার কত বালা তাগা আংটি মাকড়ি। রোজই যদি কমে একটা করে কী এসে যায় বিম্ববতীর?

নিত্য অভিসার! নির্দোষ নির্মল। শুধু সান্নিধ্য। তবু নেশা অদম্য। কিন্তু তারপর?

তারপর এই নিত্য অভিসারের লীলা আবিষ্কার করে বসল সেই খল

মোসায়েবটা।…অতঃপর কানে উঠল জগৎনারায়ণের। আর তার পরদিন বিম্ববতী সুড়ঙ্গের মধ্য থেকে বেরোবার মুখে দেখল, সুড়ঙ্গের মুখে পাথর চাপা। ছুটে গিয়ে অন্য মুখের কাছে ফিরে গেল। সেখানে ভগ্ন ইটের স্তূপ।…বাতাস আসার পথ নেই।

আর তারপর? তারপর থেকে ওই ভাঙা প্রাসাদের দেয়ালে দেয়ালে এক অশরীরি নারীকণ্ঠের আর্তনাদ আছড়ে পড়তে থাকে।…দিনের পর দিন। জগৎনারায়ণ দু'হাতে কান চাপেন। তবু সেই তীব্র তীক্ষ্ণ কান্নার স্বর প্রাসাদের সর্বত্র ধ্বনিত হয়।…পাগল হয়ে যাওয়া জগৎনারয়ণকে একদিন ভাঙা দালানের এক জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।…

কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার পরিচালক প্রযোজক একাধারে সর্বগুণসম্পন্ন অনুভব চলে যেতেই কুলপতি বলে উঠলেন, 'রাবিশ'! এ একখানা গল্প। তাই আবার লাখ লাখ টাকা খরচা করে ছবি করবে?

পরমেশ্বরী কিন্তু বেশ মুগ্ধ। বলেন, কেন? রাবিশ কিসে? কেমন একটা রহস্য রহস্য অলৌকিক অলৌকিক ভাব।

রাখোতো তোমার রহস্য রহস্য। বস্তাপচা প্লট। ও ওর ওই নবেন্দু অপেরায় খাপ খেয়ে যায়। কাগজে বিজ্ঞাপন—দেবে 'ভাঙা দেওয়ালে' কার আর্তনাদ? পরমেশ্বরী রেগে বলে, সাতজন্মে তো সিনেমা থিয়েটার দেখার পাট নেই। রাজনগরে যে দু দুটো হল হলো, কবে গেছ? বুলি রোজ আপসায়, স্কুল-বাড়িতে 'টি, বি,' এসে গেলো আমাদের রাজবাড়িতে এলোনি।' তো তুমি এতো জানলে কোথায় হে?

সবই কি আর চোখ কান দিয়ে দেখতে শুনতে হয়? আমি বলছি খুব কাঁচা গল্প। এই রাঘব রায় তুই কী বলিস?

আমি আবার নতুন কী বলব? খামোকা একটা জলজ্যান্ত মেয়েকে জ্যান্ত গোর দিলো, এটা তেমন সুবিধে লাগল না।

পরমেশ্বরী তর্কের গলায় বলে, এমন গল্প হয় না?

হবে না কেন? কত হয়েছে? তো পচে যাবে না? তুমি এমন প্র্যাকটিক্যাল মেয়ে হয়ে এমন পচামার্কা সেন্টিমেন্টাল গল্পের প্রেমে পড়ে গেলে যে? ওই

অনুত্তমটি সত্যিই অনুত্তম। একদম সস্তামার্কা।...

ঠিক।

রাঘবেন্দ্র বলেন, গল্প শুনে মনটা যেন সেঁতিয়ে গেল। আবার বলছে, বাড়ির মধ্যে শুটিং করতে আসবে।

পরমেশ্বরী বলেন, আমি তো দিন গুণবো।...কী মজা হবে বলতো আমাদের এই ঘর-দালান-বারান্দা-থাম কার্নিশ ক্যামেরার মধ্যে ধরা পড়ে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

কুলপতি বলেন, তার মধ্যে তো আর তুমি আমি থাকবো না। থাকবে ওদের নায়ক-নায়িকা।

তাহলেই বা, পরিবেশটা তো থাকবে। থাকবে আমাদের এই 'চেনা ঘরের' ছবিটবি। ভাবছি আর আহ্লাদ হচ্ছে।

কুলপতি বলেন, বয়েসটা যেন তোমার বুলির কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে মনে হচ্ছে পরমেশ্বরী।

হো। তোমার মনে হওয়ায় আমার বয়েই গেল। আজ থেকে আবার বেহালা বাজাবে। রোজ।

রাঘবেন্দ্র হেসে উঠে বলেন, ওহে মুখুটি সাবধান। এরপর না আবার অন্ধ সেজে বসে বাজাবার হুকুম না হয়।

সে কী আর 'সাজতে' হবে?

বলে হাসতে হাসতে চলে যান পরমেশ্বরী।

ওদের 'মনসা পূজোর' ঘটাপটা ঘটতে থাকে পাঁচদিন ধরে নানা বৈচিত্র্যের পসরা নিয়ে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আবৃত্তি প্রতি-যোগিতা।...এসবের পুরস্কার বিতরণ হবে শেষদিন। 'চাঁদসদাগর' পালার দিন। যাত্রাপালার শুরু একটু রাত করেই হয়। এগুলি হবে সন্ধ্যার মধ্যে। পরমেশ্বরী জানেন ছেলেরা ছাড়বে না তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে, ওই বিতরণী সভায়, প্রধান অতিথি হতে। বার করে রাখলেন একখানা চওড়া জরি-পাড়ের শানা খোলের টাঙাইল শাড়ি, আর চিকনের ব্লাউস সাদাই তো

পরেন। এর বেশী সাজে সাজেন না কখনো।

তাতেও তো অনবদ্য।

মনে হলো একটু যেন দেরী হয়ে যাচ্ছে। এরপর আবার 'পালা' দেখতে রাঘবেন্দ্রর সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে সামনের সারিতে গিয়ে বসতে হবে একবার।···কুলপতি যাবেন অবশ্য। তবে পাশাপাশি বসতে রাজী হন না। তফাৎ রেখে বসেন।

হঠাৎ বলরাম এল হন্তদন্ত হয়ে। দুটো বাতিদান চাইছে ওরা।

পরমেশ্বরী বললেন, কীরে তোদের 'প্রাইজের' কতদূর? শাড়ীটা বদলে নিই? এসেই হয়তো বলবে এক সেকেণ্ডে চলো।

ওরা কিছু বলে যায় নাই?

কই? না তো। কী বলবে?

বলরাম বেজার গলায় বলে, আক্কেলটা দ্যাখো। বলতেছিল, 'চীপ গেস্ট' হতে একখানা এম এল এ পাওয়া গেছে, রানীমাকে আর কষ্ট দেওয়ার দরকার নেই। তা সেটা বলে যাবে তো।

পরমেশ্বরী একটু হাসেন, ভালোই হয়েছে বাবা। বাঁচলাম। যত সব হাঙ্গামা।

বলরাম বলল, আপনাকে বলে গেল—

আরে বাবা তাতে হয়েছে কী? বললাম তো বাঁচলাম।

নাটকের পালার সময় যাবেন কিন্তু বড়বাবু, পিসেবাবু। হিরোইন যা একখানা এসেছে না বড়মা—যেন সদ্য 'বেউলা।'

সদ্য বেহুলা!

দেখা আছে বুঝি তোর? তো তোদের সেই হিরোইন যে বলেছিল আমার সঙ্গে দেখা করবে?

বলরাম ঠোঁট উল্টে বলে, কে জানে। মনমর্জি।

চলে যায় খুঁজেপেতে দুটো পুরনোকালের বাতিদান নিয়ে।

পরমেশ্বরী যদিও বললেন, 'বাঁচলাম' তবু একটু হতাশ হন। ভেবেছিলেন। আগের সময় গেলে, এদের আজকের নায়ক 'চাঁদসদাগর' অনুত্তম ঘোষের সঙ্গে একটু দেখা হতে পারতো। তাহলে জিগ্যেস করে নিতেন, 'কবে

এখানে শুটিং করতে আসবেন ?'

দেখা হলো না।

খানিকক্ষণ সামনে সারিতে 'রানীমা' সেজে বসে 'চাঁদসদাগরের' মুহুর্মুহু হুঙ্কার শুনে ফিরে এলেন রাঘবেন্দ্র আর কুলপতির সঙ্গে।

কিন্তু মনের মধ্যে সেই অনুক্ত প্রশ্নটি পাক খেতেই থাকে, 'কবে আসবে শুটিং করতে।'…পরমেশ্বরীর এই জগৎটি অক্ষয় হয়ে থাকবে ছবির মধ্যে। বেশী দেরী হয়ে গেলে কি পরমেশ্বরীর দেখা হয়ে উঠবে ?…ভিতরটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

এখন চলতে ফিরতে সব সময় পরমেশ্বরী এই ভাঙা প্রাসাদের দিকে তাকান, আর তার মধ্যে বিম্ববতীকে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। কে জানে কে হবে সেই নায়িকা ?

হঠাৎ হঠাৎ যেন কেমন গুলিয়ে যায়, পরমেশ্বরীই কী বিম্ববতী হয়ে যান ?… অথচ এমন অদ্ভুত অসঙ্গত অনুভূতি তো হবার কথা নয়।

অথচ ঠাকুরঘরে চন্দন ঘষতে ঘষতে, কী মালা গাঁথতে গাঁথতে সময়ের জ্ঞান যেন হারিয়ে যায় এক এক সময়। দেখতে পান দক্ষিণের সেই ভাঙা বারান্দায় যাকে নাট্যকার 'অলিন্দ' বলেছে। বিম্ববতী দাঁড়িয়ে আছে দূরাগত একটি বাজনা শোনবার আশায়। সেই বিম্ববতী কেমন দেখতে ? কত বয়েস ? আর রাতে লক্ষ্মীর ঘর থেকে ভিতরের দরজা বন্ধ করে সেই দুদিক চাপা সরু সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে উঠতে মনে হয় যেন এটা একটা সুড়ঙ্গ।

দরজার কাছে ছায়া পড়ল।

কুলপতি।

তোমার আজকাল ভক্তির মাত্রাটা যেন বড়বেশী বেড়ে গেছে পরমেশ্বরী ! ঠাকুরঘরে যুগ কেটে যায়।

পরমেশ্বরী সামলে যান। হেসে ওঠেন, বুড়ো হচ্ছি—পূজো পাঠ বাড়বে না? ফের ওই সব পাকামির কথা।…

সরে আসেন দরজার ধারে।…ওই তো একটু পেতলের পুতুল। তার মধ্যে

এত কী রস পাও বুঝি না বাবা !

পেতল মানে ?

পরমেশ্বরী বকে ওঠেন, অষ্টধাতুর !

না হয় তাই হলো। অষ্টধাতুরই হোক আর অষ্টআশি ধাতুরই হোক। রক্তমাংসের তো নয় ? এতো কিসের আকর্ষণ ?

পরমেশ্বরী মুখ টিপে হেসে বলেন, বোধহয় এনাদের কাহিনীর আকর্ষণ। চিরকালীন প্রেমের কাহিনী। আর বোধহয় 'অবৈধ প্রেমের' বলে :

চমৎকার ! সেটা আবার একটা ভালো কী হলো ?

ওমা। তা নয় !

পরমেশ্বরী বলেন, কাব্যে সাহিত্যে ইতিহাসে তাকিয়ে দেখি 'বৈধ প্রেমের' কাহিনী নিয়ে কে মাতামাতি করেছে ?...যত কিছু রোমান্স তো ওই অবৈধকে ঘিরেই।

কুলপতি অভিনিবেশের সঙ্গে তাকিয়ে দেখে বলে ওঠেন, তোমার আর কোনোদিন বয়েস বাড়ল না।

বাড়লে তোমাদের খুব আহ্লাদ হয় ?

ওরে বাবা। না না।...এই তো বুড়িদের মতন সাত ঘণ্টা ঠাকুর ঘরে বসে থাকা দেখে মেজাজ বিগড়ে যায়।

বড়বাবু কী করছেন ?

কী আর করবেন ? আমার সঙ্গে ঝগড়া করে একা একা 'দুপক্ষ' হয়ে দাবা খেলছেন।

হেসে ওঠেন পরমেশ্বরী, আজকের ঝগড়ার কারণ কী ?

ওর আবার 'কারণ' কী ? ঝগড়া করার ইচ্ছে তাই কারণ।

পরমেশ্বরী একটু কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, আচ্ছা মুখুটি মশাই, ঝগড়াটা প্রথমে বাধায় কে বলো তো ?

কে আবার ? তোমার ওই পরম গুরুটি। বরাবর।

তার মানে তোমার ওপর ভেতরে ভেতরে হিংসে।

কুলপতি হাত পা নেড়ে বলে ওঠেন, আমার ওপর আবার হিংসে কী ?

আমি ওর হিংসের যুগ্যি ? তুই শালা রায়বংশের বংশধর, খোদ মালিক, আর আমি ব্যাটা একটা বৌ-মরা ঘরজামাই। পোজিশন এক হলো ? কার যে কোথায় কী পোজিশন, তা কে বলতে পারে হে ?

ওই হলো গুরু তত্ত্বকথা।...হঠাৎ রাগারাগি আমি কেন সেদিনকে ওদের ফাংশানে 'পালা' দেখতে গিয়ে সামনের সারিতে না বসে পেছনের সারিতে বসেছিলাম। ক'দিনের কথা। আজ ঝালিয়ে তোলা। বলে কিনা ওরা তাই শুধু ওদের সুভ্যেনীরে ওর আর তোমার নাম উল্লেখ করেছে আমার নাম করেনি।...তো বলব না, আমি ব্যাটা কে ? গ্রামের লোক গায়ে ধুলো দেয় না এই ঢের। রাজকন্যে বৌখানি কোন জন্মে মরে ভূত হয়ে বোধহয় অন্যত্র জন্মে ঘর সংসার করছে আর আমি হতভাগ্য এখনো রাজার জামাই থেকে ফুরফুরিয়ে বেড়াচ্ছি। তোর প্রাণে প্রেম আছে, তুই পোজি-শান দিতে পারিস, লোকে কেন দেবে রে ?...তাই বাবু রাগ করে ঘুটি হাণ্ডুল-বাণ্ডুল করে একা দু'পার্টি হয়ে খেলছেন।

পরমেশ্বরী বললেন, তা খেলুক একটু। দু'দিকেই 'চাল' ভাবতে ভাবতে ঘাম ছুটে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে।

কুলপতি হঠাৎ খুব সন্দেহের গলায় স্বর নীচু করে বলেন, আচ্ছা পরমেশ্বরী, একটা কথার সিধে উত্তর দেবে ?

সিধে ? ও বাবা। আমি বুঝি সবসময় বাঁকা উত্তর দিই ?

সবসময়। বলছি কর্তা রাগ করলে তোমার কেন ভয় হয় না ?...হওয়ার তো কথা। · ছেলেবেলায় তো দেখেছি—আমার সেই জাঁহাবাজ ঘুড়িও কাকা রেগে গেলে ভয়ে কাঁটা হয়ে যেতো। আরো দেখেছি অন্যদের।

পরমেশ্বরী হেসে উঠে বলেন, ওদের সব মনের মধ্যে কাঁটাগাছের জঙ্গল তাই।...এই পরমেশ্বরী বামনীর মধ্যে কাঁটার বালাই নেই। বুঝলে ?

কিছুই বুঝলাম না ! তো তুমি একবার ওখানে এলে পারতে। ঝগড়াটা আর কতক্ষণ জীইয়ে রাখা হবে ?

আমি গেলেই মিটবে ?

সে তো নিশ্চয়।...

তবে চল। এই অষ্টধাতুদের ফেলে রেখে রক্তমাংসদের ভজনা করতে যাওয়া যাক।

ঠাকুরঘরে শেকল তুলে দিয়ে চলে আসেন।

এইভাবেই চলে পরমেশ্বরীর দিন।

ভেবেছিলেন, এইভাবেই চালিয়ে চলা যাবে। কিন্তু ভয় ঢুকেছে—হবে না।…এদের এই নীচেরতলায় রান্না ঘর ভাঁড়ার ঘর লক্ষ্মীর ঘরের এলাকায় একা থাকলেই কেমন গা ছমছম করে। মনে হয় হঠাৎ যদি 'বুক কেমন' করে। যদি অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে পড়েন।…আর তখনি মনে হয় বিম্ববতী কী এইভাবে ভাঙা প্রাসাদের খাঁ খাঁ করা ঘরদালান বারান্দায় ঘুরতে ঘুরতে ভয় পেতো?

কেন যে মানুষ এমন যথেচ্ছ বিশাল করে বাড়ি বানায়।…নাকি তখন তাদের প্রয়োজনও থাকে বিশাল।…

কুলপতি নীচে নেমে এসে বললেন, সরকার মশাই। পঞ্জিকাটি একবার দেখুন তো। ঝুলন পূর্ণিমা কবে?

সরকার মশাই বললেন, ঝুলন পূর্ণিমা তো এই সামনের সতেরোই।… বৌমার তো অর্ডার হয়ে গেছে সেদিন ওনার ঠাকুরের বিশেষ ভোগরাগের ব্যবস্থা করতে।…আরো কিছু বুঝি?

ওঃ। ঠাকুরের। ঠিক আছে। উনি ওনার ঠাকুর নিয়ে ভাবুন। আমাদের অন্য চিন্তা।…

একটু ইতস্ততঃ করে আবারও বলে ওঠেন, আচ্ছা সরকার মশাই আপনি তো চিরকাল সব কিছু করে এসেছেন। এ বাড়িতে সেই আগে আগে কত জাঁকজমক হয়েছে, কত লোকজন খেয়েছে। তো আবার তেমন এক-খানা কিছু করলে কেমন হয়?

সরকার মশাই শুকনো মুখে বলেন, বৌমা বলেছেন?

আঃ। আপনার বৌমাটি ছাড়া আর কেউ কিছু বলতে পারে না? বলছি ওই ঝুলন পূর্ণিমার দিনে বাড়িতে যদি পাড়ার কিছু ছেলেপুলেকে ডেকে— মানে বাইরের মানুষের পাত তো অনেকদিন পড়েনি বাড়িতে।

সরকার মশাইয়ের মুখে শুষ্কতা না ঘুচলেও একটু আলোর আভাস ফোটে…।

বুঝেছি—বৌমার ওই ঠাকুরের বিশেষ পুজোর দিন সেই উপলক্ষে একটু ঘটাপটা করে ওনাকে চমকে দিতে চান।

আরে বাবা আপনার বৌমার ঠাকুর নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমাদের। তো শুনুন পাড়ার সব ছেলেপুলে আর ক্লাবের ওই ছেলেপুলেগুলোকে যদি একটু ভোজ দেওয়া যায়?

সরকার মশাই বোধহয় পরমেশ্বরী ব্যাঙ্কের পাশ বইখানার চেহারা স্মরণ করে আস্তে বলেন, তা মন্দ হয় না! তবে আগের সঙ্গে তো তুলনা চলে। এখন একটু 'ভালমন্দর' আইটেম করলেন—পাত পিছু প্রায় তিরিশ চল্লিশ টাকা—

আহা তাই না হয় হলো। পঞ্চাশই হলো। ছেলেপুলে তো আর দুশো পাঁচশো নয়। বড়জোর পঞ্চাশ/ষাট।…তো চলুন তো একবার বড়বাবুর কাছে। এস্টিমেটটা করে ফেলুন। তবে খুব সাবধান আপনার বৌমাটি যেন টের না পান। একটা মজা আছে।

সরকার মশাই মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলে ভাবেন, তোমরা তো বেশ 'মজায়' কাটিয়ে চললে। তবু বড়বাবু এর মধ্যে আছেন এই ভরসা। ইনি তো একটি বদ্ধ পাগল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কুলপতি আবার গলার স্বর নামিয়ে বলেন, আর শুনুন, ওইদিন একটা সানাইয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন?

সানাই!

সরকার হতবুদ্ধির চোখে তাকান।

হ্যাঁ। হ্যাঁ সানাই।…এটি কিন্তু বড়বাবুও আগে যেন টের না পান।

যা আদেশ করবেন।

আহা 'আদেশ' বলছেন কেন? আপনার সঙ্গে একটা গোপন পরামর্শ করছি। ‥আচ্ছা সরকার মশাই আপনার মনে আছে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে এই পূর্ণিমার দিনকে এ বাড়িতে কী দারুণ একখানা উৎসব হয়েছিল। পাঁচদিন ধরে সানাই বেজেছে…সাতদিন ধরে লোকজন খেয়েছে।—আমি

ব্যাটা গরীবের ছেলে দেখেশুনে তাজ্জব।···নিজের সময় কী হয়েছিল না হয়েছিল মনে নেই। ওই বড়বাবুর সময়—আপনারও তো তখন বয়েস কম। মনে পড়ছে না?

'মনে পড়ছে না?' সরকার একটু হাসলেন মনে মনে।

এই যে রায়মশাই। সরকার মশাইকে ধরে আনলাম।

ঘরে এসে ঢুকলেন কুলপতি।

সরকার শিবশম্ভু নিজের সেই দীনহীন ঘরে এসে ফাটা চৌকাতে বসে হাতের মুঠো খুলে একটা জিনিস দেখতে থাকেন।···চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। এতো শাস্তিও তোলা ছিল তাঁর জন্যে?

মুক্তো বসানো সোনার বোতাম একসেট।

একটু ফাঁক পেয়ে কুলপতির চোখের আড়ালে এটি সরকারকে গছিয়েছেন রাঘবেন্দ্র।

আজকাল আর কেউ পরে না সরকার। তাও এই বয়েসে। তাছাড়া তিন চার জোড়া তো রয়েছে।···কত পরব? এটাই ঝেড়ে দিয়ে—

সরকার সর্পদষ্টের মুখ দিয়ে বলেছিলেন, কিন্তু ব্যাঙ্কে তো—

আহা আমি কী বলছি নেই? তো তাহলেই তোমার বৌমা টের পেয়ে যাবেন।···তাড়াতাড়ি মুঠো কর। জামাই মানুষ যেন না দেখতে পায়।

সোনার চেনে গাঁথা মুক্তোবসানো চারটি চৌকো প্যাটার্নের বোতাম।··· ভরি দুয়েকের কম নয়। এঁদের উৎসবের খরচ হয়ে যাবে।···কিন্তু বেচারা শিবশম্ভু আর কত পারবে?···

পরমেশ্বরী। তোমার গহনাগুলো তো পড়ে পড়ে মর্চে ধরে গেছে, একটু পালিশ করিয়ে দিলে হয় না?

পরমেশ্বরী সত্যি রেগে গিয়ে বলেন, আঃ তোমাদের এই খোকামি আর বরদাস্ত হচ্ছে না। বিয়ের কনে সাজতে ফুল দিয়ে সাজা যায় না?···

কুলপতি বলেন, আহা যাবে না কেন? তবে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তোমার সেই মুকুটটা একটু পরো। আহা জীবনে সেই একবারই দেখেছিলাম। কী কারুকার্য। মাঝখানে কল্কা না কী যেন একখানা তার মাঝখানে লাল

টুকটুকে একটা পাথর। যেন ঝলমল করছিল।

বাবাঃ। এতও মনে আছে।··আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওটাই না হয় একবার পরে সং সাজবো।···রায়মশাই! তুমি সাক্ষী এই পাগল ছাগলটা যেন আবার আমায় অষ্টাঙ্গে গহনা পরতে না বলে।···

না তা কেউ বলেনি। দুই পাগলের একজনও নয়, 'পরমেশ্বরী' এই ঝুলন পুর্ণিমার রাতে তুমি বিয়ের কনের মতো সর্বাঙ্গে গহনা পরো।···

তবে হ্যাঁ মুকুটটায় যেন পরমেশ্বরীর নিজেরই একটু মোহ ছিল। সত্যি সারাজীবন 'রানীমা' 'রানীবৌ' শুনে আসছেন, কিন্তু সেই মুকুটটা জীবনে একবারই পরেছিলেন। তাও কেমন দেখিয়েছিল নিজের চক্ষে দেখেওনি। সেকালের বিয়ের কনে, সে কী আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিরীক্ষণ করবে?···

সবটাই জরির সুতোয় বোনা পঞ্চাশ বছর আগের সেই 'লাল বেনারসী'-খানাও বার করে রাখবেন।···এতই যখন সাধ দুই বুড়োর।

রেখেছিলেন সেই কর্পূর কালোজিরে দিয়ে রাখা জরির শাড়িখানা।···

আর নিয়ে এসেছিলেন সেই মুকুট।

এসেছিলেন?

না আনছিলেন?

হ্যাঁ আনছিলেন। রাতে শোবার আগে সেই সরু সিঁড়ি দিয়ে।···সিন্দুকের ডালাটা তুলে ধরবার জন্যে, তা তখন সরকার মশাইয়ের শরণাপন্ন হওয়া যায় না? রাতে সব কাজ মিটে যাবার পর তো ওই লক্ষ্মার ঘরের দরজার ভিতর থেকে খিল পড়ে।

তুলতে পারছিলেন না।

মনে হচ্ছিল ডালাটা কী হঠাৎ পাথরের হয়ে গেছে। তবু আপ্রাণ চেষ্টায় তুললেন। শূন্য সিন্দুকের গহ্বর থেকে তুলে নিলেন সেই মখমলের কেসে মোড়া মুকুটটা। ঘামে ভিজে যাচ্ছে সর্ব শরীর।···হাতের ঘামে মখমলের কেস এর বেগুনি রঙের একটু ছাপ বোধহয় হাতের তালুকে, কালচে করে দিচ্ছিল।···কোনোমতে উঠে যেতে পারলে হয়।···

কিন্তু সিঁড়িগুলো কি অফুরন্ত ?

এটা কী তবে সিঁড়ি নয় ? সুড়ঙ্গ ? লম্বা অন্ধকার সুড়ঙ্গ ? কেউ তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে পাথর চাপিয়ে ?···

তাই বাতাস নেই। দম বন্ধ হয়ে আসছে।···

আমি কী তাহলে বিম্ববতী ?···হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই তো কোথায় যেন বেহালা বাজছে।

রাঘবেন্দ্র শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কুলপতির ঘরে ওঠবার সিঁড়ির সামনে দাঁড়ালেন। রাঘবেন্দ্র।···

বাজনাটা নিয়ে বসেছেন কুলপতি।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে অধীর গলায় বলে উঠলেন আচ্ছা কুলপতি! পরমেশ্বরীর এতো কী কাজ ? এখনো কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে বলো তো? দোতলায় আসার নাম নেই।

অ্যাঁ। এখনো ওপরে আসেনি ? আর আমি ভাবছি ঘুমিয়ে পড়ল হয়তো। তাই—

পরমেশ্বরী বলেছিল, তুমি বরং রাত্তিরেই তোমার ওই বাজনাটা নিয়ে বোসো মুখুটি মশাই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনবো। ওই বেড়ালছানার কান্নাটি শুনতে শুনতে বেশ আমেজে ঘুম এসে যায়।

দালানের সামনের চওড়া সিঁড়ির মস্ত দরজাটা অনেকক্ষণ আগে বন্ধ হয়ে গেছে। কাজটা বলরামের।

পরমেশ্বরী হয়তো তখনো নীচেরতলায় থাকেন। কিছু করেন। সবশেষে সেই লক্ষ্মীর ঘরের মধ্যেকার দরজায় খিল লাগিয়ে সরু সিঁড়ি দিয়ে একদম শোবার ঘরে এসে পড়েন তা এঁদের জানা।···

কুলপতি বললেন, এতক্ষণ খোঁজ করিসনি ?

না মানে একটু তন্দ্রা মতন এসে গেছল চলে এলেন শোবার ঘরে। নেমে এলেন সেই সরু সিঁড়ি দিয়ে।

পরমেশ্বরীর দেহটা মেদবিহীন হাল্কা তিরতিরে তবু তুলে আনতে কষ্ট হলো বৈকি। সরু সিঁড়ি, দুদিকে চাপা দেওয়াল। আর নিজেদের মধ্যে কী বল-

শক্তি তখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল ?

তুলে এনে পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে রাঘবেন্দ্র পাথুরে গলায় বললেন, কুলপতি !

পরমেশ্বরী আমাদের সঙ্গে এতোবড়ো বিশ্বাসঘাতকতা করল ?

কুলপতি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, না। না। এ হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না। আমি যাচ্ছি !

কোথায় যাচ্ছ ?

কোথায় ? কোথায় মানে ? ডাক্তার চাই না ? ডাক্তার।

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সেই সিঁড়ি ধরেই। লক্ষ্মীর ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে চীৎকার করে উঠল বলরাম ! বলরাম ! গেট খুলে দে।···

কিন্তু পরমেশ্বরী আর চোখ খুললেন না ?

না, অতখানি বিশ্বাসঘাতকতা পরমেশ্বরী অথবা পরমেশ্বর করে উঠতে পারেন নি।

ডাক্তার আনতে পারা গেল।

পরিচিত প্রবীণ ডাক্তার।

বললেন, এখনি ই. সি. জি. করা দরকার। কিন্তু নড়ানোও তো শক্ত।···দেখুন যদি বাড়িতেই ব্যবস্থা করতে পারেন। সামান্য নড়ানোর অবস্থা হলে হসপিটালে—রিম্যুভ করা ছাড়া—তবে হাসপাতালের যা অবস্থা।···হয়তো দেখা যাবে অক্সিজেন সিলিণ্ডারই নেই। সব জানলা দরজা খুলে রাখুন। দেখি ইনজেকশনটার কী রি-অ্যাকশন হয়। পাখা চালিয়ে যান।

পাখা চালিয়ে চলেছে বুলি বলরাম আর সরকার মশাই। পালঙ্কের মাথার কাছে ভিড়।

ভিড় করা উচিত নয়।

কিন্তু উচিত অনুচিতের ধার কে ধারবে ?

কে নড়বে এখান থেকে ?

ভোর সকালে চোখ মেললেন পরমেশ্বরী।

সমস্ত আকাশ জুড়ে সূর্যোদয়।

ডাক্তার বিদায় নিলেন।

বললেন, আপাততঃ ঈশ্বর আমার মুখ রাখলেন। ছেলেবেলায় এ বাড়িতে কত এসেছি। কত খেলেছি। খেয়েছি। বহুদিন পরে এ বাড়িতে পদার্পণ। সকলেই তো বেশ ভালোই ছিলেন। তবে ওঁর মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে অনেকদিন—যাই হোক ই. সি. জি.টার ব্যবস্থা করা এক্ষুনি দরকার।

পরমেশ্বরীর মুখের রং পাণ্ডাস, পরমেশ্বরীর নিঃশ্বাস অ-স্বচ্ছন্দ, পরমেশ্বরীর মুখে দুষ্টু হাসি···হাসপাতালে যেতে আমার দায় পড়েছে ' রাজবাড়ির পালঙ্ক ছেড়ে হাসপাতালের নিঘিন্নে খাটে শুয়ে মরতে যাব?

মরতে তোমায় দিচ্ছে কে?

দেখি কার কী ক্ষমতা!

বাঃ আমাদের সঙ্গে কোঅপারেশন করতে হবে।

কবে আবার তোমাদের সঙ্গে নন কোঅপারেশন করেছি হে?

ডাক্তার বেশী কথা বলতে বারণ করেছে।

করেছে তো মাথা কিনেছে। গ্যারান্টি দিয়ে গেছে কী 'বোবা' হয়েথাকলে নির্যাস বাঁচিয়ে তুলবে?

বাঃ তা বলে সাবধান হবে না।

পরমেশ্বরীর বিবর্ণ মুখেও হাসির রেখা, সাবধান হয়ে হয়েই মরলাম গো চিরদিন। আঁচল ঢেকে জ্বলন্ত পিদ্দিপ নিয়ে বেড়িয়েছি, তলওয়ারের আগার ওপর দিয়ে হেঁটেছি!

তোমার সব কথা আমার মাথায় ঢোকে না পরমেশ্বরী।

ঢুকবে কী করে? মাথার মধ্যে তো গোবর। তো তোমাদের উৎসবটা মাঠে মেরে দিলাম, এই যা দুঃখ লাগছে।

কুলপতি বললেন, পূর্ণিমার তো এখনো সাতদিন দেরী। এরমধ্যে তোমায় খাড়া করে তোলা হবে না ভেবেছ?

তোলো।

হাসছো যে? ভেবেছো কী? কলকাতার দুজন হার্ট স্পেশালিস্টকে কল দেওয়া হয়েছে—

এমা! মাত্র দুজন? দু' ডজন নয়?

ঠাট্টার কী আছে ? একজন সব সময় ঠিক না ধরতেও পারে।

মুখুটি মশাই! টুনটুনির অসুখের সময় তার রাজামশাই বাবা তো বাড়িতে ডাক্তার-বদ্যির হাট বসিয়েছিলেন।

তখন চিকিৎসাশাস্ত্রের এতো উন্নতি হয়নি। তাছাড়া তার ছিল অন্য ব্যাপার। ব্যাপার বলে কিছু নেই। 'রাখে কেষ্ট আর মারে কেষ্ট'। সেদিনই তো মরে যেতে পারতাম। আমাদের বুড়ো মহেশ ডাক্তারের একটি 'ইনজেক-শানই তো'—

সেটা কোনো কথা নয়। যে করেই হোক তোমায় সারিয়ে না তুলে ছাড়া হবে না।

ছেড়ো না।

হেসে ফেললেন পরমেশ্বরী, বাঁচতে খুব ইচ্ছে করছে গো! যদি মরে যেতে হয় বলে নিজের শোকেই নিজের কান্না পাচ্ছে।

রাঘবেন্দ্র স্নান করতে গিয়েছিলেন। এলেন।

বলে উঠলেন, এই সেরেছে। আবার এতো কথা কইছো ?

দেখো বাপু কথা কওয়াটি বারণ করবে না। কথা না কইতে পেলে হাঁপিয়েই মরে যাব।

তারপরই বলে উঠলেন কত কথা কইতে বাকি রয়ে গেছে বলতে হবে না ? অতএব কথা চলে।

হ্যাঁরে বুলি, আমি তো বিছানায় পড়ে। এই বুড়ো দুটোকে ঠাকুমা কী খেতে দেয় ? মনিষ্যির মতো ?

বড়মা আবার ভালো করে কথা বলছে দেখে বুলির প্রাণ জুড়িয়ে যায়।...

অতএব ঝঙ্কার, আহা! সবটি ঠাকমার হাতে ফেলে দিয়ে যেন নিশ্চিন্তি থাকে বুলি। তুমি যেমনটি করতে তেমনটি চেষ্টা করি।

করিস ?

পরমেশ্বরী একটু চোখ বোঝেন, তারপর বলেন, তাহলে আর মরতে ভয় নেই আমার। তো বুড়ো দুটো যতদিন থাকবে দেখবি তো ? এখানেই থাকবি ?

বুলি বলে ওঠে, তাড়িয়ে না দিলে বুলি কোথাও যাবে না···তো মরণ মর কোরোনা তো বাপু।

পরমেশ্বরী হাসেন, না হয় জীবন জীবনই করব তো বলরামটার সঙ্গে বিয়ে তোর বাপ রাজী হয়েছে ?

বুলি বলে, কেঁদেকেটে পায়ে ধরে রাজী করিয়ে ছাড়বো নচেৎ গলায় দি দেবার ভয় দেখাবো।

বা বা ! ভারী চৌকস বুদ্ধি তো !

বলরাম, তোদের সেই 'সিনেমাবাবু' যে এখানে এসে শুটিং করবে, তে এলো কই ?

সে কী আর এক্ষুণি হবে গো বড়মা। কত কাঠ খড় পোড়াতে হবে ে জানে। হয়তো ছ'মাসের ধাক্কা।

ধুস। তবে আর তোদের বড়মার দেখা হলো না।

কী বলেন বড়মা। আপনিতো সেরে উঠছেন।

তোর কী আমাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে ?

হচ্ছে তো।

তাহলে ভালো।

আবার চোখ বোজেন। এটাই ক্লান্তির নিদর্শন।

ভীড় বাড়াতে বারণ, তবু সারাদিন বাড়িতে ভীড়। কে জানতো পরমেশ্বরীর ভক্ত সংখ্যা এমন অগুনতি ! অসুখ শুনে সবাই একবার করে দেখতে আসতে চায়।

ডাক্তার কথা বলতে নিষেধ করেছে !

কথা বলব না শুধু একটুক দেখে যাব।

রাঘবেন্দ্র বলেন, মনে ভাবতাম, তোমার যতটুকু আমি দেখতে পাই তত-টুকু তুমি। তার বাইরেও যে তুমি এতখানি, তা কোনোদিন টের পাই নি।

পরমেশ্বরী হেসে ফেলেছেন, এই সেরেছে। তুমিও যে কবি কবি কথা কইছো গো।

দিনের বেলা বাইরের লোক। দিনের বেলা সর্বদা কুলপতির উপস্থিতি। রাত্রিটুকুই নিভৃতি।

পরমেশ্বরী বলেন, কেবলই বলো কথা বোলো না, কথা বোলো না। আমি ভাবি ঠাকুরের কত দয়া যে কথা বলবার জন্যে একটুখানি সময় দিলেন। অনেক কথা যে বলতে ইচ্ছে।

বলো। আস্তে আস্তে থেমে থেমে।

অচ্ছা তোমার মনে হয় না সারা জীবনে কটাই বা কথা কয়েছি তোমার সঙ্গে ?

আগে কখনো ভাবি নি। এখন সর্বদাই ভাবছি।

পরমেশ্বরী স্বামীর হাতের মধ্যে নিজের ঘাম ঘাম ঠাণ্ডা একখানা হাত রাখেন, তোমার কখনো মনে হয় না সারাজীবন আমি তোমায় ঠকিয়েছি ?

ছিঃ। কী যে বলো।

ঝুঁকে পড়ে পরমেশ্বীরর কপালের ওপর একটু গাল ঠেকালেন।

কী জানি নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন করে চলেছি জীবনভোর। একটা সমুদ্রর মতো অগাধ ভালবাসা! কী করে তাকে অবহেলা করি বলো তো ?

তোমার কী মনে হয়েছে, আমিই সেটা চেয়েছি ?

চাও নি, সেটাই তো সারাজীবনের সমস্যা গো।

…তুমি যদি অন্য আর সকলের মতো হতে—

রাঘবেন্দ্র পরমেশ্বরীর হাতটা তুলে নিজের গালে চেপে গাঢ় গভীর গলায় বলেন, তুমিই কী অন্য আর সকলের মতো ?

পরমেশ্বরী একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন।

এখন আর কথা বোলো না পরমেশ্বরী।

আহা। কতই যেন সময় পাবো।…রাগ করো না একটা কথা বলি—আমার অভাব তুমি বরং কাটিয়ে উঠতে পারবে, তোমার মনের জোর আছে।… হাসলেন একটু, না থাকলে কী আর বেহায়া পরিবারের এই দৌরাত্মি সইতে পারত ? আছে বলেই তো—কিন্তু ওই অবোধ ছেলেমানুষতুল্য

লোকটা সহজে সইতে পারবে না। তুমি ওকে দেখো।

পরমেশ্বরী, কুলপতি আমারও কম ভালবাসার জিনিস নয়।

পরমেশ্বরী পরম নিশ্চিন্তে স্বামীর হাতটা কপালে চেপে আস্তে বলেন, তবু চলে যেতে হবে।

কুলপতি সকালে বলেন, ওহে রায়মশাই, বলি পরমেশ্বরীর যে বেশী কথা কওয়া বারণ তা জানো না! রাতদুপুর পর্যন্ত নতুন বিয়ের বরকনের মতো 'গুজ গুজ।' মানেটা কী?

পরমেশ্বরী মৃদু হাসেন, অতখানি দূরে তোমার ঘর পর্যন্ত পৌঁছয়? অঁ্যা। তাহলে বলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কোঁদল করি।

ঘর পর্যন্ত পৌঁছয় তা তো বলা হয় নি। তোমাদের দৌড় দেখবার জন্যে এই দালানেই ঘোরাঘুরি করতে হয়।

ও। তাই বলো। আড়ি পাতো! তা' নতুন বিয়ের বরকনেই তো বোধ হয় সাজাচ্ছিলে।

সাজাচ্ছিলাম। সব তো গুবলেট করে দিলে। পরশু তো পূর্ণিমা।

তা' কালকের মধ্যে সেরে উঠতে পারি।

তামাসা কোরো না। ভালো লাগে না।···তবে বেশি রাত পর্যন্ত গাল-গল্পটা কমাও।

তোমার বুঝি হিংসে হয়?

কেন? আমার হিংসে হতে যাবে কেন? তোমরা কর্তা গিন্নী প্রেমালাপ করবে, সেটা তো তোমাদের রাইট। তবে যা বলা হচ্ছে ভালোর জন্যেই। তুই শালা কোথায় ওকে থামাবি, তা নয় নিজেই বাড়াস।

ভরা সন্ধেয় বুলি এসে দাঁড়ায় বিছানার ধারে ভিজে চুল ভিজে কাপড়। ···হাতে একটু ছোট্ট মাটির ঘট।···

এ কী রে! এ সময় তুই ভিজে শাড়ি? ভিজে মাথা। সে কথা পরে হবে। এখন এই চন্নামেত্তরটুকু খেয়ে নাও তো।

কোথাকার 'চন্নামেত্তর রে?

অত খোঁজে কাজ কী তোমার বলো তো? খেয়ে নাও তো আগে। হ্যাঁ, ভালো করে হাঁ করো। বুড়ো শিবতলায় গেছলাম। সোমবার তো। বাবার 'বার।'

বুড়ো শিবতলা? সে যে অনেক দূর রে?

দূর তো কী? কেউ একটা মাদুলি-কবচ দেবে বললে বিলেতেই চলে যেতে পারি।

আচ্ছা বুলি। তোরা সবাই আমাকে এতো ভালবাসিস কেন রে?

শোন কথা। তোমায় ভালবাসবে না তো কী বেন্দাবনের পিসিটাকে ভালবাসতে যাবে?···দেখো কাল সেরে উঠবে। বড় জাগ্রত ঠাকুর। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব রোগ ব্যামো ভালো হয়ে যায়।···জানো কতজনা যে এসেছে। একজনা না—

ওরে বাবা 'একজনার' কথা ছেড়ে দে। শীগগির কাপড় বদলা। নিজেই রোগে পড়বি।

পড়ি তো পড়বো। তুমি তো ভালো হয়ে উঠবে।

উঠবই একথা তোকে কে বলল?

ওমা বিশ্বসুদ্ধু লোকে জানে না? সোমবার দিন যে বুড়ো শিবতলার চন্নামেত্তর 'ধ্বন্বন্তরী।'···

দেখ বাবা। যদি ভালো না হই, বুড়ো শিবকে গাল পাড়বি তো?

ভালো হবেই। কত কত লোক ভালো হচ্ছে।

পরমেশ্বরী একটু হেসে বলেন, একা গেছলি?

একা যাওয়া আমার সাধ্যি? পথই চিনি না।

কে গেল সঙ্গে? বলরাম?

ছাড়া আর কার দায়ে পড়েছে না খেয়ে-দেয়ে আমার সঙ্গে পাঁচ মাইল পথ হাঁটতে?

বটে।

পরমেশ্বরী মনে মনে একটু হাসলেন, এ দায় বড় দায়।

হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছে বুঝি সামলে গেল। আবার বুক ধড়ফড়িয়ে উ
মুখ চোখ বসে যায়, ঝিমিয়ে আছে চেতনা।

রাঘবেন্দ্র ওষুধ নিয়ে খাওয়াতে এলেন।

পরমেশ্বরী বললেন, মুখুটিমশাইকে যেন সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে।

পাবে কোথা থেকে? কলকাতায় গেছে নতুন ডাক্তারের চেষ্টায়।…

আচ্ছা লোকটা কী পাগল-টাগল হয়ে যাবে?

নতুন করে আর কী হবে?

তা বটে।

হাসলেন, তা তুমি একটু বারণ করবে তো?

বারণ করলে শুনবে? আসলে ও মোটেই স্থির থাকতে পারছে না ছট-ফটিয়ে বেড়াচ্ছে।

কুলপতি ফেরেন ডাক্তার নিয়ে।

তিনি যা বলবার বলে চলে যান। ইমিডিয়েটলি হাসপাতালে নেওয়া দরকার।…নার্স ছাড়া কেউ যেন ঘরে না ঢোকে। কোনো রকম ডিসটার্ব চলবে না।

ডাক্তার চলে গেলে কুলপতি বলেন, শুনলে?

শুনলাম। একথা জিগ্যেস করেছ কাঁটায় কাঁটায় ওর কথামত চললে সারিয়ে তোলার গ্যারান্টি।…

আঃ। এ তো আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে কবে কোন্ ডাক্তার যে গ্যারান্টি দেয়?

তবে আর কী হলো?…যে ক'টা দিন বাঁচছি, 'মরে' বেঁচে থাকবো ধ্যুস!…

তবে আর কী যা ইচ্ছে কর।…মনে হচ্ছে সারাদিন শালা তোর সঙ্গে আড্ডা মেরেছে। তাই মুখ চোখ চুপসে গেছে।…বুড়ো ধাড়ি, কো যদি জ্ঞানগম্যি আছে।…তাই কি রাতেই একটু চুপচাপ থাকে?…

: তুমি এসে তাহলে দরজা পাহারা দিও।

ামার বয়ে গেছে। আমি কে ? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী ?
লার বৌ। এই তো।·· হুঁঃ।

ন্তু তবু কী লজ্জা পেয়ে সাবধান হয় পরমেশ্বরী ?

ঘবেন্দ্রর হাতটা চেপে ধরে বলে, না বাপু বলতে দাও। চমকে উঠো না
কটা কথা বলি—যদি হঠাৎ কোনোদিন তোমাদের লক্ষ্মীর ঘরের সিন্দুকটা
ালো, আর খুলে দেখো ফাঁকা ফর্সা। কী করবে ?

ঘবেন্দ্র চমকালেন না। বললেন কী আর করব ? জানাই তো ছিল ওই
কম একটা ব্যাপারই হবে।

না ছিল ? কে বলেছে ? অ্যাঁ।

াবে আবার কে ? সাধারণ বোধবুদ্ধি বলে একটা জিনিস আছে তো ?···

মি বুঝতে পারতে ! তবু তুমি আমায়—

ঃ তোমায় আবার কী বলব ? তোমার নিজের জিনিস যা খুশী করতে
রো। · যাতে তৃপ্তি যাতে আনন্দ।

ন্তু সবই কি আমার নিজের জিনিস ? তুমি কী জানো তলে তলে তোমাদের
ই রাজবাড়ির সব ঐশ্বর্য নিঃশেষ করে রেখেছি।

ই তোমার পরমেশ্বরী। যদি মালিকই বলো, জিনিসগুলোর খানিকটা
তোমারই।···

সবই তুমি জানতে ?

না মানে অনুমান।

বুও তুমি আমায়—

র বন্ধ হয়ে আসে পরমেশ্বরীর। রোগিনী, তবু রাঘবেন্দ্র তার মুখটা তুলে
র আবেগের গলায় বলেন, তবু কেন তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দিই নি।

েমন ?

রমেশ্বরী বললেন, আঃ। এইবার নিশ্চিন্দি হয়ে মরতে পারব। বড় ভয়
ল যদি হঠাৎ মরে যাই, বলবার সময় না পাই—হয়তো আর কারো

ওপর সন্দেহ পড়বে।···

মুখটা আলো আলো একটা হাসিতে ভরে ওঠে। বলেন, নিজেকে কী চালাকই ভেবে এসেছি।···কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। তুমিই আমায় বড্ড ঠকালে গো।···

পূর্ণিমার পরদিন ভোরবেলা মারা গেলেন পরমেশ্বরী। শেষ পর্যন্ত জ্ঞান ছিল টনটনে। একবার বলে উঠেছিলেন, দূরছাই শুটিংটা আর হলো না। কোন্ একখানা বিম্ববতী এসে এই ভাঙা রাজবাড়িতে ঘুরে ঘুরে ছবি তোলাবে—

—আর কেউ কথা বলতে বারণ করছিল না। কেউ এ ঘর ছেড়ে চলেও যায় নি। মাঝরাতে কুলপতির দিকে তাকিয়ে ইশারায় বললেন কাছে এসে বসতে।···রাঘবেন্দ্রকে বললেন, ওই ড্রেসিং আয়নার ড্রয়ারটা খোলো তো।···

রাঘবেন্দ্র উঠে গিয়ে খুললেন।

ওর মধ্যে ছোট্ট একটা কৌটো আছে—

নিয়ে এলেন রাঘবেন্দ্র।

কৌটোর মধ্যে সেই পান্নার আংটিটা।··

বললেন, মুখুটিমশাইয়ের আঙুলে বড় মানিয়েছিল গো—কুলপতির হাতটা টেনে একটা আঙুলে পরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, হলো না। হাত কাঁপছে।

কুলপতি লাল লাল মুখে ধরা গলায় বললেন, শেষ বেলাতেও তোমার রসিকতা পরমেশ্বরী।

রসিকতা কি হে? ভালবাসা। এই আংটিটা দেখলেই আমার কথা মনে পড়বে।

ত, নইলে মনে পড়বে না? কেন? কেন তুমি আমায় এমন জব্দ করবে? কী করেছি আমি তোমার?

কী কর নি তাই বলো?···মরণকালেও মুখে একটু হাসির আভা? রাঘবেন্দ্রকে বললেন, পরিয়ে দাও তো।

না না।

কুলপতি হাত টেনে নিচ্ছিলেন, পরমেশ্বরী বললেন, রেগে যাব বলছি।...

তারপর একটু ঝিমিয়ে বললেন, দেখলে তো নিজের বরটিকে কেমন বাজি জিতিয়ে দিলাম। ও বলেছিল না, আংটিটা বাড়ির জামাইয়ের প্রাপ্য। আঃ, এতো ঘুম পাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না গো। তবু—

শেষটার কথা জড়িয়ে গেল।

ঘুমিয়ে পড়লেন।...মৃদু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বুকটা একটু ওঠাপড়া করেছিল শেষ রাত্রির দিকে থেমে গেল।

সরকার মশাই সারারাত বাইরের দালানে বসেছিলেন। সকালে ঘরের দরজায় এসে বললেন, বড়বাবু। এবার আমায় ছুটি দিন।

ছুটি দেবো!

রাঘবেন্দ্র হৃতসর্বস্বের গলায় বললেন, তোমায় ছুটি দেবো? তবে আমরা কার কাছে থাকবো সরকার?

সরকার মাথা হেঁট করে বললেন, এখানে আর টিঁকতে পারবো না।

কুলপতি চেঁচিয়ে উঠে বললেন, আর আমরা খুব টিঁকতে পারব। তাই না? না যাওয়া হবে না। কারুর যাওয়া হবে না।...ছুটি নিতে ইচ্ছে হয় তো ওই যিনি শুয়ে আছেন তাঁর কাছে নাও গে।...উনি আমায় বলে গেছেন, সরকার মশাই রইলেন।...

বেচারী সরকার মশাই। সত্যিই সেই মৃতার মুখের দিকে চোখ ফেলে মনে মনে বললেন, আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছিলাম যে এতো শাস্তি দিয়ে গেলে।...ভেবেছিলাম আর একটা বেলাও এখানে নয়।

রাঘবেন্দ্র বললেন, এখন তো সব ব্যবস্থাই তোমার উপর সরকার।

সরকার মনে মনে ক্ষোভে ফেটে পড়লেও ঘাড় হেঁট করে চলে গেলেন দাহ কার্যের কর্মভার মাথায় নিয়ে।...এই আমার নিয়তি। না না আমি আর থাকতে পারব না। আমি চলে যাব।

রাজনগর রাজবাটির দেউড়ির একটা দিক ধ্বসে পড়ে গেছে। তবু সেই ভাঙা গেটকে লোহার ছেকল বেঁধে যোসো করে তালা লাগিয়ে রাখেন

সরকার মশাই সাহায্য করে হরিপদ।

আজ সেই দেউড়ি দু' হাট।

বহুকাল পরে এই দেউড়িতে এতো ভীড়।

গ্রাম ভেঙে পড়ছে রাজবাড়ির শেষ মহারানীকে শেষ দেখবার জন্যে। ফুল নিয়ে আসছে অনেকে। ফুলে ঢেকে গেছে সেই পাতলা হাল্কা শরীরটি।

রাঘবেন্দ্র মনে মনে বললেন, খুব একখানা নাম রেখেছিল বটে তোমার বাপ-মা পরমেশ্বরী।...আমি যখন মরব—জানি না মরব কিনা, যদি মরি যখন মরবো হয়তো শেষ দেখা দেখতে আমার জন্যে একটা শেয়াল কুকুরও উঁকি দেবে না।...কী জানি কোনোদিন ছাত চাপা পড়েই মরব কিনা।...

কুলপতি ওই ফুলে ঢাকা দেহটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে রাগের গলায় বলে চলেছেন, কী? এবার কী হবে? এবার? শুয়ে সাজাও আমাদের লম্বা কোঁচা গিলে করা পাঞ্জাবি পরিয়ে? পুতুল নাচ নাচাও দুটো লোককে।...

ছি ছি। এই বিশ্বাসঘাতকতা করলে তুমি আমাদের সঙ্গে?

আর কোনো কথার উত্তর দিয়ে উঠবেন না চিরদিনের মুখরা প্রখরা পরমেশ্বরী। কথার বর্ম দিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার দায় থেকে মুক্তি হয়ে গেছে তাঁর। শেষ হয়ে গেছে যুদ্ধ। চলেছে বিজয়া দশমীর দিনের দেবী দুর্গার মতোই! মহিমময়ী মূর্তিতে।

দেবতার মুক্তি

কিছুক্ষণ আগেও আকাশ রোদে ফাটছিল। হঠাৎ যে কোনো ফাঁকে সেই আকাশ জুড়ে এমন সমারোহ করে মেঘ জমে উঠল যাতে বেলা পাঁচটাতেই মনে হচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে গেল নাকি।

ছুটির দুপুরে একটু বেলা গড়িয়ে খাওয়াদাওয়া হয়েছে, আর সেই আমেজেই বাড়ির সকলেই একটু গড়িয়ে নিতে যে যার জায়গায় ঢুকে পড়েছিল।

মনোজিৎ বললেন, মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে। এইবেলা জানলা-টানলাগুলো—

এখন সকলেই যে যার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে চায়ের টেবিলের ধারে বসে পড়েছে। অনন্যা গরম জলের কেটলিটা আঁচলের কোণে চেপে নিয়ে চলে এলো। টেবিলে রাখা চা-দানী আর চায়ের কৌটোর পাশে রাখল।

মনোজিৎ বললেন, না! তোমায় আর বলে পারা গেল না বৌমা, ওভাবে আঁচলে ধরে গরম জল আনাটা ঠিক নয়। আলাদা একটা তোয়ালে-টোয়ালে দিয়ে—

ততক্ষণে অনন্যার চা ভেজানো হয়ে গেছে। চা-দানাতে 'টি-কোজিটা' চাপা দিতে দিতে সামান্য হেসে বলল, শক্ত করে ধরি বাবা!

মনোজিৎ কী ভেবে কে জানে মনে মনে উচ্চারণ করলেন, শক্ত করে!

তারপর বললেন, তা সব সময়ই তুমি এত সব করো কেন? বিকেলের চা-টা তো পরেশ বানাতে পারে!

সুনন্দা ঘুমভাঙা চোখে মুখে জল দিয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে চলে এসে বললেন, পরেশ? তার তো এখনো অনেক রাত। না ডাকলে উঠবে? না ওঠে, ডেকেই তুলবে। কা আশ্চর্য! বুবু, তুইও তো একটু ডেকে দিলে পারিস।

আমার দায় পড়েছে। বাবু আরামসে ঘুমোবেন, আর লোকে তাকে—

কথাটা শেষ না হতেই দারুণভাবে কড়কড়িয়ে মেঘ ডেকে উঠল। আর ঠিক সেই সময় সদর দরজায় কলিংবেলটা বেজে উঠল!

এই রে এসময় আবার কে এখন—

কে আবার ?

বুবু বলল, মার আদরিণী পারুলবালা! তাঁরও বোধহয় এতক্ষণে ঘুম ভাঙল।

অনন্যা চা ছেঁকে এক এক করে কাপ এগিয়ে দিচ্ছিল সকলের দিকে।

সুনন্দা নিজেরটা টেনে নিয়ে রাগের গলায় বললেন, সব সময় তোরা এভাবে কথা বলিস কেন বল তো ? আদরিণী মানে ?

আদরিণী মানে আদরিণী। ওর আর আলাদা কোনো মানে নেই। যত ইচ্ছে বেলা করে আসবেন, একটি কথা বলবে না তুমি।

বলি না সাধে? চার-পাঁচ বাড়ি কাজ করা লোক! ওদের অহঙ্কারটি কত! বলতে গেলেই তক্ষুনি মুখের ওপর বলবে, 'না পোষায় ছেড়ে দিন!'

ওই ভয়েই কাঁটা!

বলে বুবু নিজের পেয়ালাটা তুলে চুমুক দিলো!

অনন্যা একটা প্লেটে কিছু নোনতা বিস্কিট রেখে টেবিলের মাঝখানে রাখল যে যা খায়। সকলেই বেলায় ভাত খেয়েছে, চায়ের সঙ্গে বিশেষ কিছু খাবে না!

বেলটা আবার বেজে উঠল।

কী মুশকিল! পরেশটার এখনো ঘুম ভাঙল না ? ওই মেঘ ডাকার শব্দ বেল বাজার শব্দ!

মনোজিৎ চায়ে চুমুক দিতে দিতে একটু চঞ্চল হয়ে যেন চেয়ার ছেড়ে উঠি উঠি করলেন।

এসময় পল্টন ঘর থেকে বেরিয়ে এল চুলে হাত বোলাতে বোলাতে। বাবার দিকে তাকিয়ে বলল দরজাটা খুলতে তুমিই যাচ্ছ বুঝি ?

না, মানে পরেশটাকে ডেকে দিতে—

মনোজিতের এই খাপছাড়া কথার মাঝখানেই পরেশকে উঠে আসতে দে গেল পায়জামার দড়ি লটপটাতে পটাতে। মুখটা কেমন ভয় ভয়। সমবেতর দিকে তাকিয়ে ও বলে উঠল, মাসিমা! একটা বাবু! বল সোলজার আছে ?

সোলজার আছে!

মুহূর্তে সমস্ত পরিবেশটার ওপর যেন একটা বরফের চাই এসে পড়ল!

সবাই সবাইয়ের মুখের দিকে তাকাল! অথচ কেউ কারুর মুখ দেখতে পেল না!

পরেশ কত দিন আছে?

খুব বেশীদিন নয়। অন্ততঃ সেই ঘটনার আগে নয়। পরেশ এই বরফের হিমমাত্রাটা অনুভব করতে পারল না! সন্তর্পণে বলল, সোলজার থাকতে যাবে কেন?

আর সেই সময় সুনন্দা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কী রকম বাবু? কী রকম দেখতে?

মনোজিৎও উঠে দাঁড়িয়েছেন।

কেমন যেন কাঁপা গলায় বললেন, নিজের নাম বলেছে?

সকলের চা-ই অসমাপ্ত। তবু সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

অনন্যা তো দাঁড়িয়েই ছিল। সকলকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজের চা-টায় চামচ দিয়ে নেড়ে চিনি গোলাচ্ছিল। হাতটা থেমে গেল অনন্যার। মুখটা সাদা হয়ে গেল।

অথবা সকলের মুখই সাদা হয়ে গিয়েছিল।

পল্টন বলল, আমি দেখছি!

সিঁড়ির দিকে এগোল।

সুনন্দা ভাঙা ভাঙা তীব্র গলায় বলে উঠলেন, তুই কী দেখবি? তুই কী বুঝবি? তুই—

এগিয়ে গেলেন তার সঙ্গে সঙ্গে!

বুবুও অ্যাকশন নিতে গেল।

আর ঠিক এই সময় ভীষণভাবে একটা বাজের শব্দ হলো। তার সঙ্গে চওড়া একটা আগুনের ফিতে আকাশের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত একটা আঁকা-বাঁকা রেখা টেনে মিলিয়ে গেল।

একটা জানলার কপাট আছড়াল।

মনোজিৎ আবার চেয়ারে বসে পড়ে কাতর গলায় বললেন, পরেশ জানলা-গুলো—

মনে হলো, মনোজিতের কাছে যেন এখন ওই জানলাগুলোই সব থেকে জরুরী।

হঠাৎ এই কানফাটানো বাজ, আর চোখধাঁধানো বিদ্যুতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সুনন্দা। পল্টনও দুধাপ নেমে দাঁড়িয়ে পড়ে মার দিকে তাকিয়ে বলতে যাচ্ছিল, তুমি নেমে আসছ কেন? আগে আমায় দেখতে দাও না!

বলার আগেই মনোজিৎ বললেন, পরেশ, তুই বরং ভদ্রলোককে ওপরেই ডেকে নিয়ে আয়! এখানেই ডেকে আন।

পল্টন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কে কী মতলবে এসেছে তার ঠিক নেই। ওপরে আনবে মানে?

বুবু চাপা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, পুলিশের লোকও হতে পারে।

মনোজিৎ হালছাড়া গলায় বললেন, তাহলে তো ডেকে না আনলেও উঠে আসবে!

কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে ছোট্ট সুন্দর কোয়ার্টার! এল শেপ বারান্দার সামনে একটুখানি বাগানের মতো গেট-এর দুপাশে দুটো বোগেনভেলিয়া গাছ। তার লতার হাত বাড়ানিতে গেটটা গোলাপি রঙা কাগুজে ফুলে আচ্ছন্ন।

নীনা চেষ্টা করে করে লতার ফেঁকড়িগুলো লোহার গেটের গ্রীলের খাঁজে খাঁজে ঢুকিয়ে দিয়ে দিয়ে এমনটি করে তুলেছিল।

ছোট্ট ওই বাগানটিও নীনারই হাতে গড়া! ছোট্ট থেকে তার ফুলগাছের শখ। আগে কোনোদিন বাগান নিয়ে মাথা ঘামায়নি অবন্তী। বলেছেন নীনার পাগলামি! ওইটুকুর মধ্যে জগতের সব ফুল ফোটানো চাই।

অমলেশ বলেছেন, তা সেটাই তো বাহাদুরী!

এখন অবন্তী প্রাণপণে সেই বাগানের যত্ন করেন। হয়তো গাছের গোড়ায় যে জলটা ঢালেন, তার সঙ্গে খানিকটা চোখের জলও মিশে যায়।

পড়ন্ত বেলায় নীনার শখের ঝারিটা নিয়েই ফুলগাছগুলোর গোড়ায় গোড়ায় জল দিচ্ছিলেন অবন্তী। বেল আর মল্লিকার ঝাড়ে কুঁড়ি এসেছে বিস্তর! গোলাপ গাছ দুটোতেই কটা কুঁড়ি আধফোটা অবস্থায়!

হয়তো কালই ফুটে যাবে।

অমলেশকে বলে বলে কলকাতা থেকে বোধহয় গ্লোব নার্সারি থেকেই, ওই চারা দুটো আনিয়ে ছেড়েছিল নীনা।

গেট ঠেলে ঢুকে এলেন অমলেশ!

অবন্তী তাড়াতাড়ি ঝারিটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে, অমলেশের হাতের ব্যাগটা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আস্তে বললেন, নীনার গোলাপ গাছে ফুল ফুটল।

অমলেশ অবন্তীর ওই বিষণ্ণ গলায় কথাটা শুনে গাছ দুটোর দিকে তাকালেন। তারপর এক নিঃশ্বাস ফেলে ব্যাগটা অবন্তীর হাতে দিয়ে এগিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে এলেন।

ওই এল শেপ বারান্দাটা গ্রীলঘেরা। এখানেই দুটো বেতের চেয়ার পাতা! অমলেশ তার একটায় বসে পড়ে বলে উঠলেন, অথচ কোনো মানে হয় না।

অবন্তী থতমত খেয়ে বললেন, কিসের মানে?

নীনার চলে যাওয়ার! আছে মানে?

এ কথার উত্তর নেই অবন্তীর কাছে!

বললেন, ভেতরে এসো।

যাচ্ছি। এখানটায় চমৎকার হাওয়া।

হাতমুখ ধুয়ে না হয় এখানে এসে বসো আবার। চা-টা এখানেই আনবো।

নাঃ, থাক। যাচ্ছি।

তারপর উঠে পড়ে বললেন, এখানে বসে থাকতে দেখলেই এক্ষুণি কেউ বেড়াতে আসবেন!

হ্যাঁ। এখন সেটাই বোধহয় প্রধান অসহ্য! লোক! লোকের আসা আর সহানুভূতির প্রলেপ মাখানো সব কৌতূহল প্রশ্ন!

ভেতরে ঢুকে এলেন।
ছবি ছবি এই কোয়ার্টারগুলোর গড়ন পেটন সকলেরই একরকম। তবে যে যেমন সাজাতে পেরেছে। সাজানোটা তো সংসারের সদস্য সংখ্যার ওপরও নির্ভর করে। বাহুল্যসংখ্যা হলেই জিনিসের বাহুল্য।
অমলেশের সংসারে বাহুল্যের প্রশ্ন ছিল না। আড়াইখানা মানুষ নিয়ে এখানের সংসারের শুরু। আস্তে আস্তে আড়াইখানাটা পুরো তিনখানায় দাঁড়িয়েছিল। আর আরো বাড়বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছিল। হঠাৎ একটা আলোর রোশনাইয়ের পরেই ঝপ করে অন্ধকারের শিকার হয়ে গেলেন অমলেশ আর অবন্তী।
হ্যাঁ এখন শুধু এই দুজন! আর কেউ নেই।
এখন অবন্তী আর অমলেশ শুধু দুজনে মুখোমুখি বসে চা খান।
কিন্তু এ ব্যবস্থা তো তাঁরা নিজেরাই করেছিলেন। এই অবস্থাই তো হবার কথা। অথচ অমলেশ হঠাৎ বলে উঠলেন, কোনো মানে হয় না! আছে মানে?
তা হয়তো এক হিসেবে অমলেশের কথাটাই সত্যি। মানে নেই। অমলেশ আর অবন্তীর একমাত্র সন্তান, পোশাকী নামটা মনে পড়ে না এদের, নীনা! নীনা! তার চলে যাওয়াটা তাই একটা প্রশ্ন চিহ্নের মতো তীক্ষ্ন হয়ে উঁচিয়ে থাকে।
অমলেশ একসময় আস্তে বললেন, কোনো চিঠিপত্র আসেনি?
অবন্তী জানেন কীরকম চিঠির আশা করছেন অমলেশ। তবু সহজ গলায় বলতে চেষ্টা করলেন, কই? একটা ইলেকট্রিকের বিল ছাড়া লেটার বক্সে তো আর কিছুই দেখলাম না।
অমলেশ চা খেতে খেতে বললেন, আচ্ছা, লাস্ট যে আর একক্ষেপ অ্যাড্‌ভার্টিসমেন্টটা দেওয়া হয়েছিল কাগজে কাগজে, তাতে ঠিক কী লেখা হয়েছিল তোমার মনে আছে?
মনে? অবন্তী মনে মনে বললেন, মুখস্থই তো আছে। তবু মুখে বললেন কী আর? এই তো—দেয়াল ধারে রাখা টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে একটা

পলিথিনের বড় মতো খাম বার করলেন। বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে বেশ কিছু খবরের কাগজের কাটিং। গোছা গোছা করা পেপার ক্লীপ দিয়ে আটকানো।···অবন্তী তা থেকে একটা গোছা বার করে একটু মেলে ধরে এগিয়ে দিলেন অমলেশের দিকে! হ্যাঁ, কী আর? সেই চিরা-চরিত ভাষাই—

'অভিজিৎ, যেখানেই থাকো খবর জানাও। ঠিকানা জানাতে না চাও, অন্ততঃ কেমন আছ জানাও! আমাদের অবস্থা ভাবো।

হতভাগ্য অমলেশ

কটক (উড়িষ্যা)

এর আগে শুধু পোস্ট বক্স নম্বর দেওয়া হয়েছে, তাই না?

হুঁ!

এবারে নাম, ঠিকানা দিয়েছিলাম কেন বলো তো?

কেন আর? বলেছিলে চেনাজানারা সকলেই তো জেনে গেছে। আর চক্ষু-লজ্জায় লাভ কী?

আস্তে আস্তে চা-টা শেষ করলেন অমলেশ। উঠে একবার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এদিকে খানিকটা তফাতে শঙ্কর সেনের কোয়ার্টার। শঙ্কর সেন বলেছিলেন, মেয়ের বিয়ে দেবার আগে ভালো করে খোঁজ নিয়েছিলেন অমলেশবাবু ছেলের কোনো পলিটিক্যাল ইয়ে আছে কিনা। কিংবা অন্য ধরনের কোনো পাস্ট হিস্ট্রি!···মানে আজকাল তো অনেক-রকম শোনা যায়!

ওই শঙ্করবাবুটিই অমলেশের জীবন মহানিশা করে তোলেন।

একদিন, মানে সেই প্রথমদিকে যখন অমলেশের মনটা লোকের প্রশ্নে প্রশ্নে ঘাঁটা পড়ে যায়নি সেই তখন শঙ্কর সেনের আবির্ভাবের আভাস দেখে হঠাৎ ফট করে পাশের বক্সরুমটার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। অবন্তীকে ইশারায় বলেছিলেন, বলো বাড়ি নেই।

তা সেদিন আচ্ছা শিক্ষা হয়েছিল ইংরাজীর অধ্যাপক অমলেশ মজুমদারের। গৃহকর্তা বাড়ি নেই শুনে ফিরে যাওয়া তো দূরে থাক, ভদ্রলোক যেন

আরো জাঁকিয়ে বসেছিলেন, এবং অবন্তীর কাছে ইহসংসারে মেয়ের বিয়ে দিয়ে যত রকম বিপদ ঘটে লোকের তার ফিরিস্তি দিতে বসেছিলেন। এবং মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করছিলেন, কী হলো ? অমলেশবাবু এখনো ফিরলেন না ? গেছেন কোথায় ?

শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর কৃপা করলেন ! শঙ্করের বাড়ির কাজের লোকটা ডাকতে এল, কলকাতা থেকে মামাবাবু এসেছেন। আপনাকে ডাকছেন।

কিন্তু এইখানেই কি শেষ হয়েছিল ?

পরদিন কলেজে দেখা হতেই বলে উঠেছিলেন, কাল কত রাত্রে ফিরলেন অমলেশবাবু ? আমি বহুক্ষণ লক্ষ্য রেখেছিলাম আপনার গেটের দিকে !

প্রশ্নের মধ্যে বেশ একটি সন্দেহের ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল। যেন অমলেশ বা অবন্তী তাঁকে কিছু একটা ধাপ্পা দিয়েছেন।

অথচ লোকটা একটা অধ্যাপক ! বয়েসও হয়েছে।

এখনো তেমন অন্ধকার নামেনি। তবু দেখা গেল, শঙ্কর সেনের বাড়িতে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে গেছে ! বাড়িটাকে খুব সুখী সুখী দেখাচ্ছে। অথচ ওইটুকু কোয়ার্টারের মধ্যেই গুটি চারেক ছেলেমেয়ে এবং একটি বেকার শালাকে নিয়ে বসবাস তাঁদের। জামাইবাবু কিছু একটা চাকরি করে দেবেন এই আশায় সে দিদির বাড়ি এসে পড়ে আছে।

বোকা প্যাটার্নের সেই ছেলেটা একদিন এসে বলেছিল, ইস, আপনাদের বাড়িটা কী সুন্দর সাজানো ! দিদিটার কোনো টেস্ট নেই। কী অগোছাল ! অথচ এখন ওই বাড়িটাকে দেখে সুখী সুখী লাগছে।

তখন অমলেশের বাসাটাকে দেখলেও সুখী সুখী লাগত।

অমলেশ ওদিকের জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে ঘরের আলো জ্বাললেন। দেখলেন, অবন্তী চায়ের কাপগুলো তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। বললেন, তোমার মালতী কোথায় গেল ?

আজ এ বেলা ছুটি নিয়েছে !

তাহলে তোমার এখন অনেক কাজ ?

না, না ? ও সব সেরে রেখে গেছে। শুধু রাত্রে খাবার সময় একটু গরম

করে নিলেই হবে !

ওঃ !

তারপর আস্তে বললেন, আচ্ছা অবন্তী, আমরা তো খুবই সাধারণ, তাই না ? খুবই সাধারণ !

অবন্তী একটু অবাক হলেন।

কে বলেছে অসাধারণ ? হঠাৎ এ কথা বলছ ?

না, মানে বলছি, অথচ আমাদের জীবনে কী অসাধারণ একটা ঘটনা ঘটে গেল !

অবন্তী আস্তে কাপ প্লেট দুটো নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অবন্তী ফিরে এলেন একটা ছেঁড়া মতো ভিজে তোয়ালে নিয়ে, টেবিলের সানমাইকার টপ্‌টা ঘষে ঘষে মুছতে লাগলেন। একটু চিনি পড়ে গিয়েছিল, চটচট করছে।

অমলেশ বললেন, আচ্ছা অবন্তী ! নীনা কি একবারের জন্যেও আসতে পারত না ?

অবন্তীর হাত থেমে গেল। আর অবন্তীর চোখে যেন ফস করে একটা দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠল।

কেন আসবে ? আমরা তাকে কোনোদিন আনতে চেয়েছি ? আনতে গিয়েছি ? একবারের জন্যে দেখতেও—

চলে গেলেন ঘর ছেড়ে !

অমলেশ চুপ করে গেলেন। চুপ করে বসে থাকলেন।

অনুভব করতে পারছেন, এখন এ ঘরে আসবেন না অবন্তী ! অবন্তীর মধ্যে দারুণ একটা অভিযোগ আছে, টের পান অমলেশ। কিন্তু অমলেশ কী করবেন ? অমলেশ কী করে সেই বাড়িতে গিয়ে দরজায় দাঁড়াবেন ? ওরা পুলিশ এনে জেরা করায়নি ? অমলেশকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখায়নি ওদের সেই আত্মীয় পুলিশ সুপার ?

এই বাবা ! জোর বিষ্টি এসে গেল !······

পরেশ বলে উঠল, আপনারা তক্কে নেগে গেলে। আর ভদ্দর নোকটা

ভিজে মরল।

মনোজিৎ চমকে উঠলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে নাকি?

তাছাড়া? আপনারাই তো অর্ডার করে রেখেছ, ঝপ করে অচেনা জনকে দরজা না খুলতে। দরজার কাটা জানালা দিয়ে দেখে এসে খবর দিয়ে তারপর—ও বাবা কী জোর করে বিষ্টি এল গো! খুলে দেবো কী না বলো?

অসহ্য।

পল্টন নেমে গেল।

পরেশও। সুনন্দা সিঁড়ির ক' ধাপ নেমে গলাটা ঝুলিয়ে দেখতে লাগলেন। ভীষণ উৎকণ্ঠা!

সোলজারকে খুঁজতে এল কে? বাইরের লোক তো তার ভালো নামটাতেই ডাকে। নেহাৎ চেনাজানা ছাড়া—

কিন্তু চেনাজানাদের কী কারো খবরটা জানতে বাকি আছে? দিনের পর দিন খবরের কাগজে, আর টি, ভিতে ঘোষণা হয়নি?

পল্টনের পিছু পিছু উঠে এল একজন।

তার পিছু পিছু পরেশ!

'লোকটা' না বলে ছেলেটি বললেই ভালো মানায়।

চকচকে ঝকঝকে চেহারা। কেশে-বেশে বেশ পরিপাট্য!

মনোজিৎ ব্যস্ত গলায় বললেন, ভিজে গেলেন?

না, না। ও কিছু না।

প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বার করে মাথাটা মুছে নিল আলতো করে। সুনন্দা এগিয়ে এলেন।

মনোজিৎ 'আপনি' করে কথা বললেও, সুনন্দা 'তুমিই' বললেন।

বললেন, 'সোলজারের' খোঁজ করছিলে?

গলাটা একটু কেঁপে গেল? তুমি তাকে ডাকনামে ডাকতে?

ওকে এখনো পর্যন্ত কেউ বসতে বলেনি! তাই সে একটা খালি চেয়ারের পিঠটা ধরে দাঁড়িয়েছিল।···বলল, হ্যাঁ, কলেজে হঠাৎ একদিন কীভাবে

ডাকনামটা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। সেই অবধি অনেকেই আমরা ওই নামেই
—ও এখন কী করছে? কলকাতায় নেই না কী?
সুনন্দা এ কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, তোমার নাম কী?
আমার নাম? বিনায়ক,। বিনায়ক চৌধুরী!
তুমি ওর বন্ধু?
নিশ্চয়। একসঙ্গে চার বছর পড়েছি। তারপরে অবশ্য—
সুনন্দার কথায় যেন জেরার সুর, বন্ধু। অথচ ওর সম্পর্কে কোনো খবরই রাখো না মনে হচ্ছে!
বিনায়ক একটু চমকে প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। এমন বিষণ্ণ অথচ কঠিন মুখ কেন? 'মা' বলেই তো মনে হচ্ছে। বাকি সকলের দিকে তাকাল। সকলেরই যেন কেমন পাথুরে মুখ। হঠাৎ ওর মনের মধ্যে ভয়ের একটা হিমপ্রবাহ বয়ে গেল।
তবে কী সেই সোলজার নামের সুন্দর ছেলেটা—
একটু থেমে বলল—কয়েকটা বছর আমি দেশে ছিলাম না। সবে কদিন ফিরেছি।
দেশে ছিলে না? মানে ভারতবর্ষের বাইরে? কোথায় ছিলে, আমেরিকায়?
নাঃ আমাদের সে সামর্থ্য কোথায়?
বিনায়ক বলল, ভাগ্য অন্বেষণে চলে গিয়েছিলাম দুবাই।
দুবাই! 'মিডল ইস্টে'? ওখানে তো অনেক মাইনে-টাইনে দেয়, তাই না? বলে উঠল পল্টন।
তা দেয়।
বিনায়ক একটু হাসল।
বসুন না। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?
মনোজিৎ এখন বলে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, বসুন।
এর আগে ওকে কেউ বসতে বলেনি। এখন যেন স্বামী-পুত্রের সমর্থন পেয়েই সুনন্দাও বললেন, বসতে তো হবেই বাবা। যা জোর বৃষ্টি হচ্ছে!
বিনায়ক অনুমান করল, এর পর হয়তো চা খাবারও অফার আসবে।

যদিও এই মহিলাই প্রায় জেরার সুরে কঠিন কঠিন গলায় বলেছিলেন, তুমি বলছ তুমি তার বন্ধু। অথচ তার কোনো খবর রাখো না।

আর সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার সময় যেন একটি তরুণী কণ্ঠ থেকে চাপা ঝঙ্কার শুনেছিল, 'কে কী মতলবে আসে'?

বিনায়ক মনে মনে একটু হাসল। বসল।

চেয়ারটা এমন জায়গায় স্থাপিত ছিল, যে বিনায়ক বসা মাত্র একেবারে মুখোমুখি হতে হলো দুটি তরুণীর সঙ্গে।

ওরা বসে নেই, দাঁড়িয়ে আছে। অথচ চলে যাবার কোনো ভঙ্গী নেই। টেবিলের ওপর দুহাত রেখে দাঁড়িয়েই থাকবে এই আলোচনা ক্ষেত্রে।

যদিও মনোজিৎ মনে মনে চাইছিলেন, ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকে যাক। কিন্তু মনে মনে চাওয়ায় কি ফল? মুখে চাইলেই কি ফল হতো? হয়তো ওদের মধ্যে একজন চাপা ঝঙ্কারে বলে উঠত, কেন? এখানে থাকায় তোমার অসুবিধেটা কী? আর অন্যজন মিনতির সঙ্গে দৃঢ়তা মিশিয়ে বলত আমি থাকি না বাবা।

বিনায়ক টেবিলের চেহারা দেখে বুঝতে পারল, ইতিপূর্বে এখানে চায়ের পর্ব চলছিল। আধ-খাওয়া কাপ পড়ে রয়েছে। একটা কাপ পুরোই ভর্তি। বিনায়কের আবির্ভাবই এর কারণ। খুব অসময়ে আসা হয়ে গেছে। কিন্তু এরা কে? এদের মধ্যে কাউকে 'বিধবা' মনে হচ্ছে কী?···অবশ্য দেখলেই 'বিধবা' বলে বোঝা যাবে এমন দুরবস্থা এখন আর নেই সমাজের। কিন্তু বিয়ে হয়েছিল না কী সোলজারের? অথবা এই দুটোই তার বোন! বিনায়ক একবার জানালার দিকে তাকাল। প্রবল বৃষ্টি পড়ছে।

পল্টন ফস করে বলে উঠল, প্রায় আড়াই বছর হলো দাদা হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেছে।

মনোজিৎ একটু বিরক্ত হলেন। সুনন্দাও বেশ বিরক্ত আর যেন হতাশ। খবরটা হঠাৎ এভাবে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না তাঁর। আরো একটু জেরা করতেন তিনি। খবরটা জেনেশুনে এসেছে কিনা। অথবা তার সম্পর্কে আরো কিছু জানে কিনা।···সবাই যে 'অনেস্ট' হবে তার কোনো মানে

নেই। ওই দেশে না থাকাটাই যে সত্যি, তারই বা ঠিক কী! 'মিডল ইস্ট' শুনেই পল্টনবাবু একেবারে বিগলিত হয়ে গেল!

নিখোঁজ!

বিনায়কের মুখ থেকে শব্দটা বেরোল, কিংবা বেরোল না।

'নিখোঁজ' মানে কী? ইচ্ছাকৃত নিরুদ্দেশ? নাকি কেউ পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলেছে? ও কী কোনো পলিটিক্যাল পার্টি-ফার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল? তখন তো নিশ্চয় নয়। বরং ঠিক উল্টোই! রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর বিষয় পড়ত-টড়ত!···তবে খুব খোলামেলা আড্ডাবাজও ছিল। এক হিসেবে সাদামাটাই। খুব একটা উচ্চ আশা-টাশাও যে ছিল তা মনে হতো না।

এই ছেলেকে কে হাপিস করবে?

প্রেমঘটিত কিছু? প্রতিদ্বন্দ্বিতা?

তাই কি সম্ভব? এই পরিবারের ছেলে!

অবশ্য কোন ক্ষেত্রে যে কী ঘটে!

বিনায়ক চুপ করেই থাকল।

মনোজিৎ কপালে হাত দিয়ে বললেন, ভাগ্য!

সুনন্দা আস্তে বললেন, ভাগ্য বলো না। বলো পরম দুর্ভাগ্য!

তারপর বললেন, তুমি ওর বন্ধু শুনে হঠাৎ খুব একটা আশা হচ্ছিল। তো তুমি তো দেশেই ছিলে না অনেক বছর।

হ্যাঁ, বছর ছয়েক।

পল্টন আবার বলে উঠল, এখন ছুটিতে এসেছেন বুঝি?

পল্টনের স্বরে কৌতূহল, উত্তেজনা।

বিনায়ক আবার একটু হাসল। বলল, একেবারেই ছুটি করে চলে এসেছি।

কেন? কন্টাক্টের চাকরি ছিল বুঝি?

তাই ছিল। তবে ইচ্ছে করলে ওটা করে নেওয়া যেত।

আরে! তবু ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন?

এলাম। থাকা যাচ্ছিল না।

কী আশ্চর্য! বললেন, মাইনে অনেক!

তা অনেক। কিন্তু সেইটাই তো জীবনের সব নয়। রুচি আর আত্মসম্মান প্রশ্নের একটা দায় তো থাকে মানুষের!

সামনে দুটি সুন্দরী এবং 'প্রায় সুন্দরী' তরুণী! ভালো ভাষায় কথা বলতে ভালোই লাগে!

সুনন্দা বললেন, পরেশ, বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এবার চায়ের জল চাপা!

বিনায়ক বলল, শুধু আমার জন্যে হলে কিন্তু দরকার নেই!

মনোজিৎ তাড়াতাড়ি বললেন, না না, আমাদের জন্যেও। ঠিকমতো খাওয়াটা হয়ে ওঠেনি।

আমার জন্যে ডিসটার্ব হলো!

বিনায়ক একটু হাসল।

আহা তা কেন? হঠাৎ ঝড়-ফড় উঠে—ইয়ে ধুলোও উড়ল। এই রে কাপের মধ্যে ধুলোবালি এসে পড়েছে।

আমি অসময়ে এসে পড়ে আপনাদের ব্যস্ত করলাম। চা খাওয়ার বিঘ্ন—

না না, তা কেন, হঠাৎ ঝড় উঠে একটু এলোমেলো করে বসল।

সুনন্দা আস্তে বললেন, হঠাৎ ঝড় উঠলে সবই এলোমেলো হয়ে যায়।

বিনায়ক বাড়ি ফিরল বেশ রাত করে। বাঁশরি বলে উঠল, উঃ, এত দিন বাইরে কাটিয়ে এসেও বাইরের নেশা কাটল না? দু'দণ্ড বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না?

বিনায়ক একটু হেসে বলে, সন্ধ্যের সময়টা বাড়ি এসে পড়া মানেই তো তোমায় ডিসটার্ব করা!

তার মানে? আমার আবার তাতে কী ডিসটার্ব?

বিনায়ক বলল, আহা, সারাদিনের পর তখন তোমার পতিদেবতাটি ঘরে ফেরেন, তাঁকে সেবাযত্ন সঙ্গ এবং প্রেমালাপের সময়—

ছাখো বড্ড অসভ্য হয়ে উঠেছ আজকাল ছোট সাহেব। এবার একটা বিয়ের দরকার।

বিনায়ক গায়ের ভেজা জামাটা খুলল। অবশ্য এখন আর ভেজা নেই

টেরিসিল্কের শার্ট, জল ঝরে আবার ওদের বাড়ির পাখার হাওয়ায় শুকিয়ে গেছে। তবু খুলল। চেয়ারে বসে পড়ে নিরীহ গলায় বলল, বিয়ে হলে অসভ্যতা সেরে যায় বলছ ?

উঃ, ফের অসভ্যতা ?

কী মুশকিল! তোমার কাছে সুসভ্যতাটি কী ?

সে বুঝবে না। বলছি আর দেশ ছেড়ে উধাও হবে না তো ?

একেবারেই হবো না তা বলতে পারছি না। তবে ও দেশে আর নয়।

ঠিক আছে। যতক্ষণ এ দেশে আছ, একটি ভবিযুক্ত এদেশী মেয়েকে বিয়ে করে ফেলো দিকি!

'ভবিযুক্ত!' সেটা আবার কী ?

কী ? ভব্যিযুক্ত কথাটা শোনেনি কখনো ?

শুনব না কেন ? শুনেছি। তবে তার স্বরূপটি ঠিক কী জানি না। একটা নমুনা দেখলে বুঝতে পারি।

সর্বদাই দেখছ। এই তো চোখের সামনেই!

ওঃ। অর্থাৎ তুমিই হচ্ছ আইডিয়াল!

অফকোর্স! আমার মতো একটা মেয়ে পেলে বর্তে যাবে হে ছোট সাহেব! এখন অনুমতি দাও, উঠে পড়ে কনে খুঁজি।

মাই গড্। কনে খুঁজবে ? খোঁজখুঁজির কনে ? সেই সেজেগুজে পাত্রী দেখতে যাওয়া—একপেট খাবার খেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে প্রশ্ন, 'মোচার ঘণ্টে কতটা গুড় দিতে হয় ?' এই রকম একখানা বিয়ে ঠিক করে রেখেছ আমার জন্যে ?

দ্যাখো বেশী রাগিও না বলছি। আজকাল আবার কে 'মোচার ঘণ্টর কথা তোলে ?

আচ্ছা বাবা, না হয় আধুনিক কবিতা সম্পর্কে মতামতের কথা তোলে। ব্যাপারটা একই।

বাঁশরি বলল, তা যে অপদার্থ গবেট হতভাগাটা এতদিন টাইম পেয়েও একখানা 'প্রেমে' পড়তে পারল না—

স্টকে আর বিশেষণ ছিল না?

থাকবে না কেন? অগাধ আছে। ধীরে ধীরে প্রয়োগ করে চলা হবে। তবে সত্যি বলছি তুমি একটা বাবিশ ছাড়া আর কিছু না।·· চারদিকে তাকিয়ে দেখো ইস্কুলের ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত দোহাত্তা 'প্রেম' চালিয়ে চলেছে। রোগা হ্যাংলা কেলে দাঁড়কাক আহ্লাদী পুতুল গোবর গণেশ সব্বাই প্রেম করে বেড়াচ্ছে। প্রেম করতে তো আর পয়সা লাগে না। লাগে একটু সাহস! সেটুকুও যখন নেই তোমার—

দাদার ছিল সাহস?

ছিল না তো কী?

বাঁশরি সদর্পে বলে, আমাদের বিয়েটা দস্তুরমতো লাভ ম্যারেজই বলা যায় হে। মনে নেই বুঝি?

বিনায়ক হেসে উঠে বলে, ও হ্যা হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। সোমেনদার বিয়েতে বরযাত্রী গিয়ে দাদা বোধহয় তোমাকে দেখেই খোঁজপত্তর করেছিল তাই না?

হুঁ তো। পরিপন্ন সেই শুনেছিল নাম বাঁশরি, ব্যস ধরে পড়ল, সোমেনদা ওই মেয়েটার সঙ্গে আমার লাগিয়ে দাও।

মনে পড়ছে বটে। একেও তাহলে প্রেমে পড়া বলা যায়?

যায়ই তো।

বাঁশরি স্বভাবগত জোরের সুরে বলে, এর নাম হচ্ছে দর্শনমাত্রে প্রেম সঞ্চার!

ও বৌদি। তাই নাকি?

বিনায়ক চৌকিটার একটা চাপড় মেরে বলে ওঠে, তাহলে বোধহয় আমারও হৃদয়ে তেমন কিছু একটার সঞ্চার হয়ে পড়েছে—

অ্যাঁ। কবে কখন?

এই আজই। একটু আগে। ঝড়বৃষ্টির ব্যাকগ্রাউণ্ডে দেখলাম একখানি মুখ। দুটি বিশাল চোখ—

থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আর ইয়ার্কি মারতে হবে না।

ওই তো—অমি এমনই অভাগা যে এটুকুও বিশ্বাস হলো না?

ঠিক আছে, বিশ্বাস করছি। বিশদ বলো।

বিশদ? ওই তো বললাম শুধু একজোড়া কাজলকালো চোখ।

বাঁশরি রেগে বলে, তা তো চোখজোড়া কি ঝড়ের আকশের গায়ে ঝুলছিল? হাত পা মাথা ধড় ছিল না?

ছিল অবশ্যই। তবে লক্ষ্য পড়েনি।

বাঁশরিকে বেশ খানিকক্ষণ রাগিয়ে অতঃপর বিনায়ক তাকে একটি নাটকীয় কাহিনী শোনায়।

পুরানো বন্ধুর খবর নিতে গিয়ে বিনায়ক জানতে পারল বন্ধুর নিখোঁজ।··· আর কেমন মহামুহূর্তে এই নিরুদ্দেশ হওয়া।

বিয়ের আট দিন পর নতুন বৌ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল ছেলে 'অষ্টমঙ্গলার' অনুষ্ঠান সারতে। রেলগাড়ির রাস্তা। কথা ছিল, দুদিন থেকে বৌকে তার বাপের বাড়ি রেখে একাই ফিরবে। সপ্তাহান্তে ছুটি শেষ। অফিসে জয়েন করতে হবে।

কিন্তু যথানির্দিষ্ট দিনে ফিরল না ছেলে।

অতএব বাড়িতে সমালোচনার ঝড় বইতে লাগল। বিয়ে হতে হতেই ভোল বদলে গেল? অ্যাঁ। যে ছেলে অফিস কামাই তো দূরে থাক, যেতে দশটা মিনিটও দেরি করতে নারাজ হয়, সে কিনা অফিসের চিন্তা ভুলে শ্বশুর-বাড়ি বসে থাকল! ছি ছি।

আরো দুদিন গেল।

নিন্দে তুঙ্গে। বেহায়া! নির্লজ্জ! শাশুড়ী তুকতাক করল নাকি? বৌ পেয়ে বিভোর! খুঁজে খুঁজে ছেলের জন্যে সুন্দরী বৌ নিয়ে আসা মুখ্যুমি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ হেন টেনশনের সময় হঠাৎ শ্বশুরের লেখা একখানি পোস্টকার্ড—

কল্যাণীয়েষু—

আশা করি ঠিকমতো সময় পৌঁছে গেছ। আমরা সকলেই তোমার একটি পৌঁছনো খবরের প্রত্যাশায় রয়েছি। চিঠি লেখার কারণ—তুমি তাড়াতাড়িতে

হাতের আংটি বাথরুমের ব্র্যাকেটে ফেলে রেখে গেছ, সেটি জানাচ্ছি যাতে চিন্তিত না হও। খুকু তুলে রেখেছে। সামনের মাসে যখন ওকে নিয়ে যাব, তখন খুকু আংটিটি নিয়ে যাবে। তোমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে এসে খুব মন খারাপ লাগছিল।

আশা করি বাড়ির সব কুশল। সকলকে আমার যথাযথ সম্ভাষণ জানিও।—

অমলেশ মজুমদার

চিঠি পড়ে বজ্রাঘাত!

ট্রেনে যথাসময় শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসেছে। শ্বশুর ট্রেনে তুলে দিয়ে গেছে? তাহলে? কোথায় গেল ছেলে? রাতের ট্রেন, ঘুমিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবে। সকালে নেমে পড়বে। ফার্স্ট ক্লাশের যাত্রী! কী হতে পারে? আর তেমন কিছু হলে তো—

ভাবতে পারে না কেউ। তদ্দণ্ডে টেলিগ্রাম করা, ছেলে ফেরেনি। শীঘ্র এসে খবর জানাও।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে নানা কূটকচালে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব প্রশ্ন। ...তারাই কিছু করল না তো নতুন জামাইটাকে? জগতে কত কী হচ্ছে! কী না হচ্ছে! ছেলের মা কেঁদে গিয়ে পড়লেন তাঁর এক হোমরা-চোমরা পুলিশ অফিসার তুতোদাদার কাছে। প্রায় সমবয়সী হলেও পদমর্যাদায় অনেকখানি মান্যের।

তিনি প্রথমেই যাচ্ছেতাই (পুলিশ বিভাগের আইনগত অধিকারে) ভাষায় ধমকালেন বোনকে। খিচিয়ে বললেন, দেশে আর কনে খুঁজে পেলি না, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে বিয়ের সম্বন্ধ? ফটো দেখেই রূপ দেখে মূর্ছা? বলি খোঁজ নিয়ে দেখেছিলি মেয়ের কোনো 'লাভার' আছে কিনা? থাকতেই পারে। সেই হারামজাদাই তোর ছেলেটাকে হাপিস করে দিতে পারে।

ছেলের মা ডুকরে উঠলেন।

অতঃপর অনেক কেলেঙ্কারী! পুলিশ অফিসার মামা সদলবলে উড়িষ্যা যাত্রা করলেন কনের এবং তার বাপের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে।

কিন্তু যেহেতু জায়গাটা অন্য রাজ্য এবং লোকটা একটা সরকারি কলেজের অধ্যাপক, তাই জামিনে খালাস থাকল। চার্জটা রইল।

মেয়ে সম্পর্কে তথ্য তল্লাশ। স্কুলে কলেজে পাড়ায়। সবই বলছে, অতি ভালো মেয়ে, অতি সভ্য শান্ত ভদ্র মেয়ে।

কিন্তু পুলিশ কি আর ওই ছেঁদো কথায় ভোলে? বলে কত দেখলাম। গোলাপে কীট, পদ্মের পাপড়ির মধ্যে কালকেউটে। মেয়েছেলেকে বিশ্বাস করতে আছে?...ওই যে বাপটার চিঠি? ও তো স্রেফ সাফাই।

এদিকে আবার 'নিরুদ্দেশ' সম্পর্কে যা যা করণীয় তাও করা হচ্ছে। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন, বেতারে দূরদর্শনে 'সংবাদ পরিবেশন'!...

এরই মধ্যেই একদিন ঘটল আর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

সেই মেয়ে! নববিবাহিতা সেই বধূ একদিন একা এসে হাজির শ্বশুরবাড়িতে। বলল, মা-বাপকে না জানিয়ে চিঠি লিখে রেখে চলে এসেছে। সে এখানেই থাকতে চায়। আশ্রয় চায় তার পতিগৃহে।

চোখের জলে ভাসা মুখ। ফটোতে যে চোখ দেখে শাশুড়ী মোহিত হয়ে এক কথায় বিয়ে এগিয়ে ফেলেছিলেন।

তোমায় আমরা রাখব কোন্ সুবাদে?

একদিন বরণ করে ঘরে তুলেছিলেন, সেই সুবাদে।

এখন তোমার নামে পুলিশের সমন ঝুলছে।

বেশ আমায় আপনারা এখান থেকেই জেলে পাঠান, ফাঁসি দিন, যা ইচ্ছে করুন! আমার বাবা বড় নিরীহ, বড় ভালো মানুষ। এইসব গোলমালে হার্ট অ্যাটাক, বিছানা নিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের জলজ্যান্ত ছেলেটা যে তোমাদের বাড়ি গিয়ে আর ফিরল না, তার কী?

মেয়েটা সেই চোখ তুলে প্রশ্ন করল, কিন্তু আমার কী কিছুই গেল না? আমার সমস্তটা জীবন?

এখানে 'আশ্রয়' না পেলে আত্মহত্যা ছাড়া তার আর গতি নেই! লোকটার

ফিরে আসার আশা ছাড়েনি বলেই এত লজ্জা অপমান কলঙ্ক সত্ত্বেও আত্মহত্যা করেনি।

তা এখন তো বিবেচনার ব্যাপার।

মেয়েটা যদি খারাপই হবে, যদি কোনো প্রেমিক-ট্রেমিক থাকবে, তাহলে তার আগেই তো ভাগতে পারত! আর যদি প্রেমিকটাই হিংস্র হয়, নিজের তেমন কোনো দুর্বলতা না থাকে, তো পুলিশের কাছে তার নাম প্রকাশ করে দিতে পারত। মোট কথা, ভালো মেয়ে না হলে এভাবে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে আশ্রয় ভিক্ষা চাইতে আসত কী?

বৈঠক বসল। দুঁদে মামাশ্বশুরকে ডাকা হলো। এবং আশ্চর্য এই, তিনিই রায় দিলেন, ঠিক আছে, থাকুক। বরং চোখের ওপর থাকবে। পাহারায় থাকবে।

আর তারও পর অত্যাশ্চর্য এই, পুলিশ হয়েও স্বীকার করলেন তিনি নাঃ, মেয়েটা বা তার বাপ সম্পর্কে সন্দেহ করাটা ঠিক হয়নি। মেয়েটা লক্ষ্মী মেয়ে। · অতএব পরোয়ানা খারিজ হয়ে গেল।

এবং তারও পরে দেখা গেল, ভুগ্নোবোনের বাড়িতে বেড়াতে আসাটা তাঁর বেড়ে গেল, আর এলে 'মা লক্ষ্মীর' হাতের চা' অথবা রান্নার ভূয়সী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে থাকলেন।

'অতঃপর আর কী?

নিরুদ্দেশ সম্পর্কে তদন্ত চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই রাত্রে কটক থেকে কলকাতাগামী যে ট্রেন এসেছে তার প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভেশনে তার নামটাম ছিল। ট্রেনে উঠেছিল এ সাক্ষ্যও পাওয়া গেল রেলগাড়ির 'রিজার্ভেশান' চেক করতে আসা কর্মচারী 'সাহেবের' বিবৃতিতে। তারপর কী হলো কে জানে।

তবে মেয়েটা তার পতিবিহীন পতিগৃহে রয়েই গেল।

বিয়ের পাঁচ, ছ-সাতটা দিন তো কাটিয়ে গিয়েছিল এখানে, তখন তো শ্বশুর-শাশুড়ীর 'নয়নমণি' হয়ে উঠেছিল। একালে এমন নম্রতা বাধ্যতা ভদ্রতা সৌজন্য আর সর্বোপরি আন্তরিকতা তো দুর্লভ। এ বাড়িতেও তো

প্রায় ওই বয়েসেরই একটি মেয়ে গোকুলে বাড়ছে। তার মেজাজের সামনে মা-বাপ দাঁড়াতে পারেন না।

সেই তার জন্যে সাজানো ঘরে তখনো তো জোড়া খাটে শয্যা পাতা রয়েছে।

কোন্ প্রাণে তাকে বলবেন—নিকালো হিঁয়াসে।

তখন শ্বশুর বলেছিলেন, আর যার ইচ্ছে নাম ধরে ডাকুক, আমি কিন্তু 'বৌমা' বলব। বৌমা ডাকটির মতো মিষ্টি ডাক আর আছে?

তখনই তো ওকে দেখেই কেঁদে উঠে বলেছিলেন, আমার ছেলেটাকে কোথায় হারিয়ে এলে বৌমা?

শ্বাশুড়ী তাকে তার সেই যুগল শয্যার ঘরেই আশ্রয় দিয়েছেন। বলেছেন, ওই ঘরটা চাবি দেওয়া পড়েছিল, দেখে বুক ফেটে যাচ্ছিল আমার।···

খোলা আছে, মনে হচ্ছে খোকা আছে। অফিস গেছে। খানিক পরে ফিরে আসবে।

আর তারপর থেকে মনের মধ্যে আশা আর বিশ্বাস, হয়তো আসবে। ফিরে আসবে তার নিজের ঘরে, তার মায়ের বুকে।

ঝড় থেমেছিল, বৃষ্টিও থেমে গেছে। এখন শুধু আকাশে বাতাসে একটা থমথমে ভিজে ভিজে ভাব।

কিন্তু সেটা কী শুধুই আকাশে?

মনোজিৎ রায়ের সংসারটাও এখন ওই আকাশটার মতো! বিনায়ক নামের সেই ছেলেটা যতক্ষণ ছিল, এখানে অনেক কথা অনেক শব্দ ভিতরে-ভিতরে অনেক অস্থিরতা। তাকে যখন সুনন্দা তাঁর ছেলের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনার ইতিহাসটি বলে চলেছিলেন কখনো এলোমেলোভাবে কখনো বা রুদ্ধস্বরে, তখন মাঝে মাঝেই মনোজিৎ বলে উঠছিলেন, না না, ওটা তুমি ঠিক বলতে পারছ না। আগে পরে গুলিয়ে ফেলছ।······

একবার শুধু বলে উঠেছিলেন, ওই পুলিশ সুপারটি তোমার নিজের দাদা নয়, সেটা বলেছ?

তখন পল্টন বলে উঠেছিল, নিজের দাদা আর পরের দাদায় তফাৎ কী?

কিন্তু মনোজিতের কাছে হয়তো তফাৎ ছিল। সুনন্দার গলা এলোমেলো-ভাবে অন্য কথা বলার ফাঁকে ফোকরে 'সেই' সংবাদটি তো মাঝে মাঝে উঁকি মারতে মারতে কখনো একবার উচ্চকিত হয়ে উঠছিল, এঁরা এঁদের ছেলের-ই রহস্যজনক নিখোঁজ হবার পরিপ্রেক্ষিতে খুনের দায়ে ফেলতে চেয়েছিলেন ছেলের নববিবাহিতা স্ত্রীকে আর তার বাপকে।

তাহলে? তাহলে এই কটু কুৎসিত কাজটি তাঁরা এমন একজন বলবান ব্যক্তির হুমকিতে করলেন, যে ব্যক্তি এদের নিতান্ত নিকট নন। সুনন্দার ওই পুলিশ দাদাটি সুনন্দার তুতো দাদা, এটুকু জানানোর মধ্যে কিছুটা স্বস্তি আছে বৈকি!

এখন সবাই বুঝে ফেলেছেন, সন্দেহটা গর্হিত। সবটাই তাঁদের অভিশপ্ত ভাগ্যের ফল!

বিনায়ক চলে যেতেই, মানে তার চলে যাওয়ার পর বাইরের দরজাটা বন্ধ হওয়ার শব্দের পর পল্টন বলে উঠল, ব্যাপারটা বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?

সুনন্দা সচকিত হলেন। তবে অবাক হলেন না।

সুনন্দার যে সবকিছুতেই 'বাড়াবাড়ি', এ অপবাদ তো সুনন্দার অঙ্গের ভূষণ।

তবে সুনন্দা ওদের দেওয়া এই অপবাদটি অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিতেও পারেন না। তেমন মনোবল নেই যে বলে উঠবেন, আমার তো সবেতেই বাড়াবাড়ি জানাই আছে। নতুন করে আর কী বলবি?

অথবা এও বলে উঠতে পারেন না, বাড়াবাড়ি তো বাড়াবাড়ি। কী করব? জেলে দিবি?

বেচারী সুনন্দা প্রতিবাদ করতে বসেন।

এখনো তাই করলেন।

বললেন, কী এমন বাড়াবাড়ি দেখলি? ভদ্রলোকের ছেলে, ঝড়বিষ্টির জন্যে আটকে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছে, তাকে একটু ভালো করে চা

খাবার খাওয়ানো হবে না ? ও তো বারবারই বলছিল, 'বিষ্টি কমেছে, উঠি।' তোরাই তো—

হ্যাঁ, মনোজিৎ বলেছিলেন বটে, না না, এখনো যথেষ্ট জোর চলছে।

আর বলেছিলেন, এখনকার ছেলেদের যে এই একটা ফ্যাশান হয়েছে, ছাতা না নেওয়া, ওয়াটারপ্রুফ গায়ে না দেওয়া—

পল্টন বলল, খাওয়ানোর কথা কে বলছে ? সে তো তুমি রাস্তার লোককেও হাতের কাছে পেলে খাওয়াও। এও অবিশ্যি একরকম তাই-ই। সে যাক, খাওয়ার কথা নয়, বলছি—একেবারে হৃদয় উজাড় করে হোল হিস্ট্রিটি বলে ফেলবার কী সত্যিই কোনো দরকার ছিল ? লোকটাকে তুমি চেনো ? সত্যিই দাদার বন্ধু কিনা প্রমাণ পেয়েছ কিছু ?

সুনন্দা অবাক হয়ে বললেন, প্রমাণ ? কী বলছিস পল্টন ? খোকার কত কথা বলল ?

বাবা !

পল্টন একটু হেসে বলল, শুনলে ? খোকার কত কথা বলল ! সেগুলো যে সত্যি তার প্রমাণ ?

সুনন্দার ভেতর থেকে একটা কান্নার উচ্ছ্বাস উঠে এল।

আশ্চর্য ! পেটের ছেলে হয়ে এত নিষ্ঠুর কেন ? মায়ের প্রাণের ভেতরটার হাহাকার বোঝে না ? যখন সুনন্দার মধ্যে নতুন করে সন্থ পুত্রহারার ব্যথা জেগে উঠেছে, তখন এইভাবে মাকে বিঁধছে।...

তবে পল্টনের তো এই স্বভাব। কাউকে একটু ডাউন করতে পারলেই ওর আহ্লাদ ! কিন্তু আর কাকে ডাউন করে পার পাওয়া যাবে ? এ জগতে মা ছাড়া আর কে থাকে যে শতবার হ্যানস্থা খেয়েও আবার হাসিমুখে ডেকে কথা কয় !

আর একবার বাষ্পোচ্ছ্বাস উথলে উঠল। সে কোনোদিন এমন ভাবে মায়ের সঙ্গে কথা কয়নি। দয়ার ঠাকুর !

সেই কথাই তো বলছিল ওই বন্ধুটি, সোলজারের সঙ্গে কারুর কোনো-দিন চটাচটি হতে দেখিনি।

হেসে বলেছিল, আমরা বলতাম কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয় জানি কিন্তু তোমার মতো এমন নামের বিপরীত দেখিনি কখনো!

এতক্ষণে মনোজিৎ বললেন, নাঃ, সত্যি! ঘরের কথা বড্ড বেশী বলা হয়ে গেছে।

সুনন্দা ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, তা সবাই তো বসেছিল। তখন এ খেয়াল হয়নি?

বুবু বলে উঠল, আমরা? বাবাঃ। তুমি যা অনর্গল মেশিন চালিয়ে যাচ্ছিলে. তার মাঝখানে কে কী বলতে পারতো?—তারপর এই হলো, তারপর—

মনোজিৎ আস্তে বললেন, আসলে আমরা সকলেই ওকে খুব বেশী বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম।

বুবু বলল, আমি করিনি।

করিসনি? করিসনি তো অমন হাঁ করে ওর কথা শুনে যাচ্ছিলি যে? কোনো প্রতিবাদ করতে তো দেখলাম না।

আমি তো নীরবে তোমাদের বিশ্বাসের বহর দেখে যাচ্ছিলাম! আমার তো স্থির বিশ্বাস, বেদম ঝড়-বৃষ্টির সময় একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে দুর্যোগটা কাটিয়ে নেবার জন্যে অত সব গল্প ফেঁদেছিল। নেহাৎই বানানো ব্যাপার।

কী বলছিস বুবু?

সুনন্দা উত্তেজিত হলেন। নামটা জানল কী করে?

সেটা কোনো ব্যাপারই নয়। হয়তো কোনোভাবে জেনে ফেলেছিল। সেইটিই মূলধন করে বলল এত কথা।

পল্টন গম্ভীরভাবে বলল, অত হালকা ব্যাপার নয় হে। আমার তো মনে হচ্ছে পুলিশের চর!

আসলে সত্যিই যে পল্টনের এতক্ষণ ঠিক সেই রকমই মনে হচ্ছিল, তা নয়। সেও ওই লোকটার চেহারার একটা স্মার্ট ভাব, কথাবার্তার আকর্ষণীয় ভঙ্গী, অথবা এ বাড়ির হারানো ছেলেটি সম্পর্কে তার ভালবাসার আন্তরিকতা, এসব লক্ষ্য করে সেও রীতিমতো আকৃষ্ট হয়েই বসে থেকেছে। এবং বারে-

বারেই প্রশ্ন করে করে 'দুবাই' নামক জায়গাটা সম্পর্কে তথ্য জেনে নেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এখন সে। চলে যাবার পরই ওর হঠাৎ খেয়াল হলো একদম রাস্তার একটা লোককে এতটা বিশ্বাস করা এবং বাড়ির একান্ত গোপনীয় কথাগুলিও বলে ফেলাটা ভীষণ বোকার মতো হয়ে গেছে। তাহলে ? নিজেকেও সেই বোকামির শরিক বলে পরিচয় দেবে নাকি ? মোটেই না।

অতএব তোমাদের ধরে নিতে হবে, পল্টন নামের বুদ্ধিমান ছেলেটা গোড়া থেকেই লোকটাকে সন্দেহ করেছে।

বুবুরও ওই একই ব্যাপার।

বোকামিটা মা'র খাতেই জমা হোক।

সুনন্দা বললেন, প্রমাণের কি কিছুই ছিল না ? বন্ধু না হলে ও কী করে জানল, খোকা যখনই খেত, কাপটা হাতে নিয়েই ওপরের খানিকটা ফেলে দিয়ে তবে খেত।...সাইড ব্যাগ নিলে কক্ষণো ডানদিকে ছাড়া বাঁ দিকের কাঁধে ঝোলাত না। আর প্রায় সব সময় গুনগুন করে গান গাইত। এসব কথা কী করে জানবে কেউ ? যদি না বেশীদিন দেখে !

পল্টন একটু সবজান্তা হাসি হেসে বলল, এগুলো যে কারেক্ট তারই বা প্রমাণ কী ? আন্দাজে যা তা বললেও—

কী বলছিস পল্টন ? তোর মনে নেই দাদার ওই অভ্যেসের কথা ?

মনোজিৎ বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই চায়ের কথাটা তো আমার শুনেই মনে পড়ে গেল। আমি বরং কতদিন—

পল্টনেরই কি মনে পড়েনি ? বাবা রেগে রেগে বলতেন, 'তোর চায়েই কি জগতের যত ধুলো এসে পড়ে ?'

কিন্তু এখন নিজের পক্ষে তো শক্ত যুক্তি খাড়া করতে হবে। একবার যখন বিরোধী পক্ষে নেমেছে। তাই বলে ওঠে, 'থটরীডিং' বলে একটা কথা আছে জানো তো মা ? নাকি জানো না ?

সুনন্দা কী উত্তর দিতেন কে জানে ! হঠাৎ সমস্ত পরিস্থিতিটাকে চমকে দিয়ে একটা কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হয়ে উঠল, সবসময় সকলকে খুব খারাপ,

নীচ আর জোচ্চোর ভাবা বোধহয় ঠিক নয় পল্টন।

এ স্বর তার। এতক্ষণ যে পাথরের প্রতিমার মতো দাঁড়িয়েছিল স্থির হয়ে।

কথাটা বলেই সে আস্তে পিছনের ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

পর্দাটা একটু দুলে উঠল। মৃদুভাবে দুলতে লাগল কিছুক্ষণ!

কিন্তু সমস্ত পরিবেশটার ওপর কী একটা বিদ্যুতের আঘাত হেনে গেল ওই অনন্যা নামের মেয়েটা! তাই প্রত্যেকেই যেন হঠাৎ শক খেলো।

'সব্বাইকেই সব সময় খুব খারাপ, নীচ আর জোচ্চোর ভাবা বোধহয় ঠিক নয়।'

ঠিক নয়। ঠিক নয়।

অথচ ওই 'বেঠিক' কাজটারই একটা ইতিহাস সৃষ্টি করে রেখেছে এবাড়ির লোকেরা।

যখন একটা ভদ্র মার্জিত শিক্ষিত ব্যক্তি নিজেদের দুঃখ-বেদনায় হাহাকার করা মনের ওপর ওই সব অভিযোগের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আমায় আপনারা জেলে দিন, ফাঁসি দিন, যা খুশী করুন, আমার মেয়েটাকে কিছু বলবেন না। একমাত্র সন্তান আমাদের! বড় অভিমানী। যদি দুঃখে অপমানে আত্মহত্যা করে বসে—

তখন তো এই পরিবারের সবাই সেটাকে 'মায়াকান্না' ভেবেছিলো। তারপর অবশ্য অবস্থার রং বদলে গেছে। কিন্তু এ যাবৎ ওই 'অভিমানী'র মুখ থেকে কোনো প্রতিবাদের বা অভিযোগের ধ্বনি ধ্বনিত হয়নি। নম্রতা বাধ্যতা আর সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি স্বরূপ অবস্থান তার। হঠাৎ আজ এই উদ্ঘাটন।

বিদ্যুতের শক খেলো সবাই!

পর্দাটা ঈষৎ দুলছে এখনো।

ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছে অনন্যা নামের মেয়েটা। এ বাড়িতে যেদিন বরণীয়া হয়ে এসে প্রবেশ করেছিল, তখন বাড়ির কর্তা বলেছিলেন, খুব সুন্দর নাম। অনন্যা তবু আমি বাপু 'বৌমা'ই বলব। 'বৌমা' ডাকটির মধ্যে একটা মর্যাদা আছে। নাম ধরে তো সবাইকে ডাকা যায়। 'বৌমা' ডাকা যায় কাকে?

কিন্তু কদিন সেই ডাক ?

ছ'দিন ? সাত দিন ? তারপরই তো অনেক দেবদেবীর নির্মাল্য সঙ্গে নিয়ে আর অনেক মঙ্গল আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে এ বাড়ির চৌকাঠ পার হয়ে গিয়ে কী ভয়াবহ অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া !

অনন্যা শুধু তার অনন্যসাধারণ শক্তিতে আবার একচিলতে আলোর আঙি-নায় উঠে এসেছে। অনন্যার জীবনে আর আলো না থাকুক, অনন্যার বহিরঙ্গে আলোর আভাস।

এখন তো উঠতে বসতে 'বৌমা' 'বৌমা' 'বৌমা'।

শ্বশুর-শাশুড়ী উভয়েরই এক মিনিট বৌমাকে দেখতে না পেলে চোখে অন্ধকার।

আর বাড়ির ওই উদ্ধত ছেলেমেয়ে দুটো ?

তা তারাও তো 'বৌদি' বলতে অজ্ঞান।

বৌদি বলেছিল, তোমায় কিন্তু আমি নাম ধরে ডাকব ভাই পল্টন। আমি দু'বছর আগে এম, এ, পার হয়ে বেরিয়ে এসেছি, আর তুমি এই সবে বি. এ, দিচ্ছ। অনেক জুনিয়ার।···আর বুবু ? তুমি তো একটা বাচ্চা। এখনো শাড়িই ধরোনি।

বুবু বলেছিল, আহা। শাড়ি ধরিনি তো কী ? ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ বছরের বুড়িরাও শালোয়ার কামিজ পরে।

কিন্তু এ সব কথা কবেকার ?

সেই ছ' সাতটি দিনের অধ্যায়ে না ? একটি উজ্জ্বল উপস্থিতির সামনে ? নাকি পরে ? সব যেন গুলিয়ে যায়।

না না, পরে কী করে হবে ?

পরে তো একটা হতমান্য জীবনের নিষ্প্রভ নিষ্প্রাণ ছায়া নিয়ে এসে ভিক্ষা-পাত্র হাতে করে দাঁড়িয়েছিল অনন্যা !

পর্দাফেলা ঘরটার মধ্যে এসে বসল অনন্যা।

প্রথমটা উত্তেজনায় একটু হাঁপাল। উত্তেজনা তো হবেই। গলার স্বর ঘরের বাতাসে ধ্বনিত হলো, এমন স্বরে কথা কবে বলেছে সে এ বাড়িতে ?

প্রথম যখন এসেছিল তখন নববধূর লজ্জাজড়িত মৃদু কণ্ঠ। আর যখন অনেক ঝড়ঝাপটা খেয়ে বিধ্বস্ত মূর্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তো আরো মৃদু। ওর ওই মৃদুতা আর নম্রতাই এ সংসারের লোক চারটের মনকে না গলিয়ে পারেনি!

আর ক্রমশঃই এরা চেষ্টা করে চলেছে যাতে ওই শান্ত বরফ প্রতিমার মধ্যে কিছুটা তাপ উত্তাপের সৃষ্টি হয়!

যেমন বুবু বলেছে, আচ্ছা 'বৌদি, টি,ভি-র ভালো ভালো প্রোগ্রামের সময়ই তোমার যত কাজ কেন বলো তো? চলে এসো বলছি। 'পরেশ-চন্দ্র' বসে বসে টি,ভি, দেখবেন, আর তুমি রান্নাঘর সামাল দেবে। এর মানে?

অনন্যা হেসে বলেছেন, মানে কিছু না। এমনি। ওই সব ভালো ভালো প্রোগ্রাম না দেখতে পেলে পরেশ যতটা লোকসান বোধ করবে, আমার ততটা নয়। এই যাচ্ছি, চলো না।

কখনো কখনো পল্টন বাইরে থেকে এসে দুমদাম করে বলেছে, মা, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে দারুণ একটা ছবির একজিবিশান হচ্ছে। তোমার ওই কুনো বৌটিকে নিয়ে চলো না একদিন। আরো চার-পাঁচ দিন চলবে।

সুনন্দা বলেছেন, আমার ও সব ভালো লাগে না বাবা। তোরা যা না। বুবু, তুই, বৌমা।

'বৌমা' সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, আমি তো ভাই ছবির ভারী বুঝি! বোকার মতো ঘুরব।

বোকারা এই রকমই বলে।

বলে রাগ দেখিয়ে চলে গেছে।

আবার হয়তো কোনোদিন বলেছে, 'বুক ফেয়ারে যাচ্ছি। যাবে তো চলো।'

বুকফেয়ার!

অনন্যা স্পন্দিত হয়েছে। বাংলার বাইরের বাসিন্দার মেয়ে, 'বুকফেয়ার' এর স্বাদ পাবার সুবিধে হয়নি কোনোদিন। কাগজে পড়েছে 'কলকাতার বই-

মেলা’! ক্রমশঃ জেলায় জেলায় বইমেলা।

তবু সেই স্পন্দনকে সংহত করে বলেছে, মা-বাবা যাবেন?

বাবা যেতেও পারেন। জানি না। তো আমি সে দলে নেই। আমার ‘দলে’ যোগ দিতে চাও তো বলো।

অনন্যা একটু হেসেছে।

আর যদি গিয়ে বায়না করতে বসি, ওই বইটা কিনব, সেই বইটা কিনব —তখন?

তখন পকেট উল্টে দেখিয়ে দেবো।

তবে আর গিয়ে কী হবে? ফাঁকা পকেটের সঙ্গে গিয়ে লাভ?

অর্থাৎ কৌশলে এড়িয়ে গেছে যাওয়ার প্রস্তাবটা।

সুনন্দা অবশ্য তেমন তেমন কোনো চেষ্টা করেন না।

সুনন্দা এই রকম প্রতিমাই পছন্দ করেন। তাঁর ছেলেটা হারিয়ে গেছে, আর ছেলের বৌ হাসবে, গল্প করবে, এ তাঁর মনের সুরে মেলে না।

তবু তিনিও মাঝে মাঝে বলেন, সারাক্ষণই কী এত কাজ তোমার বৌমা? একটু শোওয়া-বসা করতে দেখি না।

কী যে বলেন মা। সারাক্ষণই তো বসে থাকি। কাজ কোথায়?

মনোজিৎ কখনো কখনো বলেন, দাবা খেলাটা শিখে নাও বৌমা। তাহলে আমার একটু সুবিধে হয়।

অনন্যা মৃদু হাসে।

আচ্ছা, শিখিয়ে দেবেন।

কখন শেখাব? তুমি তো সর্বদাই কাজে ব্যস্ত। পরেশের কাজগুলো পর্যন্ত নিজের ঘাড়ে এনে ফেলো দেখি। আর তোমার শাশুড়ীকে নড়ে বসতে দেখি না।

বাঃ! মা বুঝি চিরকালই খাটবেন? আপনি তো বেশ রিটায়ার করে বসে আছেন। মা-ই বা কেন নয়? মাকে বলে দেবো, ওঁকে হিংসে করছেন আপনি।

বোবার ভূমিকায় থাকে না।

সরস সুন্দর কথাই বলে।

তবু যেন মনে হয়ে একটা কাঁচের আবরণের মধ্যে থেকে বলছে। মনে হচ্ছে স্পষ্ট দেখা যচ্ছে, কিন্তু হাত ঠেকাতে গেলে রক্তমাসের স্পর্শ পাওয়া যায় না।

আজই হঠাৎ যেন সেই স্পর্শটা পাওয়া গেল।

যখন বলে গেল, সবাইকে নীচ ছোট, আর জোচ্চোর ভাবা বোধহয় ঠিক নয় পল্টন।

যেন এই ছোট্ট প্রতিবাদটুকুর মধ্যে দিয়েই ধরা পড়ল, তোমরা একদা অনন্যা নামের মেয়েটাকে তাই ভেবেছ। ভেবেছ তার বাপ মাকেও।

একটা পুঞ্জীভূত অভিযোগ জমে আছে তার মধ্যে, এটাই প্রকাশ পেয়ে গেল ওইটুকুর মধ্যে।

হয়তো বা প্রকাশ পেয়ে গেল এ সংসারের রুচির প্রতি তার অবজ্ঞা!

তাই ঘরের লোকটা স্তব্ধ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

উত্তেজনা একটু প্রশমিত হলে অনন্যা ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। সেই একরকমই আছে।

যেখানে যেটি যেমন ছিল। ফুলশয্যার রাতে প্রথম যেমনটি দেখেছিল। ফুলের সম্ভার বাদে।

সুনন্দা এইভাবেই আগলে রেখে চলেছেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া ছেলের ঘরের দৃশ্যটিকে।

হারানো ছেলে একদিন ফিরে আসবেই এ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। অথবা হৃদয়ের আবেগ তার আকাঙ্ক্ষার রসে লালন করে চলেছেন সেই বিশ্বাসটিকে। হারানো ছেলে ফিরবে।

কিন্তু সে যেন এসে না দেখে তার পরিবেশটা হারিয়ে গেছে। যেন এসে দেখতে পায় যেমনটি রেখে গেছে, অথবা দেখে গেছে ঠিক তেমনটি অবিকল বজায় আছে।

এমন কি সে যে কী একটা ইংরিজি বই পড়তে পড়তে তার কোনো একটা খাঁজে পেজমার্ক রাখতে একটা মিনিবাসের টিকিট ঢুকিয়ে রেখেছিল সেটাও যাতে ঠাঁইছাড়া না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি এবং নির্দেশ দিয়ে রেখে চলে

ছেন। যেন ওইটুকুর মধ্যেই নিহিত থাকবে সুনন্দার মাতৃস্নেহের অতল গভীরতার পরিমাপ।

কিন্তু বইটা সে কবে পড়তে পড়তে রেখে দিয়েছিল ভেবে দেখলে দেখা যায়, সেটা তার বিয়ের আগে।

বিয়ের গোলমালে আবার বই পড়বার সময় পেল কখন সোলজার?

যেদিন সোলজার বৌ নিয়ে 'অষ্টমঙ্গলা' অনুষ্ঠানের দায় পোহাতে শ্বশুর-বাড়ি যাবার উদ্দেশ্যে রেলগাড়ি চড়তে গেছল, সুনন্দা ঘরটাতে এসে ঢুকেছিলেন, ওরা কিছু ফেলে ছড়িয়ে রেখে গেছে কিনা তদন্ত করতে। 'কাজের লোকজন' ঘরে ঢুকে ঘর পরিষ্কার করতে বসার আগেই দেখে নেওয়া ভালো।

বলা তো যায় না, কিছু হাতাবার সুযোগ পাবে কিনা তারা।

এখনকার ছেলেমেয়েদের যা গা-আলগা স্বভাব, হুঁশ পর্বের বালাই নেই। হয়তো দেখা যাবে বালিশের তলায় বৌয়ের কানের দুল অথবা ছেলের হাত-ঘড়িটাই!

তা সে সব কিছু দেখতে পাননি। শুধু ঘরের বদ্ধ বাতাসটা যেন একটা সৌরভের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে মন্থর হয়ে রয়েছিল।

ছদিন ধরেই কী ফুলের যোগান ছিল তাদের ঘরে? তা তো নয়। তবু এত সৌরভ তার?

আর কিছু না। খুব দামী বিদেশী পারফিউমের গন্ধ। এটাই নিত্য ব্যবহার করেছে।

কেন কে জানে সুনন্দার মনটাও কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। আর তখনি যেন মনের মধ্যে একটা পরম শূন্যতা অনুভব করেছিলেন। যেন সুনন্দার সোলজার নামের সেই মা-ঘেঁষা ছেলেটা আর সুনন্দার নেই। যেন হারিয়ে গেছে।

অথচ তখন এমন হবার কোনো কারণ ছিল না। থাকার কথাও নয়। তবু মনে হয়েছিল—সোলজার আর ঠিক তেমনি থাকবে না।

কে জানে কেন এমন মনে হয়েছিল।

'কুমার' পুত্রের হঠাৎ যুগল জীবনের ছাপ আঁকা এই ঘরের দৃশ্যটি দেখে ? ছেলের বিয়ে বিয়ে করে আর একটি সুন্দরী মেয়ে মেয়ে করে তো পাগল হয়েছিলেন। সেটা লাভের পর, মনে পূর্ণতার বদলে শূন্যতা কেন ?

কে জানে কেন !

তবে হয়েছিল।

তবু তিনি ঘরটিকে দেখেশুনে যথাযথ ছিমছাম করে রেখে বেরিয়ে এসেছিলেন। সেই সময় চোখে পড়েছিল ওই পেজমার্ক দেওয়া বইটা। ওয়ার্ডরোবের ওপর রাখা ছিল। কৌতূহল হলো, দেখি তো কী বই ? দুজনে পড়ছিল, নাকি ? কোনো প্রেমের কবিতা-টবিতার অথবা আর কিছুর।

খুলে দেখলেন, ইংরাজী বই। সুনন্দার অবোধগম্য, অতএব যেমন ছিল রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর—'ওই যেমন ছিল' রাখাটিই একটা নেশার মতো হয়ে গেল।...

অতএব অনন্যা তাকিয়ে তাকিয়ে 'সেই যেমন ছিল' তেমনটিই দেখতে পাচ্ছে।

জোড়া খাটের বিছানাটা পর্যন্ত তেমনি যুগল শয্যারূপেই বিরাজিত।

প্রথমটা সুনন্দা বলেছিলেন, বুবু না হয় এ ঘরেই শুক।

কিন্তু বুবু সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিল।

না বাবা। আমার তো যা কিছু পড়াশুনো রাতে ছাড়া হয় না। নিজের জায়গা ছাড়া—না, না, সে সুবিধে হবে না।

এতে অবশ্য অনন্যা কৃতজ্ঞই হয়েছিল।

সে তো একাই থাকতে চায়।

নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে মনের গভীরে বিনিদ্র রাত কাটিয়ে দেওয়া সেও একটা বিশেষ স্বাদ।

অথচ এই মেয়েই যখন মা-বাপের ঘরে 'এক সন্তানের' আধিপত্য নিয়ে জীবন কাটিয়েছে কী হাসিখুশী। কী চঞ্চল। কী আহ্লাদেপনা।

সেই মেয়েটাই কি এই মেয়েটা ?

রোজকার মতো আজও একবার ভাবল অনন্যা, আচ্ছা, ও কোথায় গেল ?

সেই আবেগে আনন্দে বিভোর, সেই নির্মল হাসিতে উজ্জ্বল মুখ, আর সেই কটা মাত্র দিনেই একেবারে আপন হয়ে যাওয়া মানুষ মধ্যে যে অন্য কিছু থাকা সম্ভব, তা যে মনেই হয় না।

তবু আজ অনন্যা ভাবতে লাগল, আচ্ছা বাড়ির লোকের অজ্ঞাতে ও কী কোনো পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল? ওর কী কোনো 'শত্রুপক্ষ' ছিল? কেউ কি সেই রাতে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে 'খুন' করে কোথাও লাশ পাচার করে ফেলেছিল?

এই ভাবনাটা বুঝি আজ ওর একটা বন্ধুকে দেখে মনে এল?

আর মনে আসতেই ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠল।

ওই বিনায়কের সঙ্গে আমায় কথা কইতেই হবে। আলাদাভাবে। এঁদের অসাক্ষাতে। জোর দিয়ে জেরা করে, মিনতি করে বলতে হবে, সত্যি কথা বলুন। যা জানেন তা বলুন। বলুন এ সম্ভাবনা আছে কিনা।

অসম্ভব কী।

কত ছেলে গোপনে কত পার্টির সঙ্গে যুক্ত, বিনায়কই যে তা নয়, কে বলতে পারে?

হঠাৎ কেনই বা এল ও?

না, না। আমায় ওর সঙ্গে কথা বলতেই হবে।

কিন্তু এঁরা কী সহজে রাজী হবেন?

যদিও সুনন্দা ছেলের বন্ধুকে দেখে খুবই উথলে উঠেছেন। এবং হয়তো তার এ বাড়িতে অবারিত দ্বার হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু 'অনন্যা'র পক্ষে কী সেই 'অবারিত' দ্বারের সুযোগ নেওয়া সম্ভব?

কিন্তু অনন্যাকে চেষ্টা করতেই হবে!

হ্যাঁ, যে করেই হোক।

দেখা যাচ্ছে বুবু পল্টন দুজনেই ওর সম্পর্কে বিরূপতা এবং সন্দেহ পোষণ করছে। গৃহকর্তাও মধ্যবর্তী অবস্থায়।

একমাত্র সুনন্দাই অনুকূল। কিন্তু সে অনুকূলতা অনন্যার কাজে লাগবে কী?

অনন্যা প্রতীক্ষা করে আবার কবে বিনায়ক আসবে।
দরজায় বেল বাজলেই চমকে ওঠে, ওই বোধহয় এল।
নাঃ, এভাবে চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে আটকে রেখে, শুধু সাংসারি
কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে জীবন কাটানো যাচ্ছে না আর।
কী করা যায় ?
কী করা যায় ? কী করে একবার বাইরে বেরিয়ে পড়ে খোঁজ করা যা
ওই বিনায়ক নামের ছেলেটার দেখা মেলে কিনা ! কোথায় থাকে সে ?
কিন্তু এ চিন্তার চাষ চলছে এ সংসারের আরো একজনের মধ্যেও ! সুনন্দা
অধীর অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন, আসবে বলে। যেন যে ছেলে তাঁ
ছেলেকে 'সোলজার' বলে ডাকে, সেই ছেলেটা এসে দাঁড়ালেই সোল
জারেরই সান্নিধ্য পাওয়া যাবে।
একদিন বলেই ফেললেন, আচ্ছা, ছেলেটার ঠিকানাটা একটু জেনে নিে
ছিলে ?
টার্গেট অবশ্যই নন্দ ঘোষ, মনোজিৎ।
মনোজিৎও অবশ্যই মুহূর্তে বুঝে ফেললেন 'ছেলেটা' কে ? তবু অসতে
মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কোন্ ছেলেটা ?'
অনন্যা ঘরের মধ্যে উৎকর্ণ হলো।
শুনতে পেল।
সুনন্দা রেগে বললেন, কোন্ ছেলেটা আবার ? 'খোকা'র ওই বন্ধুটির কথা
বলা হচ্ছে। তার ঠিকানাটা জেনে নেওয়ার কথা মনে পড়ল না তোমার
আশ্চর্য।
মনোজিৎ অবশ্যই বলতে পারতেন, 'তোমারই বা মনে পড়েছিল কই' ?
তা বললেন না। মনোজিৎ নির্বোধ পুরুষ নন। মনোজিতের এ জ্ঞান আে
মেয়েদের যেমন জন্মগত অধিকার স্বামীর উচিত কতর্ব্যের ক্রুটি ধরবা
পুরুষেরও তেমনি জন্মগত কর্তব্য সেই অভিযোগ নীরবে মেনে নেওয়া
কোনোমতেই মুখের মতো জবাব দিয়ে ওঠা নয়।
অতএব মনোজিৎকে মাথা চুলকোতে হলো, সত্যি ! নেওয়াটা উচিত ছিল

ায়াল হয়নি।

খন আমি কী করব ? যদি, আর না আসে ?

নন্দার স্বরে হতাশা, আক্ষেপ।

নন্যা আরো উৎকর্ণ হয়। কিছু একটা কাজের ছুতোয় দরজার কাছাকাছি
র আসে পর্দার ধারে।

নাজিৎ বললেন, আচ্ছা দেখি, পণ্টন বলতে পারে কিনা।

ণ্টন ! পণ্টন তো ওকে বিশ্বাসই করছে না।

নাজিৎ 'সাপ' এবং 'লাঠি' দুটো বস্তু সম্পর্কেই সতর্ক থেকে বললেন,
েন, অবিশ্বাসের কী আছে ?

তোমার ছেলেই জানে। এ যুগের ছেলেমেয়ের স্বভাবই হচ্ছে অন্যকে
নস্থার চোখে দেখা। আর সন্দেহ করা।

নাজিৎ আরো সাবধানে বললেন, তা 'সন্দেহ' করলেও তো ঠিকানা জেনে
থার দরকার আরো বেশী।

বুদ্ধি থাকলে তো। তবু তুমি একবার জিগ্যেস করো।

নন্যা আশান্বিত হয়।

নন্যা শুনতে পায় মনোজিৎ বলছেন, আচ্ছা। তবে ঠিকানা জানা এমন
ছু শক্ত হবে বলে মনে হয় না। ওর কোনো বন্ধুটন্ধুকে জিগ্যেস করলেও
তো—

ন্য কোনো বন্ধু ? তুমি তার কোনো বন্ধুকে চেনো ?

নন্দার স্বর উত্তেজিত, সেই তখন হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বলেনি আমি ওর
ানো বন্ধুকেই তো চিনি না। কোথায় খোঁজ করব ?

নন্দা প্রায় কেঁদে ফেলেন।

নন্যা জানে, আর কোনো কথা হবে না। এখন সুনন্দা ঘরের মধ্যে ঢুকে
বেন।

নন্যা মনের মধ্যে সাহস সঞ্চয় করে। অনন্যা অবিরত রিহার্সাল দিতে
কে মনে মনে। সন্ধ্যের দিকে এক সময় আস্তে শ্বশুরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে
ল, বাবা !

মনোজিৎ একটু চমকে ওঠেন। এই ডাক, খেতে ডাকবার বা ওষুধ খাওয়া
সময় মনে করিয়ে দেওয়ার ডাক নয়।

মুখ তুলে বললেন, কী গো মা জননী!

বলছিলাম কি—

অনন্যা একটু হাসির মতো সুরে বলে, বকবেন না তো?

এই সেরেছে। বকুনি খাওয়ার মতো কোনো প্রস্তাব এনেছ নাকি পা
করিয়ে নিতে?

তা সেটাও বলতে পারেন। বলছিলাম কি, এইভাবে কত আর বসে থা
যায়! একটা কিছু কাজকর্ম যোগাড় করে দিন না?

অ্যাঁ। বলো কি মা? বসে বসে তোমার পিঠে ঘুণ ধরে যাচ্ছে? আমি
দেখি খাটতে খাটতেই তোমার হাড়ে ঘুণ ধরে যাবার যোগাড়।

আহা। কী যে বলেন। ভারী তো কাজ। কী এত কাজ আছে বাড়িতে
খুঁজে খুঁজে বার করতে পারলে অভাব কী? তা ছাড়া—কিছু না জুট
তোমার দু'খানা কাঠি চালিয়ে উলের গোলা থেকে ম্যাজিক বানাতে ব
যায়। তোমার শাশুড়ীও করতো আগে। আমি বলতাম, নেই কাজ
খই ভাজ।

বাঃ। তা'হলে তো নিজেই নিজের কথার জবাব দিয়ে ফেললেন। '
কাজ'। তো কাজই চাইছি তো বাবা। দিন না একটা চাকরি-টাক
জুটিয়ে!

চাকরি!

মনোজিৎ এখন গভীর হন।

চাকরি করতে চাইছ? আর—যদি—যদি সে ফিরে আসে!

মনোজিৎ চশমাটা খুলে পাঞ্জাবির কোণ দিয়ে মুছে নিয়ে বলেন, এ
দেখবে, তার বাপ তার বৌটাকে একমুঠো খেতে দিতে পারেনি। নি
খেটে—

আবার চশমা খুললেন।

অনন্যাও কি চশমা খুলবে? তারও তো চোখে চশমার আবরণ!

না, অনন্যা খুব হালকা হয়ে গিয়ে বলল, উঃ। কী যে সব অদ্ভুত কথা মাথায় আসে আপনাদের। ঠিক আছে, তাই যদি হয় তো আমায় আবার একটু পড়াশুনো করতে দিন।

পড়াশুনো! সে তো যত ইচ্ছেই করতে পারো মা কে বাধা দিতে যাচ্ছে?

অনন্যা একটু কুণ্ঠিত গলায় বলল, না মানে ঠিক সেভাবে—মানে এলো-মেলোভাবে কিছু না করে, ধরুন নির্দিষ্ট কিছু একটা—

মনোজিৎ একটু তাকিয়ে দেখলেন। কী বুঝলেন কে জানে। তবে বললেন, এম, এ, পাশও তো হয়ে গেছে। এর পর আর—

অনন্যা আরো কুণ্ঠিত গলায় বলল, মানে ভাবছিলাম কি, অনার্সের নম্বরটা তো খুব খারাপ্ ছিল না—রিসার্চ করার চেষ্টা করা যায় না?

অনার্সের নম্বর খারাপ ছিল না, এটা অনন্যার বিনয়ের কথা। ইংরাজীর অধ্যাপকের মেয়ে অনন্যার ইংরাজীতে অনার্স ছিল আর এম, এ, পাশ করেছে ফার্স্ট ক্লাশ সেকেণ্ড হয়ে। পরিকল্পনা তো ছিলই—বিয়ের পরও ওই পড়ালেখার জগৎটাকে আঁকড়েই থাকবে। সেই ফুলশয্যার রাতেই তো বরের কাছে পেশ করেছিল এ কথা।

বর হেসে হেসে বলেছিল, তার মানে আমার ভাগ থেকে খানিকটা কমে যাবে। রাত জেগে জেগে ভিন্ন তো পড়াটড়া হবে না।

অনন্যা বলেছিল, মোটেই না। রাতে আমি জাগতেই পারি না। পড়াটড়া সবই—

অ্যাঁ। তাই নাকি? তাহলেও তো বিপদ।

অনন্যা একটু অবাক হয়ে বলেছিল, কেন? এতে বিপদ কিসে?

কিসে আর? একজন কথা বলে যাবে, আর অন্যজন নাক ডাকিয়ে যাবে।

আঃ। ধ্যেৎ!...বালিশে মুখ লুকিয়েছিল।

তারপর সেই চমৎকার নির্মল হাসিটির দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল, কী জানি নিজেরই পড়ায় মন বসবে কিনা।

এখন অনন্যা পড়ার কথাটাই বলল। কিন্তু সেটা কি নিছকই বিদ্যার্জনের জন্য? নাকি একটু মুক্তি অর্জনের জন্য? আর সেই 'অর্জন'টুকুর পথ ধরেই

সেই বিনায়ক নামের মানুষটার সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ লাভের আশা!

মনোজিৎ বললেন, বেশ। তাই হবে। কিন্তু গাইড তো চাই একজন? তোমার জানা কেউ—

আমার মাস্টারমশাই তো সবই কটক ইউনিভার্সিটির। এখানে—

আহা, তাঁদের মধ্যে যদি কেউ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির কারো নাম সাজেস্ট করে দেন। চিঠি লিখে দেখতে পারো।

অনন্যা ভাবল সে সব তো সুদূরপরাহত। আমার যে এখনি একটা কিছু করা দরকার।

অনন্যা তাই বলে উঠল, আপনি ঠিকই বলেছেন বাবা। তবে মনে হচ্ছে, তার আগে যদি কিছুদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে কিছু পড়াশুনো করতে পারতাম! মানে অনেকগুলো দিন তো এলোমেলো গেল।

বলেই চুপ করে গেল।

এতগুলো কথা একসঙ্গে কবে বলেছে? কথা যা বলে সবই দরকার মতো! প্রায় রুটিনমাপা।

মনোজিৎ বুঝতে পারছেন, মেয়েটার প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে। আস্তে বললেন, আচ্ছা মা সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। ঠিকই বলেছ। কিছুদিন বইয়ের জগতের মধ্যে থাকো। তারপর—

অধ্যাপক অমলেশ মজুমদার কলেজ থেকে ফিরেই জুতো খোলার আগে ব্যাগ থেকে একখানা খবরের কাগজ বার করে বললেন, অবন্তী তুমি তো ওড়িয়া ভাষাটা বেশ কিছু শিখে নিয়েছ দেখি, কাগজটা পড়তে পারবে?

অবন্তী বলল, বাঃ! একটু একটু বলতে আর কিছুটা বুঝতে পারি বলেই বুঝি ভাবছ পড়তেও পারব? কেন বলো তো? কী লিখেছে কাগজে? কাগজটা তো দেখছি—'মফস্বল সমাচার'।

এই তো পড়তে পারলে।

ধ্যেৎ। এ আবার পড়া নাকি? আন্দাজে। কিন্তু কী ব্যাপার বলো না গো!

বলছি।

বলে ঘরে এসে বসে অমলেশ যা জানালেন, তা এই—বালেশ্বর জেলায়

'মায়াবন' না কি যেন একটা গ্রামে 'দিগম্বর আশ্রম' নামে কোনো সাধুর আশ্রম ছিল। সাধু যে কোন্ জাতি তা কারো জানা নেই। তিনি ওড়িয়া ইংরিজি, হিন্দি, বাংলা নানা ভাষায় কথা বলতে পারেন, এবং নানা সম্প্রদায়ের ভক্তও আছে। তবে এমন কিছু বেশী সংখ্যায় নয়।

কিন্তু কিছুদিন হলো, হঠাৎ নাকি এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। এবং সেই থেকে হাজারে হাজারে লোক আসতে শুরু করেছে দিগম্বর আশ্রমে। ক্রমশঃই 'হাজারে'র সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

ফলে—

দিগম্বর আশ্রমের দারুণ বোলবোলাও।

এবং ক্ষুদ্র মন্দিরের পিছনের মুক্ত জমিতে এখন রীতিমতো সুবৃহৎ এক মন্দির নির্মাণ শুরু হয়ে গেছে।

আর অবিরত লোক সমাগমের ফলশ্রুতিতে—গ্রামের অবস্থা শহরতুল্য হয়ে উঠেছে। দোকান-পসার গজিয়ে উঠছে এবেলা ওবেলা আর তাদের বাড়বাড়ন্তও হচ্ছে। যানবাহনের সংখ্যাও ক্রমেই বাড়তির যুগে।

এককথায়—যেন এক ঘুমন্ত রাজকন্যা সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে উঠেছে।

কিন্তু কী সেই সোনার কাঠি? কী সেই অলৌকিক ঘটনা?

সে ঘটনা হচ্ছে—'দিগম্বর সাধু'র কাছে সহসা এসে ধরা দিয়েছেন 'স্বয়ং ভগবান'।

কীভাবে এই আবির্ভাব?

সে কথা বলেন না সাধু। শুধু বলেন, 'কৃপা'। নারায়ণের কৃপা। অধঃপতিত পৃথিবীর জীব তরাতে 'তিনি' স্বেচ্ছায় বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে এসেছেন।

কিন্তু লোকে এই আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করছে?

তা করবে না? ভগবান যে যাকে দেখছেন, তার ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান সব বলে দিচ্ছেন গড়গড়িয়ে।

প্রথমটা দু'দশজনের বিশ্বাস জন্মেছে। অতঃপর সেই 'বিশ্বাসী'দের মুখে মুখে ছড়াতে ছড়াতে এই মহিমা-কথা ছড়িয়ে পড়েছে, পড়ে চলেছে দূরদূরান্তর পর্যন্ত।

মোটামুটি সবটা শুনে নিয়ে অবন্তী বল্লে, তা এ এমন কি নতুন ব্যাপার? আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমিতে আদি অন্তকাল থেকে ভগবানের আবির্ভাব তো ঘটেই চলেছে। গ্রাম-গঞ্জে শহরে বাজারে যেখানে সেখানেই তো হঠাৎ হঠাৎ কোনো দেব আবির্ভাব আর সেই আবির্ভাবকে ঘিরে কিছু মানুষের মত্ততা। আর সেই মত্ততার ফলে—বড় বড় মঠ মন্দির গজিয়ে ওঠা। এ তো হরদমই চলেছে। অলিতে-গলিতে 'বাবা মহারাজ,' 'মা জগদীশ্বরী' বা 'মা পরমাশক্তি'। যেখানে সেখানে শনি, শেতলা। 'দেবদেবীর ভর', মাদুলি কবচ তাগা তাবিজ। এর জন্যে হঠাৎ কাগজখানা বয়ে নিয়ে এলে যে?

অমলেশ একটু বিব্রত কুণ্ঠিত গলায় বলেন, আর বলো না। কলেজে অনেকেই ওই ভগবান দর্শন আর ভূতভবিষ্যৎ গণনার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। আর—

কলেজের অনেকে?

অবন্তী একটু বেজার হয়ে বলে, অনেকে মানে তো পিয়ন দারোয়ান ঝাড়ু-দাররা। তাতে—

পিয়ন? দারোয়ান? ঝাড়ুদার?

অমলেশ একটু হাসলেন।

বললেন, তবে তো সবই বুঝেছ? ক্ষেপেছেন স্বয়ং মিশ্রমশাই, পাণিগ্রাহীবাবু, দাসবাবু, অভয় শাহু।

নামগুলো অবন্তীর চেনা। কলেজের ডক্টরেট করা অধ্যাপকেরা।

ওঁরা একটা 'জিপ'-এর ব্যবস্থা করে সকলে মিলে যাবেন সেই দিগম্বর আশ্রমে। ভগবান দর্শনান্তে ভূতভবিষ্যৎ শুনিয়ে আসবেন। তো আমায় সবাই অনুরোধ করছে ওনাদের সঙ্গে যেতে।

এ মা। সে কী! তা অনুরোধ করলেও, তুমি তো বলেই দেবে তুমি এসব বিশ্বাস করো না।

'দেবো' কেন, বলেইছি তো। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো? এঁরা সকলেই আমার শুভানুধ্যায়ী। আর সকলেই আমার দুর্ভাগ্যের কথা জানেন। তাই ধরে পড়েছেন, চলুন না একবার। গণনা করিয়ে আসুন আপনার জামাইয়ের বিষয়ে কিছু বলতে পারেন কিনা। বলছে—জাস্ট একবার কৌতূহল মিটিয়েই

আস্থন না। এত এত লোক যখন আসছে, এতটা কাণ্ড ঘটে চলেছে—তার পিছনে কিছুও তো থাকতে পারে। আশ্চর্য অবন্তী, এঁরা প্রায় সকলেই দেবশক্তিতে রীতিমতো বিশ্বাসী!

অবন্তী আস্তে বলে, তাহলে যাচ্ছ ওদের সঙ্গে?

কথা দিইনি। বলেছি যে আপনারা আগে ঘুরে আস্থন। আপনাদের এক্স-পিরিয়েন্সটা একবার দেখি, পরে না হয়—তো সবাই ধরছে, না হয় একটু বেড়িয়েই আসবেন আমাদের সঙ্গে। 'ভগবানের মর্জি' বলা তো যায় না। যেমন হঠাৎ আবির্ভাব ঘটেছে, তেমনি হঠাৎ অন্তর্ধানও ঘটতে পারে। আর জগতে কত কী-ই তো হয়! ধরুন সত্যিই আপনার নিখোঁজ জামাইয়ের কোনো সন্ধান পেয়ে গেলেন! অবন্তী আরো আস্তে বলল, কবে যাওয়া?

এই যে সামনে যে দু'দিন ছুটি রয়েছে—

অবন্তী চা নিয়ে আসতে চলে গেল।

তারপর চা খেতে খেতে হঠাৎ বলে উঠল, ছাখো, তোমার গিয়ে কাজ নেই। আমার তো ইচ্ছেও নেই। কিন্তু এমন একটা ব্যাপার নিয়ে ইয়ে করছে। আসলে আমারই তো আগ্রহ হবার কথা!

অবন্তী ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বলে, বাঃ। যার এসবে বিশ্বাস নেই, তার আগ্রহ থাকার কী দরকার?

অমলেশ আস্তে ওর পিঠটা ছুঁয়ে বলেন, ঘরসংসারী মানুষরা বড় অসহায় অবন্তী। সত্যি 'বিশ্বাস' হয়তো কেউই করে না। অন্ততঃ এরা তো সকলেই শিক্ষিত ব্যক্তি। বিজ্ঞানের ছাত্রটাত্রও। কিন্তু সকলের জীবনেই কিছু না কিছু জটিল সমস্যা, সকলের পরিবারেই কোনো না কোনো নিকট-জনের দুরারোগ্য ব্যাধি, যেখানে আশা করার কিছু নেই। অতএব এদের কাছে একটাই আশার আলো, যদি হঠাৎ কোনো অলৌকিকে, কোনো দৈবশক্তিতে এসবের সমাধান ঘটে যায়। 'আশা'! নিয়েই তো বেঁচে থাকে মানুষ!

হঠাৎ অবন্তী দু'হাতে মুখ ঢাকে। জানি, জানি। আমিও তো তাই আছি। সেই জন্যেই তো তোমায় যেতে বারণ করছি।...যদি...যদি বলে বসে—না না। তুমি যেও না। ওইসব লোকেদের মধ্যে তো মায়া-মমতা থাকে

না। হয়তো ফট্ করে বলে বসবে—না না, তুমি যেও না।

অমলেশ বলেন, ঠিক আছে, যাব না। তবে আমরা তো এসব বিশ্বাস করি না অবন্তী!

অবন্তী ভাঙা গলায় বলে, করি না। কিন্তু যদি বলে, তার কোনো শত্রু ছিল। তাকে রাতের অন্ধকারে চলন্ত ট্রেন থেকে—না, না। আমি এখনো স্বপ্ন দেখি সে ফিরে আসবে। নীনার জীবন আবার সুন্দর হয়ে উঠবে।

অমলেশ একটুক্ষণ ঘরের মধ্যেই পায়চারি করেন। একসময় দাঁড়িয়ে পড়েন। তারপর বলে ওঠেন, কোনো চিঠিপত্র আসেনি?

চিঠি। ও হ্যাঁ, নীনার পোস্টকার্ড এসেছে।

এসেছে? কই বলছ না যে? কী লিখেছে?

অবন্তী একটু ম্লান হাসল।

আর তেমনি ম্লান বিষণ্ণ গলায় বলল, কি লিখেছে? সে তো তোমার মুখস্থই আছে।

মুখস্থই আছে!

কথাটা বিস্ময়কর। কিন্তু সত্য।

প্রতি সপ্তাহেই অমলেশ অবন্তীর সেই একমাত্র সন্তান নীনার কাছ থেকে একটি করে পোস্টকার্ড আসে, যার ভাষা হচ্ছে—

শ্রীচরণকমলেষু,

মা-বাবা! আশা করি তোমাদের শরীর সুস্থ আছে। এখানের খবর একই রকম। আমার জন্যে চিন্তা করো না। তোমরা সাবধানে থেকো। প্রণাম নিও। ইতি—

এই একই ভাষা লেখা একটা করে পোস্টকার্ড নিয়মিতই আসে। তোলা থাকে অবশ্যই প্রাণতুল্য করে। তবু অবন্তীর মনে হয়, এ যেন একটা ভাগ্যের ব্যঙ্গের মতো। যেন একটা চিঠি লিখে নীনা অনেকগুলো পোস্ট-কার্ডে 'জেরক্স' করিয়ে রেখেছে। শুধু সপ্তাহে সপ্তাহে তারিখ বসিয়ে পাঠিয়ে দেয় মা-বাপের কাছে।

একবারও কি একটা সত্যি 'চিঠি' দিতে নেই?

এমন কেন করে ও? বলো বলো এর মানে?
কত সময় বলে ফেলেছে অবন্তী।
অমলেশের এর মানে জানা নেই।
শুধু অনুমান। মনগড়া একটা ব্যাখ্যা।
সে ব্যাখ্যা হচ্ছে—অসম্ভব আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আর গভীর অভিমানী সেই মেয়ে তার শ্বশুরবাড়ির লোকের কাছে দৃঢ়তার সঙ্গে দেখায়, সে তার ওই পরবাসের জীবনের একটি কথাও মা-বাপের কাছে জানাতে যায় না। শুধু তাঁদের নিশ্চিন্ত করতে এই চিঠির 'পরিহাস'।
ওকে তো শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে যায়নি! ও স্বেচ্ছায় গেছে। করুণাপ্রার্থী হয়ে। অতএব এ সংসারের সঙ্গে তার আর কোনো একান্ত যোগসূত্র নেই।
কিন্তু নীনাকে তো দোষ দেওয়া যায় না।
অমলেশ আর অবন্তী কি বোঝেন না সে কথা? নীনার এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন শুধুমাত্র মা-বাপকে বাঁচাতে। তার সঙ্গে অবশ্যই নিজেকেও বাঁচাতে। অমলেশের সদ্যবিবাহিত জামাই বিয়ের অষ্টমঙ্গলা অনুষ্ঠান সারতে শ্বশুরবাড়িতে দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসে যখন হঠাৎ কর্পূরের মতো উবে গেল, তখন কী ভয়ানক তীব্র তীক্ষ্ণ নীচ কুটিল সন্দেহে তাঁদের বিদ্ধ করা হয়েছিল, সে কী ভোলবার?
নীনার এই আত্মোৎসর্গই সেই কুটিল সন্দেহকে নিবারণ করেছে।
তাই নীনা দেখিয়ে চলেছে, যেন পূর্বজীবনের সঙ্গে তার আর কোনো যোগ নেই, নেই কোনো অন্তরঙ্গতা!
হয়তো নীনাই ঠিক পথ ধরেছিল। এভাবে ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে না গেলে কোনোদিনই কি সন্দেহমুক্ত হতে পারত?
সবই বোঝে অবন্তী।
তবু অবুঝ মাতৃহৃদয় অভিমানে নিথর হয়ে থাকে।
কী এমন এসে যায় একবারটি একটু লিখতে, মা, তোমাদের কতদিন দেখিনি!
অমলেশ ভগবান দর্শনে না যাওয়ায় তাঁর সহকর্মীরা বেশ ক্ষুব্ধ হলেন।

'আপনারা আগে দেখে আসুন।'

এটা কোনো যুক্তি নয়।

এ যেন সহকর্মীদেরকে ইচ্ছে করে অবজ্ঞা করা। যেন আমি তোমাদের মতো অমন অন্ধবিশ্বাসী বোকা গাঁইয়া নয়। আমি ওই সব বুজরুকি দেখতে সময় নষ্ট করতে যাই না।

তাছাড়া—তাঁরা তো অমলেশের জীবনের একটি পরম দুঃখময় সমস্যার বিষয়ও ভেবেছিলেন। তাঁরাও তো জানতে উৎসুক রয়েছেন, অমলেশের সদ্যবিবাহিত নতুন জামাই বাড়ি ফেরার পথে রাতারাতি ট্রেন থেকে উধাও হয়ে গেল কোথায়?

অনেকেরই এমন ধারণা ছিল, হয়তো অমলেশ মেয়ের বিয়ের সময় পাত্রের রূপ, ডিগ্রী আর তার পারিবারিক অবস্থার খবরেই মোহিত হয়েছিলেন, আর কিছু খবর নেননি।

হয়তো ছেলে নকশাল, নয়তো বা কোনো দাগী আসামী (রাজনৈতিক হলেও), পুলিশ ওইভাবে পাকড়ে ফেলে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।

হয়তো এখনো হাজতে পচছে।

এখনো মামলা দায়ের হয়ে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

তা যে কোনো ব্যাপারই হোক, 'ভগবান' মুখনিঃসৃত দৈববাণী থেকে তো কিছুটা বোঝা যেত। সেটা হলো না।

হলো না আসল পার্টির অসহযোগিতায়।

উচ্চ ডিগ্রীধারী বড় বড় অধ্যাপকরাও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, তার মানে আছে কিছু গোপন রহস্য। হয়তো ডক্টর মজুমদার নিজেই জানেন কোথায় কী রহস্য বিদ্যমান। সেটা পাঁচজনের সামনে ফাঁস হয়ে যাক তা চান না।

অতএব সকলের সঙ্গে 'পিকনিকের' মেজাজ নিয়েও বেরিয়ে পড়তে পারলেন না।

মেয়ের বিয়ের পরই জামাই নিখোঁজ হওয়ায় একবার তো হয়েই ছিলেন, নতুন করে অমলেশ দম্পতি আবার পরিচিত জনের চোখে সন্দেহভাজন

হলেন।

জেনে-বুঝেও স্থির হয়ে বসে থাকতে হলো তাঁদের।

তবে দিন তো বসে থাকে না। সে নিজের নিয়মে চলতে থাকে। অমলেশও নিত্য কাজ করে চলেন। সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হয়। কথাও হয় বৈকি। ভগবান দর্শন করে প্রত্যাগতদের মুখে উচ্ছ্বাসিত বিবরণ শোনেন।...কার কার কী কী প্রশ্নের কী কী অকাট্য উত্তর পাওয়া গিয়েছে তার বিবরণ, এবং সেখানে আকাশ-বাতাস আলোড়িত 'জনতার' আলোচনা থেকে সংগৃহীত দেবশক্তির অলৌকিক মহিমার বিবরণ।

একটা প্রায় অচল পঙ্গু লোক হামা দিয়ে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে এসে, ভগবানের হাতের ছুঁড়ে দেওয়া একটি শুকনো ফুলের স্পর্শে দাঁড়িয়ে উঠে পায়ে হেঁটে ফিরে গেল এ তাঁরা প্রত্যক্ষ দেখে এসেছেন। দেখে এসেছেন একটি জন্মান্ধ মেয়ের দৃষ্টিশক্তি লাভ। একটি বন্ধ্যা নারী গতবছরে ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন সে শিশুপুত্র কোলে নিয়ে পুজো দিয়ে এসেছে, এমনি সব কাহিনী শুনিয়েছেন।

শোনাবেন না? তাঁরা যে অন্ধবিশ্বাসী অজ্ঞ মুখ্যু গ্রাম্যবুদ্ধি লোক নন তা বোঝাতেও তো শুনে আসা কথাগুলি সালঙ্কারে বলবেন।

অমলেশ একবার বলেছিলেন, তোমার কী মনে হয় অবন্তী, গেলেই হতো?

অবন্তী বলেছিল, জানি না।

এই হতভাগ্য দুঃখী দম্পতির সামনে কোনো আশার আলো নেই।... অথচ—অথচ মাত্র তিন বছর আগেও এঁরা ছিলেন সকলের ঈর্ষার পাত্র। কী উজ্জ্বল কী সুন্দর কী আনন্দময় ছিলেন মানুষ দুটো!

যাঁদের সংসার-বৃন্তে তখন ফুটে উঠেছে একটি সুন্দর গোলাপ। সদ্য এম, এ, পাশ করে বেরিয়ে আসা সেই মেয়েটা। যার নাম নীনা। যার নাম অনন্যা।

সেই ফুলটি এখন বৃন্তচ্যুত। এখন আর সে মজুমদার নয়, সে রায়বাড়ির একজন।

শরি উল্লাসের ঝঙ্কার তুলে বলল, তোমার আজকাল কী হয়েছে বলো

তো ছোট সাহেব ? প্রেমেটেমে পড়ে বসেছ নাকি ?

বিনায়ক ঘামে ভেজা শার্টটা খুলে হ্যাঙারে আটকে বারান্দার তারে ঝুলিয়ে দিতে দিতে বলল, প্রেমে পড়ার লক্ষণটা কী ?

এই যে সদা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। নাওয়া-খাওয়ার সময়ের ঠিক নেই। অথচ মুখে যেন অনৈসর্গিক কোনো আলোর জেল্লা।

এ কী ! থামলে যে ? এক্ষুণি ফুরিয়ে গেল ? প্রেমের লক্ষণ মাত্র ওইটুকু

বাঁশরি টেবিলে খাবার সাজাতে সাজাতে অনায়াস গলায় বলল, আমি তো পূর্ণ প্রেমের লক্ষণের কথা বলিনি। শুধু 'প্রেমে পড়ার' কথা বলেছি তা 'পড়া' মানেই সব। পড়া মানেই পতিত হওয়া, পড়ে জখম হওয়া খতমও বলা যায়। জলে পড়া আগুনে পড়া, ছাদ থেকে পড়া, পাহাড় চূড়ো থেকে পড়া—সব কিছু শব্দের মধ্যেই কিন্তু ফিনিস হওয়ার ইঙ্গিত বুঝেছি। তার মানে ফিনিসই হয়ে বসে আছ। যাক, এখন ভাত কা খাওয়া সম্ভব হবে কী ? চান করে বেরিয়ে গেলে 'এক্ষুণি আসছি' বলে এই এখন আসা হলো।

ইস ! অনেক বেলা হয়ে গেছে দেখছি।

বিনায়ক তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে এসে টেবিলের ধারে বসে পড়ে অভিযোগে গলায় বলে উঠল, আচ্ছা বৌদি, সেই তুমি না খেয়ে বসে আছ ! ব দিন বলেছি—আমার দেরি হলে খেয়ে নেবে।

বাঁশরি ওর পাতের দিকে জলের গ্লাসটা ঠেলে দিয়ে বলল, তোমার হুকুম সব মানতে হবে এমন কোনো বণ্ড লিখে দিয়েছি ?

বড় সাহেবেরই পি, এ,। ছোট সাহেবের কী ধার ধারি ?

উঃ। তোমার কথার 'ধার'-এর সামনে কে দাঁড়াবে ! বেচারী বড় সা কী করে যে ম্যানেজ করে চলেন !

ম্যানেজ। কে কাকে ম্যানেজ করে হে !

বাঁশরি হাত এবং মুখ চালাতে চালাতে বলে, যাক, সেই বেওয়ারিশ মহি টির খবর কী ? যেখানে 'পড়ে' বসে আছ।

ধ্যাৎ। কী যে বলো। সে এক অন্য ধাতুর মেয়ে। ওসব 'পড়াপড়ি'

ধারে-কাছেও দাঁড়াবে না।

কী? তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হয় না? চালাকি? যাও না ও বাড়িতে প্রায় প্রায়?

বিনায়ক বলল, যাই না এ কথা তো বলছি না। তবে গেলেই যে দেখা হয় তার নিশ্চয়তা নেই। এখন তো শুনছি, নতুন করে পড়াশুনো ধরবার জন্যে নিয়মিত বৃটিশ কাউন্সিলে, না ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে কোথাও যায়। আমি তো যেতে বাধ্য হই সোলজারের মা বেচারীর জন্যে। ভদ্রমহিলা এত আকুলতা করেন। আমি গেলেই এমন ইয়ে হন, যেন ওনার ছেলেকেই দেখলেন, পেলেন।

আহা।

বাঁশরি বলল, সত্যি, ভাবতে এত খারাপ লাগে! ভারী শোচনীয় ব্যাপার। কোনো সন্ধান নেই?

কই আর?

এখন বোধহয় খোঁজাখুঁজি ঝিমিয়েও গেছে। মানুষ কত আর কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে, টি. ভি-তে ঘোষণা করবে?

না চালিয়ে যাচ্ছেন তলে তলে। সোলজারের এক পুলিশ অফিসার মামা আছেন, তিনি নাকি বলেন তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন।

পুলিশ অফিসার! হুঁঃ। পুলিশের কথা ছাড়ো। মেয়েটা বোধহয় আশা ছেড়ে দিয়েছে।

কেন? কে বলল?

না, আবার পড়াশুনো ধরা—

বাঃ। সেটা কোনো প্রমাণ নাকি? কী করবে বলো তো বেচারী সারাদিন? শুধু শ্বশুর শাশুড়ী দ্যাওর-ননদের নৈবিদ্যির আয়োজন, আর ঘরসংসারী কাজ নিয়ে পড়ে থাকা। মানে হয়?

আমিও তো তাই ভাবি। এ যুগে একটা শিক্ষিত আর তাজা মেয়ের জীবন এভাবে নষ্ট হবার কথা নয়? এ কি সেকাল যে বারো বছরে বিধবা হলো তো চিরকালের মতন জীবন খতম।

বিনায়ক বলল, এই মেয়েটিকে বোঝা যায় না। মনে হয় কল্পনার জগৎ-বিহারিণী!

বাঁশরি মাছের ল্যাজার কাঁটা চুষতে চুষতে একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলে, সেই জন্যেই তো ভাবি, মেয়েটাকে যদি তোমার প্রেমে পড়িয়ে ফেলতে পারো তো বেচারী আবার জীবন পায়।

বৌদি। উঃ। একখানা ব্রেন বটে! যদিও প্রেমে পড়িয়ে নিতে পারি। ওটা বোধহয় মেয়েদের গুণ হে বাঁশরিবালা। পুরুষের সাধ্য নেই কাউকে প্রেমে পড়িয়ে নিতে পারে। ওটা মেয়েদেরই একচেটে।

বটে নাকি? মেয়েদের সব গুণপণা বুঝে ফেলেছ?

তা ফেলেছি বলতে পারো। সেই যে তোমরা কী বলো 'হাঁড়ির একটা ভাত নাকি! এও তাই। দাদাকে দেখলেই মালুম। দাদার মতন অমন গোবেচারা লোক—

হ্যাঁ হে মশাই! সবাই ওইরকম। তোমার দাদাও ভাবে তার ছোট ভাইটি একখানি শিশুমাত্র।

তা হলে সেটাই বুঝিয়ে রেখেছ হে ম্যাডাম। দাদা তো তোমার চোখেই বিশ্ব দেখে!

তা আর নয়। দেখায় ওইরকম। তালে তাল দিয়ে না চলতে পারলেই এই ম্যাডামকে চোখে সর্ষেফুল দেখান। বিশ্বাস করবে, একদিন বলে ফেলেছিলাম, তোমার এই বাউণ্ডুলে ভাইটির ম্যাও সামলানো সোজা নয়। একটা বৌ এনে দেবার চেষ্টা করো তো—। তো সঙ্গে সঙ্গে মুখটা বুলডগের মতো করে বলল, সেটা তো সহজে হবে না। বরং একটা রান্নার লোকের চেষ্টা দেখছি, যাতে তোমার দায় কমে। বোঝো? বোঝো আমার মহিমা।

বুঝলাম। আহা। বেচারা!

বলে হো হো করে হেসে ওঠে বিনায়ক।

খেতে বসে খাওয়ার পর হাত শুকিয়ে ঝামা। গল্প চালিয়ে যায় দুজনে। এটাই নাকি আড্ডার প্রকৃষ্ট সময়।

আবার কথা প্রসঙ্গে বাঁশরি বলে, তবু যাই বলো ভাই, ওই পরম-সুন্দরী

ছেলেমানুষ মেয়েটার জন্যে আমার ভীষণ মন খারাপ লাগে। ওর ভবিষ্যৎ কী? যা শুনলাম, হিসেব করে দেখেছি, বিয়ের দিন থেকে নিখোঁজ হওয়ার মধ্যবর্তী সময় মাত্র দশটা দিন। তাও তো যত সব হাবিজাবি অনুষ্ঠানের সময় একশো লোকের ভিড়ের মধ্যে। এইটুকুর দায়ে মেয়েটার জীবন বরবাদ হয়ে যাবে?

কী জানি! হতভাগাটা এসে যেতেও তো পারে।

এসে যাবার হলে কিছু একটা খবর মিলত! আমার তো মনে হয়—

কী? আর কারুকে নিয়ে ভেগেছে?

ধ্যাৎ। তা হলে আর বিয়ে করে মরবে কেন? মনে হয়—না বাবা থাক বলব না।

বলো না।

আহা, রাগ করার কিছু নেই। বলছি—ওর কোনো শত্রুটত্রু ছিল না তো?

থাকার তো কথা নয়। বন্ধুমহলে তো ওর নাম ছিল 'অজাত শত্রু' 'ঋষ্যশৃঙ্গমুনি' এইসব। তবে আমি তো অনেক দিন ছিলাম না।

এর মধ্যে কোনো পার্টি-ফার্টিতে ভিড়ে বসেনি তো?

মেয়েদের মনের গতি দেখেছি একরকমই। ওর বৌ ওই অনন্যাও ঠিক এই প্রশ্নটিই করেছিল একদিন। তো উত্তর দেওয়া আর হলো না স্রেফ গোয়েন্দা দপ্তরের পাহারা। একটু কাছাকছি দেখলেই ঝপ করে কেউ না কেউ চলে আসবে। মা-বাপ ভাই-বোন যে কেউ হোক।

কথাটা সত্যি।

ভালো করে একবার জিগ্যেস করার সুযোগ পাচ্ছে না অনন্যা, আচ্ছা বিনায়কবাবুর বন্ধু কি পলিটিক্স করতেন?

না, সেই নিভৃতিটুকু জোটে না।

অতএব?

অতএব বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। ঝপ করে একবার বলে নেওয়া, উত্তরটা জানা দরকার। কোথাও একটু চলে আসুন না।

সুনন্দা নারকেল নাড়ু বানাচ্ছে।

কার জন্যে ?

আর কার জন্যে ? সেই ছেলেটার জন্যে। যে ছেলেটাকে দেখলেই বুকটা উথলে ওঠে। মনে হয় সোলজারই বুঝি এসে দাঁড়াল। অথচ চেহারাতে তো আকাশ পাতাল তফাৎ।

সোলজারের মতো সেই দীর্ঘোন্নত গৌরবরণ মূর্তি কটা ছেলের আছে ? পল্টনই তো একদম অন্যরকম।

সোলজার বাপের আড়া পেয়েছিল আর ঠাকুমার রং। তার মানে ছেলেটা জন্মানোর আগে ভারী চালাক ছিল।

কিন্তু তারপর ?

বোকা হয়ে গেল ! বোকা না হলে এই আদরের সিংহাসন থেকে ছিটকে পালিয়ে যায় ?

বুবু দেখে মুখ বাঁকিয়ে বলে গেল, নারকেল নাড়ু বানাচ্ছ বিনায়কবাবুর জন্যে ? ওটা ভদ্রলোকের হাতে দেবার জিনিস ?

সুনন্দা বললেন, তোর সবতাতে এত নজর কেন বল তো ? আমি তো ওকে ভদ্রলোক বলে ভেবে দিতে যাব না। সে ভালবাসত—

থেমে গেলেন।

এই একটা নতুন উপসর্গ আবার হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ছেলের কথা উঠলেই চোখে জল, বাক্যরুদ্ধ—এটা ইদানীং যেন থিতিয়ে এসেছিল। বিনায়ক নামের ওই ছেলেটাকে দেখে পর্যন্ত যেন পুরনো ক্ষত আবার তীব্র হয়ে উঠেছে।

দাদা ভালবাসত বলে তুমি যাকে তাকে সেইসব খাওয়াতে বসো। এর কী মানে বুঝি না।

বুবু অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে চলে যায়। তবে যেতে যেতে জনান্তিকে বলে যায়, ওদিকে আরো একজনেরও তো দেখছি একই দশা।

পল্টন ঘরের মধ্যে ছিল।

মাতা-কন্যার বাক্যালাপ তার কানে এসে পৌঁছেছে।

বুবু এসে ঢুকল। বলল, ও, তুই বাড়ি আছিস ?

পল্টন বলে উঠল, আছি। তবে কতদিন থাকা যাবে জানি না। বাড়িটা তো ক্রমেই চিড়িয়াখানা হয়ে উঠছে। ঘরে ঘরে এক একটি আজব প্রাণী।

বুবু ওর কাছে বসে পড়ে বলল, মা জননীই এটি করে তুললেন। ওই বিনায়ককে মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়ে বারে বারে আসবার সুযোগ করে দেওয়া। আর এমন অ্যাবসার্ড সব চিন্তা! দাদা যা যা খেতে ভালবাসত, সেই সব তাকে খাওয়াতে হবে। মানে আছে কিছু?

এ বাড়িতে আজকাল আর মানেওলা কোনো কাজই তো হতে দেখি না। বৌদিটা মোটামুটি নর্ম্যাল ছিল, সেও দেখছি অ্যাবনর্ম্যাল হয়ে উঠছে। ওই বিনায়ককে দেখলেই যেন—

এ মা! তুইও লক্ষ্য করেছিস?

লক্ষ্য করতে হয় না, লক্ষ্যে পড়ে যায়।

সত্যি। খুব খারাপ লাগে। সর্বদাই যেন চেষ্টা আমাদের আড়ালে কিছু কথা বলার।

পল্টন মাথাটা ঝাঁকাল।

অথচ আগে বাড়িতে আত্মীয়-টাত্মীয় এলেও সহজে কথা বলত না।

সে এখনো বলে না!

পল্টন বলল, মহাশয় ব্যক্তিটির কোনো অদৃশ্য পাওয়ার আছে মনে হয় তোর?

অদৃশ্য পাওয়ার! মানে?

মানে আর কি—ইয়ে—

বুঝেছি। বলছিস কোনো তুকতাক জানে, তাই তো?

তা ঠিক নয়। আসলে ঝোপ বুঝে কোপ মারার মতো, তাক বুঝে নাক গলাতে জানাটাই বোধহয় তুকতাক।

বুবু বলল, প্রথমটা কিন্তু তুইও বাবা খুব বিভোর হয়েছিলি। বিদেশের গল্প শোনার জন্যে—

পল্টন বলল, অস্বীকার করছি না। আর এও বলব, আসলে লোকটা যে খুব খারাপ তা বলব না। ওকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটাই হয়েছে খারাপ।

বাবা পর্যন্ত বিনায়ক এসেছে বলে উৎফুল্ল হয়। এটাই আশ্চর্য! আর অন্য কোনো বাড়িতে আদর পেলে কে না ইয়ে হয়?

হয়? তুই হবি?

আমার কথা বাদ দে। বাড়ির লোক আদর জানাতে এলেই আমার মেজাজ চড়ে যায়। তবে ব্যাপারটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তাই ভাবনা। ইচ্ছে করলে আমি অবশ্য এসব স্টপ করে দিতে পারি।

কী করে?

পল্টন হেসে বলে, ধোলাইয়ের ভয় দেখিয়ে।

ধ্যাৎ! কী যে বলিস! দোষটা তো ওর নয়, নিজেদেরই। তবে—বলে একটু থেমে একটু রহস্যময় হাসি হাসে বুবু।

তবেটা কী?

পল্টন ভুরু কোঁচকাল।

বুবু বলল, ব্যাপারটাকে আমি ইচ্ছে করলে নিজের হাতে তুলে নিয়ে মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারি।

তার মানে?

বুবু আরো একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলে, ও তুই বুঝবি না।

তারপর সামলে নিয়ে বলে, আসলে বৌদিটা একদিন বলেছিল, তোমার দাদা কী ধরনের বন্ধুর সঙ্গে মিশত, কোনো পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে যোগ ছিল কিনা, এসব হয়তো বিনায়কবাবুর কাছ থেকে জানা যায়।

সেরকম হলে, আমার থেকে বেশী কেউ জানত না। বলে পল্টন খালি হাতে ব্যায়াম শুরু করে দেয়। এই এক মুদ্রাদোষ তার।

নারকেল নাড়ুটা একটা আইটেম হলেও সেটাই মুখ্য নয়। ষোড়শোপচার সাজানো হয়।

সুনন্দা বলেন, চা-টা ততক্ষণ দিয়ে এসো বৌমা, আমি এই ঘুগনিটা একটু গরম করে সব গুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ও তো চা-টাই দেখি আগে খায়।

টেবিলের সামনে বসেছিল বিনায়ক। অদূরে পরেশ। মনোজিৎ তাকে কোনো কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন।

অনন্যা চায়ের কাপ দুটো টেবিলে বসিয়ে বাতাসে মিলোনো গলায় বলল, একটা জায়গা ঠিক করুন। আর সময়টা।

তারপর সরে এসে বলল, বাবা, আপনার চা!

বিনায়ক জানে, অনন্যা তার কাছ থেকে তার হারিয়ে যাওয়া স্বামীর অতীতকে খুঁজে পেতে চায়। অথচ সেই চাওয়াটাকে পাওয়ার সীমায় আনতে বাধার শেষ নেই। তাই বোধহয় মরিয়া হয়েই—

কিন্তু বিনায়ক ভেবে পেল না, কোথায় কখন সে সুবিধে হতে পারবে। জায়গা ঠিক করবে সে? কোন্ জায়গা?

আর কিছু বলতে পারার আগেই সুনন্দা এসে গেলেন খাবারের থালা হাতে নিয়ে।···থালাই। প্লেট নয়, রেকাবি নয়।

খাবারের বহর দেখে বিনায়ক প্রায় লাফিয়ে ওঠে।

নাঃ মাসিমা, আপনি দেখছি আমার আপনার কাছে আসাটা বন্ধ করতে চান।

সুনন্দা কাতর ভঙ্গীতে বলেন, কেন বাবা? এ কথা বলছ কেন?

আপনিই বলাচ্ছেন। যখনি আসব তখনি এই কাণ্ড! এত খেতে পারে মানুষ?

সুনন্দা যেন আপোসের গলায় বলেন, এ আবার 'এত' কী বাবা? ছেলে-মানুষ! এই তো খাবার বয়েস বাপু!

না না, অসম্ভব। অর্ধেক তুলুন।

বাঃ। তুলব আবার কী? এই তো মোটে চারটে কচুরি, আর—

আর একবাটি আলুর দম, গোটা ছয়েক চপ, গোটা আষ্টেক মিষ্টি আর—

আটটা আবার কোথা? মোটে তো ছটা।

ও, ছটা। সাইজগুলো তো ডবল। তার ওপর এই আধ ডজন নারকেল নাড়ু। কী পেয়েছেন আমায় বলুন তো?

সুনন্দা ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলেন, আচ্ছা, এর মধ্যে যা তোমার অপছন্দ, তা না হয় একটু কমাও। বৌমা, একখানা ডিশ আনো তো।

সুনন্দার মুখ দেখে মায়াও হয়।

তাই বিনায়ক বলে ? এর কোনোটাই আমার অপছন্দ নয়। বিশেষ করে আপনার হাতে তৈরী, আপত্তি এর ওজনে। কই পল্টনকে ডাকুন না। শেয়ার করুক কিছুটা!

সুনন্দা বললেন, সে বাড়ি থাকলে তো আগেই ডাকতাম। সেই থেকে ভাবছি বোধহয় এসে পড়বে।

কথাটা মিথ্যা নয়। ভাবছিলেন বৈকি সুনন্দা, ওই বুঝি এসে পড়ে পল্টন। কিন্তু সে কী প্রত্যাশায় ? না আশঙ্কায় ?

পল্টনের সামনে এত ফ্রী হয়ে এত বড় থালাটা কি সাজিয়ে আনতে পারতেন ? অথচ প্রাণের মধ্যে সেই বাসনা। খোকা যা যা ভালবাসত তার সবই এই ছেলেটাকে খাওয়াতে ইচ্ছে হয়।

কেন ?

তা নিজেই জানেন না সুনন্দা।

মনোজিৎ পরেশকে একটা পাম্প সারাইয়ের মিস্ত্রিকে ডাকবার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। পাম্পটা একটু গড়বড় করছে।

পরেশ চলে যেতেই সরে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললেন, কিসের তর্কাতর্কি মাসিমার সঙ্গে ?

বিনায়ক থালাটার দিকে চোখ ফেলে বলল, অনুমান করুন।

মনোজিৎ একটু হেসে ফেললেন।

তারপর বললেন, আচ্ছা যা পারো খাও।

আপনি খাবেন না ?

আমি ? এখন ? নাঃ, যা খাব সেই রাত্রে।

সেই তো—

সুনন্দা অভিমান আর অভিযোগের গলায় বলে ওঠেন, কাউকে কিছু খাওয়াতে পাই ? ছেলেটি মেয়েটি মিষ্টি ছোঁন না, তোমার মেসোমশাইটির ভাজা খাবার দেখলেই ভয় করে, আর বৌমার কথা তো বাদই দাও।··· যাক বাবা, তুমি খাও তো।···ও কী! সবই যে তুলছ। নাঃ বাপ, এরকম করলে—

বিনায়ক খেতে খেতে বলে, খাবারটা ফার্স্ট ক্লাশ হয়েছে বলাও তো বিপদ।
বললেই বলবেন, তবে আর দুটো নাও।
মনোজিৎ হেসে ওঠেন।
মাসিমাটিকে বেশ চিনে ফেলেছ।
এ বাড়িতে এ ভাবে হেসে ওঠাটা তো এখন প্রায় দুর্লভ। বাতাস সর্বদাই ভারী। তবু এই একটা তুচ্ছ কারণকে উপলক্ষ করে একটু হাসির হাওয়া উঠল। হালকা হলো পরিবেশ।
এই জন্যেই কি সুনন্দা ওই ছেলেটাকে এত আঁকড়ান? ওকে উপলক্ষ করেই আবার রান্নাঘরে ঘোরাঘুরি করতে পান, চিরঅভ্যস্ত কাজগুলো করতে পান, এতে কি তাঁর মনের দম-আটকানো ভাবটি কাটে কিছুটা? কিন্তু কথা হচ্ছে, তা বলে ওর জন্যে আর কারো আটকানো দম হালকা হয়ে বাঁচতে চাইবে নাকি? এটা তো ঠিক নয়! অথচ ওই বেঠিক ব্যাপার-টাই যেন কেমন হঠাৎ হঠাৎ ধরা পড়ছে।
কাজেই ছেলেটা চলে যাবার পর সুনন্দা বলে উঠলেন, বিনায়কের সঙ্গে তোমার কিসের কথা বৌমা?
অনন্যা কি প্রস্তুতই ছিল এ প্রশ্নের জন্যে?
কি জানি।
তবে চট করে কোনো উত্তর দিলো না। শুধু প্রশ্নকারিণীর মুখের দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টিতেও যেন প্রশ্নই ছিল।
অর্থাৎ কী বলতে চাইছেন আপনি?
সুনন্দা বললেন, তখন চুপিচুপি কী যেন বলছিলেন ওকে! ও একটা বাইরের ছেলে ওর সঙ্গে চুপিচুপি কথার কী আছে?
সহসা সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল অনন্যা। মুখ তুলে স্পষ্ট গলায় বলল, ঠিকই বলেছেন মা, চুপিচাপির কিছু নেই। খোলাখুলিই বলা ভালো। আমি বিনায়কবাবুর কাছ থেকে আপনার ছেলের অতীতটাকে একটু জানতে চাই। কিছুই তো জানি না।
সুনন্দা চমকে যান।

সুনন্দা কোনোদিন অনন্যার কণ্ঠে এমন দৃঢ়স্বর শোনেননি। ওঃ। আস্তে আস্তে স্বরূপ বেরুচ্ছে।

অতএব সুনন্দা বেজারও হন।

বলেন, 'তার' বিষয় আবার জানবার কী আছে? হীরের টুকরো ছেলে।

অনন্যা একটু হাসে। বলে, সে কথা তো অস্বীকার করছি না মা। শুধু বলছি—আপনারা যা দেখেছেন সে তো শুধু ঘরের মানুষটিকে। বাইরের জগতেও তো তার একটা জীবন ছিল। সে সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে—

সুনন্দা বলেন, তা-সে কথা তো আমরাই জিগ্যেস করতে পারি! তোমার আবার আলাদা করে—

অনন্যা একটু হাসে।

বলে, আমারই কিছু জানতে চাইবার অধিকার নেই মা?

সুনন্দা চুপ করে যান।

সুনন্দা যেন হঠাৎ একটা অচেনা মানুষকে দেখতে পান।

সুনন্দা আরো বেজার গলায় বলেন, থাকবে না কেন? তোমার তো ষোলো আনাই অধিকার।

চলে যান ঘরের মধ্যে।

মনোজিতের কাছে বসে পড়ে চাপা গলায় বলেন, খাল কেটে কুমীর আনলাম নাকি গো? বৌমার যা ভাব দেখলাম—

মনোজিৎ বললেন, সেটা বললে, সেটা বললে খুব ভুল হবে না। বললে রাগ করবে, তবে বাড়াবাড়ি একটু হয়েছে বৈকি। হয়ে চলেছে। ওই বেচারী মেয়েটার দিক থেকে ভাবো। বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী নিখোঁজ। তার জন্যে ওকে এবং ওর মা-বাপকেও কম হ্যানস্থা করা হয়নি। লজ্জা-অপমান থানা-পুলিশ বললেই চলে। সেই ঝড়ের মুখ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ও যে এখানে এভাবে রয়েছে সেটা ওর পক্ষে—

সুনন্দার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। স্বর গম্ভীরতর।

বুঝেছি। ষোলো আনা সহানুভূতি তোমার ওর ওপরই। আর আমার প্রাণটা যে রাতদিন—

উঠে এলেন।

মনোজিৎ জানেন এখন সুনন্দা ছাদে উঠে গিয়ে কাঁদবেন।

কিছু করার নেই!

কিন্তু বিনায়ক আর আসছে কই?

ও কি ভয় পেয়ে গেল? নাকি এ বাড়ির কেউ ওকে কোনভোবে ভয় পাইয়ে দিলো?

অনন্যা বুঝতে পারে না।

অনন্যা লাইব্রেরীতে যায় আসে কিন্তু কোনো 'দৈবই' তাকে সে সুরাহা করে দিচ্ছে না।

কিন্তু মানুষই 'দৈব' হয়ে দেখা দেয়।

অথবা সুনন্দার অভিযোগই সত্য। মনোজিৎ নামক ব্যক্তিটির ষোলো আনা সহানুভূতি এই 'অনন্যা' নামের মেয়েটার ওপর। যে মেয়েটা নিতান্তই ভাগ্যবিপর্যয়ে মনোজিতের পুত্রবধূর পরিচয় বহন করে এ বাড়িতে বাস করছে।

মনোজিতের মাঝে মাঝে মনে হয়, পুরাণের গল্পে-টল্পে যেমন শোনা যায় কোনো দেবকন্যা শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্তে এসে মানুষের ঘরে দাস্যবৃত্তি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তার তো কিছুটা মেয়াদ থাকে। হয়তো এক বছর, হয়তো বা পাঁচ পাঁচটা বছরও। তবু অভিশাপের কাল পার হয়ে গেলেই সে আবার ফিরে যায় তার নিজস্ব ভূমিতে। কিন্তু এই মেয়েটা! এর শাপমুক্তি ঘটবে কবে?

মনোজিৎ ওর জন্যে ভাবেন।

ভাবেন, ওর নিরুপায়তার অথবা ওর নিবুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে চলেছি আমরা। নির্বোধ বৈকি। না হলে এখানে পড়ে থাকতে চায়, কেন? ও তো ওর পিতৃগৃহে ফিরে গিয়ে অন্তত আদরের জীবনে থাকতে পারে। হয়তো সেভাবে থাকতে থাকতে ও আবার 'নতুন জীবন' গড়ে তুলতে পারে। মাত্র সপ্তাহকাল পর এর 'স্বামী'টি যদি চিরতরে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, ও কি সেই বিবাহিত জীবনের জের টেনে জীবন কাটিয়ে দেবে?

সেকালের বালবিধবাদের মতো ?

একটা জটিল চিন্তাবৃত্তের আবর্তে পাক খান মনোজিৎ। আর সেই জটিল চিন্তার প্রেরণায় যখন ভাবতে থাকেন ওই 'বিনায়ক' নামের ছেলেটার সঙ্গে যোগাযোগের দরকার আছে তাঁর, ঠিক তখনই এক অভাবিত দৃশ্যের মুখোমুখি হন মনোজিৎ।

কলেজ স্ট্রীটের একটা বইয়ের দোকান থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে বিনায়ক আর বুবু। বুবুর হাতে একটা বইয়ের প্যাকেট !

মনোজিৎ ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হবার ভয়ে সরে এলেন। দৃশ্যটা অভাবিত বৈকি। বুবুর ধরন-ধারণ দেখে তো মনে হতো, ওই বিনায়ক নামের ছেলে-টাকে ও মোটেই 'অ্যালাউ' করে না।

তাহলে ?

সেটা কী ভান ?

আর বিনায়ক ?

তার সম্পর্কে যে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল মনোজিতের ? সেটাও অমূলক ?

মনোজিৎ যেন একটু হতাশ হলেন।

মনোজিৎ যে একটা জটিল চিন্তার আবর্তে পাক খাচ্ছিলেন, হঠাৎ যেন সেই আবর্তটা স্থির হয়ে গেল, নিশ্চুপ মেরে গেল।

আচ্ছা বুবু যখন ফিরবে, তখন কি সে বলে উঠবে কলেজ স্ট্রীটে একটা বইয়ের দোকানে হঠাৎ বিনায়কের সঙ্গে দেখা !

হ্যাঁ, 'বিনায়ক'।

সুনন্দা বেশ কয়েকবার বলেছেন, 'দাদার বন্ধু' নাম করে বলিস কেন ? 'বিনায়কদা' বলতে হয় না ?

বুবু অগ্রাহ্য ভরে বলেছে, আমার অমন যাকে তাকে যখন তখন 'দাদা কাকা মামা' ডাক আসে না।

তা না আসুক, নাম করেই বলুক।

আজকের এই দেখা হওয়াটা কি চেপে যাবে ?

নাকি এটা কেবলমাত্র আজকেই নয়?

বুবু বাড়ি ফিরেই যে বাবার ঘরে এসে দেখা দেবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। দিতেও পারে, নাও পারে।

হয়তো বাড়ি ফিরেই মায়ের সঙ্গে খুনসুটি লাগাতে শুরু করতে পারে, অথবা পল্টনের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা, না হয় বৌদির সঙ্গে বেড়িয়ে আসার অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

কিছু না হোক, কাজের মেয়েটাকে ক্ষ্যাপাতে বসতেও পারে। অতএব উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকলেন মনোজিৎ। কোন্ ছুতোয় ডাকবেন ওকে?

তা মনোজিতের বাসনার জয় হলো।

বাড়ি ফিরেই বুবু বাবার ঘরে এসে ঢুকল। বলে উঠল, এ কী! এখনো আলো জ্বালোনি যে? দিনের আলোটা যে শেষ হয়ে গেছে খেয়াল হয়নি।

আলোটা জ্বেলে দিলো।

মনোজিৎ একটু হাসলেন।

বললেন, দিনের আলো যে শেষ হয়ে গেছে সেইটা খেয়ালে এসে গেছে রে বুবু। তাই ভাবতে ভাবতে আর উঠে আলো জ্বালতে ইচ্ছে হয়নি।

ও। তার মানে বুড়ো হয়ে যাচ্ছ? তাই ভেবে আরও বুড়ো হচ্ছো? থাক ওসব পচা কথা। বলছি, বাবা এই যে আমরা জন্মেছি, আমাদের জন্ম-সময়টা ঠিকমতো লেখা আছে?

কী মুশকিল। হঠাৎ এ প্রশ্ন?

সে প্রশ্ন থাক। তুমি বলোই না।

মনোজিৎ বললেন, তা থাকবে না?

আছে?

আছে বৈকি।

কার কাছে? তোমার কাছে? নাকি মাতৃদেবীর কাছে?

মনোজিৎ হেসে বলেন, আমার কাছেই আছে।

বাঁচলাম বাবা। তার মানে সহজপ্রাপ্য অবস্থা। মায়ের কাছে থাকলে—মা লেপের চালি থেকে কয়লার বস্তা পর্যন্ত তোলপাড় করে খুঁজতে বসবে।

বাঃ মায়ের সম্পর্কে তো খুব ভালো সার্টিফিকেট। তা হঠাৎ 'জন্মসময়ের' খোঁজ যে?

ভীষণ দরকার।

বুবু এখন পিছনে রাখা হাতটা সামনে এনে একখানা বই বার করে বাবার টেবিলে ধরে দিয়ে বলে, একটা বই কিনে আনলাম। যে কারো রাশি আর নক্ষত্র জানতে পারলেই তার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব জেনে ফেলা যাবে। তা জন্মসময় থেকেই তো ওইসব জানা যায়। তাই না?

বইখানার দিকে তাকিয়ে দেখলেন মনোজিৎ, বেশ গর্জাস মলাটে মোড়া বইটি।

নাম 'সহজ পদ্ধতিতে ভৃগু বিচার'।

মনোজিৎ অবাক।

মনোজিৎ বলেও ফেললেন, কি রে! এ যে ভূতের মুখে রামনাম। তুই এসব বিশ্বাস করিস?

বুবু বলল, করি কি করি না খেয়াল করিনি কোনোদিন। হঠাৎ বইটা দোকানে দেখে—

একটু ঢোঁক গিলে বলে, আসলে মার কথা ভেবেই—হয়ে হঠাৎ যদি সত্যিই কিছু মিলে-টিলে গিয়ে দাদার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়। জগতে ক[illegible] ব্যাপার আছে কে জানে!

বুবুর মুখে এরকম কথা! সত্যিই—ভূতের মুখে রামনামের মতোই। ও[illegible] এবং ওর ছোড়দা পল্টনেরও কথাবার্তা শুনে তো মনে হয় জগতের সব কিছুরই 'শেষ কথা' ওরা জেনে-বুঝে বসে আছে। তার ওপর আর কো[illegible] কথা থাকতে পারে না

মনোজিৎ উঠলেন।

দেয়াল ধারে খুব ছোট মাপের একটা গডরেজের লকার রাখা আছে। ত[illegible] মধ্যে মনোজিতের যত সব দরকারি কাগজপত্র।

তা সে বাড়ির দলিল থেকে চশমার পাওয়ারের রিপোর্ট, গহনার দোকা[illegible] রসিদ, ইনসিয়োরেন্সের প্রমাণপত্র, টেলিফোনের বিল, কী নয়? স[illegible]

সুবিন্যস্তভাবে রাখা। ছেলেমেয়ের জন্মপত্রিকাও এমন-ভাবে রাখা আছে যা খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না।

বললেন, শুধু দাদারটাই চাই ? নাকি তোমারটাও ?

ভাবলেন, হয়তো সেটাই আসল উদ্দেশ্য। হয়তো নিজের জীবনে একটা নতুন মোড় এসে দেখা গিয়েছে বলেই—যা নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামায়নি তাই নিয়ে উল্টে দেখতে চাইছে।

'প্রেম' 'প্রণয়ভঙ্গ' 'বিয়ে' 'কর্মজীবন' এসব তো ওই ভৃগু মহাশয়ের অঙ্ক-শাস্ত্রের হিসেবের খাতায় আছে শোনা যায়। মনোজিৎও কোনোদিন ও নিয়ে মাথা ঘামাননি।

সোলজার-এর অকস্মাৎ নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে সুনন্দা কত কত ঠাকুর মন্দিরে কত কত জ্যোতিষীর কাছে, 'দেবতার ভর' পাওয়া অপ্রাকৃত ব্যাপারের কাছেও ছুটে ছুটে গিয়েছেন। মনোজিৎ কখনো হয়তো সঙ্গেও গিয়েছেন, কিন্তু কদাচ তেমন প্রত্যাশা করেননি। আবার বেচারী সুনন্দা যদি কোনো নতুন প্রত্যাশায় ছুটেছেন, বাধা দেননি, নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেননি।

তবে আজ বুবুর ব্যাপারটা কৌতুকের চোখেই দেখলাম। বুবু বলল, আমারটা? তা দিতে পারো। দেখা যাক 'ভৃগু মহারাজ'-এর কিছু কথা মেলে কিনা। তবে দাদাটার জন্যেই—

একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

বলল, সত্যি! কোথায় যে গেল! কী যে হলো! মা যা বলে ঠিক সেই রকমই। কর্পূরের মতোই—

হ্যাঁ, প্রথম প্রথম এই কথাই বলে বলে হাহাকার করেছেন সুনন্দা, 'আমার প্রাণভরা বুকভরা জলজ্যান্ত ছেলেটা কর্পূরের মতো উবে গেল গো—'

কিন্তু সত্যি, কোথায় গেল সেই তার প্রাণভরা বুকভরা ছেলেটা ? খসে পড়া নক্ষত্রের মতো অকস্মাৎ কোনো অন্ধকারে তলিয়ে গেল!

তো সেখানে যদি আলোকপাত করতে হয় তো ফিরে যেতে হয় আড়াই বছর আগের সেই রাতটিতে!

হ্যা, রাতেই।

যে রাতে সোলজার নামের সেই ছেলেটা, পোশাকী নাম যার অভিজিৎ, সে তার সদ্য বিবাহের সূত্রে লব্ধ অতি আদর অভ্যর্থনার শ্বশুরবাড়ি থেকে রাতের গাড়িতে চেপে কলকাতায় ফিরতে স্টেশনে এসেছে।

উড়িষ্যার একটি বিখ্যাত শহর।

স্টেশনে ভিড় ভাট্টার অভাব নেই। তবু তার মধ্যেই বিবেচক শ্বশুর-শাশুড়ী স্টেশনে তুলে দিতে এসেছেন নবোঢ়া কন্যাটিকেও সঙ্গে নিয়ে।

যদিও সেই কন্যারও আর এক সপ্তাহ মাত্র পরেই পতিগৃহে যাত্রার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে।

অষ্টমঙ্গলায় এসে আবার তখুনি শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়া এটা নাকি এঁদের পারিবারিক প্রথার বিরোধী।···কত পরিবারেই যে কত রকম রীতি-নিয়ম!

কারুদের তো আবার জোড়েই ফেরা 'কম্পালসারি'!

সারা দুপুর অভিজিৎ তার নবপরিণীতার কাছে এই নিয়ে আক্ষেপ অভিযোগ করেছে।

বলেছে, ইচ্ছে হচ্ছে ওসব বাজে মার্কা রীতি-নিয়মের ধার না ধেরে তোমায় নিয়ে কেটে পড়ি!

বলেছিল, ওই তুচ্ছ নিয়মের বাধাটা উড়িয়ে দেওয়া যাবে ভেবে আমি আজকের এই ফেরার জন্যে কত চেষ্টায় একটা ক্যুপে রিজার্ভ করে রেখে-ছিলাম তা জানো? আর এখন কিনা সেই একাই ফিরতে হচ্ছে।

বৌও এ সংবাদে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছিল, বাঃ! তুমি তো জানতে—

জানতাম। মানতে চাইছিলাম না। ভেবেছিলাম, কোনোরকমে ম্যানেজ করে ফেলতে পারব। তো শেষ অবধি সেই এলেম তো দেখানো গেল না। 'লজ্জা'ই মাথাটা খেয়ে দিলো। এখন ভাবছি—তোমার মা-বাবা যে রকম 'ইয়াং' আর প্রগতিশীল, আমিই যদি একবার চোখ-কান বুজে লজ্জার মাথাটা খেয়ে বলতে পারতাম, কাজ হয়ে যেত!

বৌ মনে মনে বলেছিল, আর আমার দিকটা কেমন হতো? আসার সময়

শাশুড়ী বলেছিলেন, যাদের যা নিয়ম সেটাই মেনে চলা ভালো। তবে ঠিক পরের রবিবারেই যেন তোমার বাবা তোমায় পৌঁছে দিয়ে যান। সে তো নিজের কানেই শুনেছ। এখন যদি আবার তোমার পিছু পিছু গিয়ে হাজির হই কেমনটি হবে! হয়তো ভাববেন বৌটা কী বেহায়া গো! হতে না হতেই এমন বরক্যাংলা হয়ে গেল যে পাঁচটা দিনও মা-বাপের কাছে থাকতে ইচ্ছে করল না?

আর তা নয়তো ভাববেন, আমার বাবাই ওই পৌঁছে দেবার দায়িত্বটা এড়াতে পত্রপাঠ মেয়েকে জামাইয়ের সঙ্গে ফেরৎ পাঠালেন।

দুটোই লজ্জার।

কিন্তু এসব তো মনের মধ্যেকার কথা। এ তো আর শুনতে পাবার ভয় নেই।

অতএব বৌ অভিমানের চোখে চেয়ে বলেছিল, সে কথা আর এখন বলে লাভ কী?

আমি একটা বুদ্ধু।

বৌয়ের কুসুম সুকুমার পেলব শরীরখানিকে প্রায় পিষে ফেলে এই স্বীকারোক্তিটি করেছিল বর আমি একটা বুদ্ধু।

তারপর কত, কত দিন রাত্রি সেই বৌটা মনে মনে মাথা খুঁড়েছে, আমি কেন লজ্জার মাথাটা খেলাম না সেদিন। কেন বলে উঠলাম না, আচ্ছা আমিই ম্যানেজ করছি। মাকে একবার বলে ফেলতে পারলেই হয়ে যেত। কিন্তু সেদিন পারেনি।

তাই স্টেশনে পৌঁছতে গিয়ে বরের হতাশ হতাশ মুখটা দেখে আর 'ক্যুপে' কামরার মনোরম দৃশ্যটি দেখে প্রাণ ফেটে গেলেও বাড়ি ফেরার সময় হেসে হেসে মাকে বলেছিল, বাবাঃ! মা, মেয়েটা রইল, তবু তুমি ওই আট দিনের জামাইয়ের জন্যে ফোঁস ফোঁস কাঁদতে শুরু করে দিলে? বাবা! দেখছ?

বাবা মেয়ের মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলেছিল, তোর মায়ের কথা কি বলছিস আমারই কান্না পাচ্ছে। বড় ভালো ছেলেটা রে!

তা সেই বড় ছেলেটার মনোবেদনা অনুভব করেই খুব সহৃদয় গলায় বলে-ছিলেন, তোমার মাকে বলো, আমি ঠিক এই রবিবারে নীনাকে নিয়ে গিয়ে হাজির হবো।

শুনে—

'বড্ড ভালো ছেলে'টি মনে মনে তার ইয়াং শ্বশুরটিকে উদ্দেশ করে বলে উঠেছিল, তবে তো আমার মাথা কিনবেন স্যার।…কেন, বললেই পারতেন আহা, একখানা বার্থ খালি যাবে? আর তুমি একা যাবে? তার থেকে নীনা তুই গাড়িতেই থেকে যা। অভিজিতের মাকে বেশ সারপ্রাইস দেওয়া হবে।

তা এসবই তো 'মনে মনে'।

নববিবাহিতরা এমন কত কথাই বলে মনে মনে।

অথবা শুধু নববিবাহিতরা নয়, মানুষ মাত্রেই! শিরায় প্রবাহিত রক্তপ্রবাহ আর মনের তলায় তলায় উচ্চারিত বাক্যপ্রবাহ ভাগ্যিস বাইরে বেরিয়ে পড়ে বসে না।

বসলে বিপদটা কেমন হতো!

ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত এদের 'একত্রে' থাকবার সুযোগ দিতে কর্তা-গিন্নী নেমে পড়েছিলেন। সব শেষে—গাড়ি নড়ে উঠতে ডাক দিয়েছিলেন, খুকু! এবার নেমে পড় রে।

'খুকু' নেমে গেছল।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল।

আর অভিজিৎ জেগে বসে একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করতে করতে বিগত কটি দিনরাত্রির সুখস্মৃতি রোমন্থন করে চলেছিল।

তারপর ভেবেছিল, নাঃ কালই একটা চিঠি লিখে ফেলতে হবে। লিখেই পোস্ট করলে আগামী শনিবারের আগে পেয়ে যাবে।

মনে মনে হিসেব করে দেখল, ডাকবিভাগ যদি কর্মতৎপর হয় তাহলে শনিবারের মধ্যে দুটো চিঠি পৌঁছনোও অসম্ভব নয়।

চিঠিতে কী লিখবে, কী সম্বোধন করবে, প্রেমপত্রটি যেন সেকেলে মার্কা

না হয়ে যায় এই সব ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় ঘুম এসে গিয়েছিল কে জানে!

হঠাৎ মাথার ওপর একটা ভারী হাতের স্পর্শ অনুভব করে চমকে ঘুম ভেঙে গেল। আর তাকিয়ে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল।

সামনে এক দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীই মনে হলো। কারণ তার গায়ে গেরুয়া রঙের ঢোলাহাতা পাঞ্জাবি এবং পরনে গেরুয়া লুঙ্গি অথবা দোপাট্টা করে পরা ধুতি। দুটোই মসৃণ, উজ্জ্বল। অর্থাৎ দামী সিল্কের। মাথায় ঘাড়-ছাড়ানো সুচারু বিন্যস্ত কোঁকড়া চুল।

জটাজুটধারী নয়, পরিষ্কার কামানো মুখ।

এক নজরে এতটাই দেখা হয়ে যাবার কারণ, এই আকস্মিক 'দর্শনাঘাতে' অভিজিৎ বেশ কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল।

দেখার আগে অবশ্য তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, কে? কে? তারপর নিষ্পলক।

সন্ন্যাসীও কিছুক্ষণ নিষ্পলকে তাকিয়ে থেকে একটু মধুর রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, 'কে'? চিনতে পারছেন না প্রভু? তোমার আশায় পথ চেয়ে চেয়ে আর ডেকে ডেকে যে অন্ধ হতে বসেছি গো। এত দিনে এলে!

অভিজিৎ ভয় পেল। মাঝরাত্তিরে চলন্ত ট্রেনে একটা পাগলের পাল্লায় পড়ল নাকি?

নাকি চোর-ডাকাত-গুণ্ডা? কত রকম ছদ্মবেশ থাকে তাদের।

মুহূর্তে চোখের সামনে থেকে একটা কালো পর্দা সরে গেল।

ঘড়িটা? বিয়ের আংটিটা? সঙ্গের অ্যাটাচিটা?

না, ঘড়িটা হাতেই রয়েছে। অ্যাটাচিটাও মাথার কাছে।··· আংটিটা? হীরে বসানো আংটিটা?···না, সেটা তো শ্বশুরবাড়ির বাথরুমে ফেলে এসেছে। নীনাকে বলেওছে চুপিচুপি। ফিরে গিয়ে তাড়াতাড়ি দেখে তুলে রাখতে। এখন আসতে বলল, আপনি বোধহয় ভুল করছেন। আমি—আমি মানে আমার নাম—

সন্ন্যাসী আরো মধুর হাসি হেসে বলে ওঠেন, তুমি কে তা কী তুমি এখন নিজেই জানো ঠাকুর ? তুমি এখনো ছদ্মরূপে নিজেই আচ্ছন্ন।…অনেক সাধনা করে তোমায় বৈকুণ্ঠ থেকে নামিয়ে এনেছি মর্ত্যের মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করতে। তবে আর তো ছদ্মরূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে চলবে না। এই যে এই ফুলটি ধরো! এইটি শুঁকলেই তোমার আসল কথা মনে পড়ে যাবে।

বলেই একটা বড় মাপের কী একটা শুকনো ফুল অভিজিতের নাকের নীচে প্রায় চেপে ধরল 'ভয়ঙ্কর সন্ন্যাসী'।

তারপর ?

তারপর যেন সম্মোহিতের মতো লোকটার পিছনে পিছনে নেমে গেল অভিজিৎ ?

চলন্ত ট্রেন থেকে ?

না ট্রেনটা তখন কোনো স্টেশনে থেমেছে।

অতঃপর যে একটা বিপরীতমুখী ট্রেনে চেপে বসেছিল অভিজিৎ সেটা শুধু আবছা মনে আছে।…আর কিছু মনে নেই!

একটা অলৌকিক রহস্য কাহিনীর নায়কের মতো অবলুপ্তি ঘটে গেল অভিজিৎ নামের এক সুকান্ত সুপুরুষ উচ্চশিক্ষিত সন্তবিবাহিত যুবকের!

অতঃপর তার কি জন্মান্তর ঘটল ?

কে বলে দেবে সে কথা ? ভৃগু ?

বিনায়ক বাড়ি ফিরতেই—

বাঁশরি তার স্বভাবসিদ্ধ প্রায় ছ্যাবলামির ভঙ্গীতে চোখ নাচিয়ে ঘাড় দুলিয়ে হেসে হেসে বলে, কী হে মহাপুরুষ, ডুবে ডুবে জল খেয়ে অনেক দূর এগিয়েছ দেখছি।

তাই নাকি ?

বিনায়ক পাখার স্পীডটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, তুমিও বুঝি ডুব সাঁতার মেরে ধাওয়া করে সেখানে পৌঁছে গেছলে ?

বাঁশরি অবশ্য এতে দমে না।

বলে, সবই কি আর নিজে গিয়ে দেখতে হয়? কত দিকে কত চোখ। তা নিখোঁজ বন্ধুটির বেওয়ারিশ বৌটাকে নিয়ে ঘুরছ তো খুব। গার্জেনরা অ্যালাউ করছে?

বন্ধুর বেওয়ারিশ বৌটাকে নিয়ে! হা অদৃষ্ট! এই তোমার 'চরে'দের চোখের মহিমা?

তার মানে?

মানে হচ্ছে—যাঁর সঙ্গে ঘুরে মরতে বাধ্য হচ্ছি, তিনি বন্ধুর বৌ নয় হে। বন্ধুর বোন।

বোন! ওমা! তাহলে গাছের তাজা ফলটির দিকেই নজর দিলে? আমি ভেবেছিলাম—

'নজর'! বললাম তো, হা অদৃষ্ট! কে কাকে নজর দেয়। এই হতভাগা বিনায়ক সেই দুর্দান্ত প্রেমিকার নজরে পড়ে গিয়ে—কিছু মনে করো না ম্যাডাম। তোমাদের স্ব-জাতি। তবে বাংলা ভাষায় ছিনেজোঁক বলে যে একটা শব্দ আছে, ইনি তার প্রতীক! মনে হচ্ছে—সংকল্প করে সমরে নেমেছে, আমাকে ওর প্রেমে পড়িয়েই ছাড়বে! জীবন 'তামস' করে দিচ্ছে।

বাঁশরি ওর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ টিপে হেসে বলে, 'সচ্ বাৎ'?

একদম সচবাৎ! হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট।

তোমার দিক থেকে কোনো আকর্ষণ নেই!

গুলি মারো!

কী রকম দেখতে?

যথেষ্ট ভালো! সুন্দরী বললেও বলা যায়। ওর কোনো প্রেমিকা জুটছে না এমন মনে করার কারণ নেই।

তোমাতে বিভোর? গদগদ ভাব?

দূর বাবা। সে প্যাটার্নের মেয়েই নয়। বাড়িতে ধরে নিয়ে যাবে, হৈচৈ করবে, আমার ওপর এমন আধিপত্য ভাব দেখাবে যেন আমি ওর কেনা গোলাম বনে গেছি।

তুমি সে সম্বন্ধে 'প্রতিবাদ' তোলো না? লোককে ভুল ধারণার মধ্যে রাখো?

দেখো বৌদি! ব্যাপারটা বেশ জটিল। প্রথম তো—ভদ্রতা সৌজন্য চক্ষু-লজ্জা এগুলো কিছু বাধা দেয়। তাছাড়া—তেমন চটাচটি করলে হয়তো ওদের বাড়িতে যাওয়াটাই বন্ধ হয়ে যাবে। সেটা লোকসান।

সেটা লোকসান?

বিনায়ক খুব স্থির গলায় বলে, তা লোকসান বৈকি!

হুঁ। তো মেয়ের এই আহ্লাদেপনায় মা-বাপের মদত আছে?

বাপের আছে কিনা বলতে পারব না। ওনার মনোভাবটা ঠিক বোঝা যায় না। মায়ের পুরোমাত্রায় আছে।

বুঝেছি।

বলে বাঁশরি মিটিমিটি হাসতে থাকে।

কী বুঝলেন মহাশয়া?

বুঝলাম। বুঝলাম ওই বোনটির এটি 'প্রেম' নয়। স্রেফ্ মতলব।

মতলব! সেটা আবার কী বস্তু? এখানে ঐ কথাটা আসে কি করে?

আহা, বুঝতে পারছ না কেন! বেশ বুঝে ফেলেছে, ওর ওই বেওয়ারিশ বৌদিটির সঙ্গে তোমার অন্তরে অন্তরে একটি আঁতাত গড়ে উঠছে। এটি মা-মেয়ে কারোরই পছন্দ নয়! তাই শাসনের পথ না ধরে কৌশলের পথ ধরেছেন ওনারা।

মায়ে-মেয়ে পরামর্শ করে বলতে চাও? ধ্যাৎ!

আহা হয়তো পরামর্শ নয়। মেয়েরই মনোভঙ্গী। কিছুটা ঈর্ষা আর কিছুটা বাড়ির বৌয়ের মর্যাদা রক্ষার্থে আত্মদান!

মার্ভেলাস!

বিনায়ক প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, ইস! বাংলা নভেল লেখায় হাত দিচ্ছ না কেন হে মহিলা? হাত দিয়ে ফেল। হাত দিয়ে ফেল! ছত্রে ছত্রে সাই-কলোজির জটিল প্যাঁচ। উঃ, একখানা ব্রেন বটে!

বাঁশরি নিশ্চিন্ত গলায় বলে, এখন ঠাট্টা করছ। পরে ভালো করে ভাবলেই

বুঝতে পারবে। আমি বলছি, এটাই কারণ। বেচারী নিখোঁজ দাদাটার কথা স্মরণ করে বৌদিটিকে রক্ষা করার চেষ্টা। মেয়েদের অসাধ্য কাজ নেই। হয়তো শেষ অবধি তোমাকে প্রেমে পড়িয়ে ছাড়বে।'

হরিবল্।

কিছু বলা যায় না হে ব্রাদার। হয়তো শেষ পর্যন্ত তুমিই ভাববে, মরুকগে যাক, ঝুলেই পড়ি। এত হ্যাংলামি করছে যখন। তা ছাড়া—'অপরা নারীটি তো অধরাও।' মাটিতে পড়ে যাওয়া ফলটা না কুড়িয়ে মগডালের দিকে তাকিয়ে থেকে লাভ কী?

বিনায়ক উঠে দাঁড়ায়।

বলে ওঠে, নাঃ। এই বিরাট প্রতিভাকে অপচয় হতে দেওয়া যায় না। নাও, আজ থেকেই শুরু করো। এই যে এই নাও আমার এই ফরেনের পেনটি। নিঃশর্তে দান করছি। ও, না না, এই শর্তে—বাংলা উপন্যাসে হাত পাকাও। মারকাটারি লিখতে পারবে।

হেসে ওঠে হো হো করে।

উত্তেজিত বুবু মায়ের কাছে ছুটে আসে।

মা! মা! দাদা ঠিক ক'বছর ক'মাসে হারিয়ে গিয়েছিল?

সুনন্দা চমকে ওঠেন। তারপর সামলে নিয়ে বলেন, তুই জানিস না?

আহা, জানব না কেন? তবু ঠিক কারেক্টটা—বলো না শীগগিরি।

সুনন্দা বললেন, ছাব্বিশ বছর আট মাসে।

অ্যাঁ। ঠিক?

বুবু একলাফে মায়ের কাছে সরে এসে বলে, এই ছাখো। ভৃগুর একটা 'ছক'-এর সঙ্গে দাদার চেহারায়, স্বভাবের সব কিছু মিলে যাচ্ছে। এমন কি ছেলেবেলায় পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত। তুমি বলো না দাদা ছেলে-বেলায়—সে যাক, ছাখো-ভৃগুমুনি বলছেন, ঠিক ওই বয়েসে এই জাতকের বিবাহ। সুন্দরী ভার্যা লাভ। এবং অব্যবহিত পরে গৃহত্যাগ। ধর্মীয় জীবন-যাপন। এবং—

সুনন্দা অধিকতর উত্তেজিত হয়ে বলেন, পৃথিবীর সব মানুষের ভাগ্য গণনা করে রেখে গেছে ভৃগু ?

বুবু বলে, আহা, সব মানুষের কেন ? সমস্ত রকমের জন্মপত্রিকার।···এটা একটা অঙ্কশাস্ত্র মা। এর মধ্যে বুজরুকির কিছু নেই। অনেকটা হ্যানিমান সাহেবের হোমিওপ্যাথির মতো। তিনি তো রুগী দেখে ওষুধ দেবার পদ্ধতি রাখেননি রোগ দেখে ওষুধ নির্ণয়। অর্থাৎ—যত রকম রোগ হতে পারে—

এসব যুক্তি আর তথ্য অবশ্য ক'দিন আগেও বুবুর জানা ছিল না। বইটার ভূমিকা পড়ে জেনেছে।

মাতা-পুত্রীর উত্তেজিত বাক্যালাপে অনন্যা এসে কাছে দাঁড়িয়েছিল।

এখন আস্তে বলে, আচ্ছা বুবু !···তারপর আর কিছু লেখা নেই ?

তারপর ?

বুবু চকিত হলো !

বৈজ্ঞানিকের অকস্মাৎ 'আবিষ্কারের' মতো ওইটুকুতেই সে এত বেশী উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল যে, তার পরটা আর দেখেনি।

এখন বলল, তারপর ? তারপর ?···ও এই যে—

কিন্তু সেটা আর দেখা হলো না।

সহসা সিঁড়ির নিচে থেকে একটি পরিচিত বাজখাঁই গলার স্বর শোনা গেল, পল্টন কইরে ? বাড়ি আছিস না নেই ?

কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসেন। যাক গে। পল্টনকে হামকো কুছ কাম নেই হ্যায়। বৌমা ! চপ ভাজছ না তো ?

বিরাট পদক্ষেপে উঠে আসেন।

এই বিশাল কণ্ঠ এবং বিরাট পদক্ষেপ, সুনন্দার পুলিশ অফিসার সেই দাদার !

এখন আর 'ভৃগুর' প্রশ্ন ওঠে না।

বুবু তাড়াতাড়ি বইটা লুকিয়ে ফেলে।

সুনন্দার পুলিশ দাদার ভঙ্গীই এই। এসেই বলেন, চপ ভাজছো তো ?

অনন্যা প্রণাম করে হাসি মুখে বলে, পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে।

নো। নো। আজ আমার কোশ্চেনটা মন দিয়ে শোনোনি বৌমা। ভাজতে বসোনি তো। এটাই জানতে চাইছিলাম।

সুনন্দা এগিয়ে এসে হেসে ফেলে বলেন, বাঃ। তুমি আসছ জানি? তো 'না' কেন? বৌমা তো এক্ষুনিই—

নাঃ। আজ আর চলবে না। একটা দারুণ 'লাঞ্চ'-এর নেমন্তন্ন ছিল। আগামীকাল পর্যন্ত না খেলে চলবে। চা পর্যন্ত চলবে না!

সুনন্দা রাগের ভান করে বলেন, তাহলে আজ বেড়াতে আসার কী দরকার ছিল নতুনদা?

বেড়াতে নয়। বেড়াতে নয়। আজ স্রেফ 'কাজে' এসেছি।

কী কাজ?

সুনন্দা আশান্বিত হয়ে তাকান।

তবে কি কোনো 'সন্ধান' পেয়েছ নতুনদা?

আশার চোখে তাকায় আরো একজোড়া চোখ।

নতুনদা বলে ওঠেন, হ্যাঁরে নন্দা, সোলজারের লেটেস্ট কোনো ফটো আছে?

লেটেস্ট! সে আজ প্রায় আড়াই বছর বাড়িছাড়া—

আহা, না না। মানে সেই তখনকার কথাই বলছি।

বুবু বলে ওঠে, থাকবে না কেন? প্যাকেট, প্যাকেট। বিয়ের সময় যত রকম অনুষ্ঠান হয়েছে সব কিছুরই তো—

বাঃ বাঃ, তাই তো। দে তো দেখি।

নতুনদা, কিছু সন্ধান—

আরে না বাবা না! সবটাই বোধহয় ধোঁকা। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে এই— এক ব্যাটা সার্জেন্ট একটা মেয়ে চুরির কেস-এ গিয়েছিল বালেশ্বর জেলার একটা গ্রামে। সে এক ব্যাপার!

মেয়ে চুরির কেস-এর সঙ্গে সুনন্দার খোকার কী সম্পর্ক!

কাঠ হয়ে তাকিয়ে থাকেন সুনন্দা।

পাথর হয়ে তাকিয়ে থাকে অনন্যা।

শুধু বুবু বলে ওঠে, মেয়ে চুরির সঙ্গে দাদার ছবির কী সম্পর্ক মামাবাবু? ও মামাবাবু, বলুন না?

অতঃপর মামাবাবু যা শোনান তার সারমর্ম এই: গত রথযাত্রার সময় বেহারের ছাপরা জেলা থেকে একটা বড় দল পুরীতে আসে। নেহাতই চাষীবাসী ক্লাসের। কিন্তু তাদের মধ্যে নাকি একটা বছর পনেরো-ষোলোর কুমারী মেয়ে ছিল—মেয়েটা নাকি গোবরে পদ্মফুল। একেবারে দেবী-প্রতিমার মতো রূপ। নামও তাই লছমি! দলের সঙ্গে এসেছে। আরো কত মেয়ে এসেছে। ভিড়ের মধ্যে সেই মেয়েটাই নিখোঁজ।

কেউ বলল, সমুদ্রে ডুবে গেছে। কেউ বলল, যুবতী মেয়ে কারো সঙ্গে ষড়যন্ত্র ছিল, এই মওকায় ভেগেছে।

কিন্তু গ্রামের বাকি সকলেই বলল, না না, সে মেয়ে তেমন নয়। ভারী ভালো মেয়ে। তো সেই মেয়ের মা-বাপের তো রথ দেখা মাথায় উঠল। কেঁদে কেঁদে কোনোমতে কলকাতায় এসে লালবাজারে হাজির হলো, তার পুলিশ সার্জেন্ট 'ভাতিজার' কাছে।

ওই সার্জেন্টটিরই সম্পর্কে ভাইঝি হয় মেয়েটা।

তো বেহারের একটা গণ্ড গ্রামের একটা চাষীর মেয়ে—উড়িষ্যায় এসে রথের ভিড়ে হারিয়ে গেলে—এত তোলপাড় কাণ্ড হবার কথা নয়। কিন্তু যেহেতু সে একটা হোমরা-চোমরা পুলিশের ভাইঝি তাই তোলপাড় কাণ্ড, এবং হদিস মেলা!

উড়িষ্যার এই গ্রামে নাকি চমৎকার একটি কারবার চলছে। হাজার হাজার লোকের সমাবেশ, হাজার হাজার টাকা আয়।

নতুনদা ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেন, এই হতচ্ছাড়া চাকরির দায়ে কেবলই পৃথিবীর অন্ধকার দিকটাই দেখে মরছি রে নন্দা। বিশেষ করে আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতে মানুষ নিয়ে আর ঠাকুর দেবতা নিয়ে যত রকম কারবার চলে, দুনিয়ার আর কোথাও বোধহয় তেমন নজির মিলবে না।···

কোনো এক ভণ্ড শয়তান নাকি সাধু সেজে আশ্রম বানিয়ে বেশ কায়দা লুঠছিল। হঠাৎ আরো লুঠতে—'সাধনার জোরে' বৈকুণ্ঠ থেকে নারায়ণকে

নামিয়ে এনে আরো ফলাও ব্যবসা চালাচ্ছিল। তাতেও লোভ মিটল না—হঠাৎ একদিন সেই 'লক্ষ্মীছাড়া' নারায়ণের জন্যে বিরহিণী লক্ষ্মীকেও নামিয়ে এনে মহা ধুমধামে অভিষেক করল।...

তারপর আর কী! লক্ষ ভক্তের সমাবেশ! গ্রামটা শহর বনে যাচ্ছে। দোকান পসার, যাত্রীনিবাস, হোটেল-রেস্টুরেন্ট—সে নাকি এলাহী ব্যাপার।... শুধু 'জ্যান্ত' লক্ষ্মীনারায়ণের রঙিন ফটো বেচেই হাজার হাজার টাকা তুলছে। তো ওই ব্যাটা সার্জেন্টটা নিয়ে এসেছে একটা ছবি। বলছে, ওই জ্যান্ত লক্ষ্মীটি তারই ভাইঝি 'লছমি'। এখন ওয়ারেন্ট নিয়ে অ্যারেস্ট করাতে যেতে চায়। উড়িষ্যা সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো হচ্ছে এ নিয়ে। তো তোকে কী বলব নন্দা, ছবিটা দেখে আমার হঠাৎ মনে হলো, ওই জ্যান্ত নারায়ণটির মুখটা যেন অনেকটা আমাদের সোলজারের মতো—

নতুনদা!

সুনন্দা বসে পড়েন, কই? কই সে ছবি?

অ্যাই দ্যাখো। সে ছবি তো লালবাজারের গোয়েন্দা দপ্তরে জমা রয়েছে। তো ভাবছি যে সোলজারের একটা ছবি নিয়ে গিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারলে—আরে, আরে, এ কী? কেঁদে ফেলছিস কেন? এটা আমার একটা কৌতূহল মেটানোই বলতে পারিস। সত্যিই কি আর? বেহার থেকে এক-খানা লছমি যোগাড় করে এনেছে; হয়তো মধ্যপ্রদেশ থেকে একখানা নারায়ণ যোগাড় করেছে। ছোট ছবি, তাও রঙিন, এবং শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ মূর্তি। তবু—কই দেখি।

বুবু ততক্ষণে ঘর থেকে নিয়ে চলে এসেছে দাদার বিয়ের সময়কার অনুষ্ঠান কালের 'ধারাবাহিক' ছবিগুলির স্টকের অ্যালবাম।

বিয়ের বর নিখোঁজ হবার পর যেগুলি প্রিন্ট করানো হয়েছিল। বেশির ভাগই বুবু আর পল্টনের অবদান। সাদা-কালো এবং রঙিন দু রকমই রয়েছে। সবই সযত্নে অ্যালবামে সাঁটা হয়েছে।

দেখতে দেখতে 'নতুনদা' হঠাৎ, আরে বাঃ। এটা যে দেখছি প্রায় 'নারায়ণ' মাফিক। এটা দে। আরও দু-একটা দে।

আসল তারিফের ছবিটা হচ্ছে বিয়ে করতে যাবার আগে 'বরসজ্জা'-র বেশে। চেলি-চন্দন টোপর আর গোড়ে মালা পরিহিত সেই সুকুমার রূপটি সত্যিই সুন্দর।

নেগেটিভ আছে তো?

বললেন পুলিশ মামা।

বুবু বলল, হ্যাঁ। আরও প্রিন্টও আছে। অন্য অ্যালবামে।

বলে অনন্যার দিকে তাকাল। অর্থাৎ সেই অন্য অ্যালবামটি ওই মহিলাটির কাছে রক্ষিত।

ঠিক হ্যায়।

খান তিন-চার ছবি নিজের ব্যাগে ভরে নিয়ে মামা বললেন, আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি। ভাবছি—নিজেই একবার বিশেষ তদন্তের ছুতো করে অকুস্থলে চলে যাই।

নিজেই যাবে? নতুনদা!

বললেন সুনন্দা। সমীহভরে। এই তুতো দাদাটির সঙ্গে বয়েসের পার্থক্য খুব সামান্য হলেও সমীহের বশে সুনন্দা অনেক বড় দাদার মতো মান্য করে কথা বলেন।

নতুনদা অগ্রাহ্য ভরে বললেন, যাই। একবার সরেজমিনে ঘুরেই আসি। কেসটা তো আসলে 'মেয়ে চুরির'। এ বিষয়ে এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার খুব কেয়ারফুল হতে চাইছে। তাছাড়াও আবার জালিয়াতির খবর রয়েছে। একেবারে মোক্ষম জালিয়াতি। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী-নারায়ণকে নিয়ে-চলি! মনোজিৎ গেছে কোথায়? দেখা হলো না।

যদিও মনোজিৎ ওনার থেকে বয়েসে বছর পাঁচ-ছয়ের বড়, তবু পদমর্যাদার বলে তাঁকে নাম ধরেই ডাকেন পুলিশ সাহেব।

গেছে আর কোথায়! বোধহয় পাড়াতেই আছে। হঠাৎ বুড়ো বয়সে দাবা খেলার নেশায় ধরেছে।

আরে বাবা! দাবা তো বুড়ো বয়েসেরই খেলা। চলি।

সুনন্দা সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত ছুটে আসেন। বুবুও।

নতুনদা !

কী রে !

কোনো আশা পাচ্ছ ?

নতুনদা হৈ-হৈ করে ওঠেন, আরে দূর দূর। নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ছেড়ে দিয়েই ! এক ধরনের 'আদল' অনেকের মধ্যেইথাকে। আশা-টাশা করতে বসিস না নন্দা। ভাগ্য যদি ভালোই হবে, তবে তুম করে ব্যাটা হারালোই বা কেন ?

বোনের পিঠটা একটু ঠুকে দিয়ে তুমদাম নেমে গেলেন পুলিশ সাহেব। পুলিশ-জীবনে অনেক ভয়ঙ্কর দুঃখময় ঘটনার দর্শক হতে হয়। তবে সেটা আত্মীয়জনের পরিধিতে এসে পড়লেই মুশকিল। কিন্তু সাহেবের জন্যে যে আর একটি বিপদ তোলা ছিল তা কে জানত ?

গাড়িটা বড় রাস্তায় দাঁড় করানো ছিল। মনোজিতের বাড়িটা যৎসামান্য একটু ভিতরে, গলি বলা চলে না। বরং বলা যায় একটু প্রাইভেট প্যাসেজ মতো। ইট বাঁধানো। গাড়িকে ঢুকিয়ে আনা যায় না।

গাড়ির কাছে এসে সাহেব যাকে বলে 'থ'।

গাড়ির দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ভাগ্নে-বৌ !

সকলের চোখ এড়িয়ে কখন চলে এসেছে অনন্যা ?

হয়তো বাক্যালাপরত ভ্রাতা-ভগ্নীর পাশ কাটিয়েই নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে। শরীরটা তো পাতলা ছিপছিপে, প্রায় হাওয়ায় ভাসা।

মামাবাবু !

এ কী বৌমা ! তুমি এখানে ?

মামাবাবু, আমায় আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন ?

আমার সঙ্গে ! কোথায় ?

সেই যেখানে যাবেন আপনি। তদন্ত করতে !

হতবুদ্ধি মামাবাবু বলেন, তোমায় নিয়ে যাব ? পাগলী মেয়েটা বলে কী গো !

অনন্যা দৃঢ়স্বরে বলে, উড়িয়ে দিলে চলবে না মামাবাবু। এর ওপর আমার

জীবন-মরণ নির্ভর করছে—

মামাবাবু সস্নেহে বলেন, আহা, সে কী আর আমায় বলে বোঝাতে হবে বাবা? তবে—একটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, হয়তো ভূয়ো খবর। তবু তার পিছনে আমাদের ছুটতেই হয়। কিন্তু তোমায় কী ভাবে কোথায়—ছি ছি। পাগলী মেয়ে! চোখ মোছো। বাড়ি যাও।

একেবারেই অসম্ভব?

একেবারেই অসম্ভব মা! আমি গিয়ে হোটেলে-ফোটেলে কোথায় গিয়ে উঠব। তাছাড়া যাচ্ছি তো আশ্রমের ঘাঁটির নামে ওয়ারেণ্ট নিয়ে। কী পরিস্থিতি হবে!...যাও যাও, বাড়ি যাও। এক্ষুণি খোঁজ পড়বে। হৈচৈ পড়ে যাবে।

মামাবাবু, আমায় গাড়িতে একটু বসতে দেবেন?

গাড়িতে! বসতে দেবো!

হ্যাঁ। আমি আর একটু কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে—

বিপদগ্রস্ত মামাবাবু বলেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে।

উঠে বসল অনন্যা।

বলল, মামাবাবু, আপনি তো জানেন আমার বাপের বাড়ি কটকে? ওখান থেকে তো বালেশ্বর খুব কাছে—

আহা। বালেশ্বর মানে তো শহরটা নয়। জেলায় সে কোথায় কোন্ এক গণ্ডগ্রামে—তুমি তো বেশ বুদ্ধিমতী বাবা! তো বোকা শাশুড়ীটার মতো ছেলেমানুষি করছ কেন? আমি একবার ঘুরে আসি না? দেখি আসল ব্যাপারটা কী! তারপর—ভাগ্য যদি সদয় হয়—

কিন্তু অনন্যার ঘাড়ে কি হঠাৎ ভূত চাপল?

কথাবার্তা যেন ভূতে পাওয়া রোগীর মতো আচ্ছন্ন আচ্ছন্ন।

মামাবাবু। আপনি হয়তো ঠিক চিনতে পারবেন না। আমি সঙ্গে গেলে চেনার সুবিধে হতো।

বৌমা!

মামাবাবুর এবার চড়া গলা।

এবার কিন্তু আমি রেগে যাব। আমি শালা তাকে—সরি। কিছু মনে করো না বাপু। পুলিশ লাইনটাইন খারাপ। 'মুখ খারাপ'টাই স্বভাব হয়ে যায়। বলছিলাম, আমি সে ব্যাটাকে জন্মাতে দেখলাম, জন্মাবধি দেখে আসছি। আমি চিনতে পারব না, আর তুমি পাঁচ দিন দেখেই না বাপু, এ চলবে না। সত্যিই যদি ব্যাটা আমাদের ছেলেটা হয়, চিনতে আটকাবে না। এবার বাড়ি ঢুকে যাও!

গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে চাইছেন?

পুলিশ সাহেব অবাক না হয়ে পারছেন না! এতদিন দেখছেন মেয়েটাকে কই এরকম তো কখনো—এ যেন হিস্টিরিয়ার মতো ভাব। হঠাৎ একটা আশা পেয়েই কী?···নাঃ, খবরটা প্রকাশ্যে না বললেই হতো! 'সন্ধানের' প্রয়োজনে ছবির দরকার বলাটাই উচিত ছিল।

কিন্তু—

ভয় ছিল সুনন্দার সম্পর্কেই। এই ধীর-স্থির, শান্ত, আত্মস্থ মেয়েটার জন্যে তো তেমন চিন্তা করেননি।

তখন বললেন, এসব বলে আমায় জব্দ করতে পারবে না বাবা। এ ব্যাটা হচ্ছে একটা ছুঁদে পুলিশ অফিসার। গাড়ি থেকে নামতে বলব না। চলো আমার বাড়িতে নিয়ে যাই। তোমার মামী শাশুড়ী ড্যাম গ্ল্যাড্ হয়ে যাবে! তো তোমার শাশুড়ীকে বলে আসি।

অনন্যা এখন নিজস্ব স্বাভাবিক গলায় বললেন, নাঃ। আপনি বরং আমায় আমার এক বন্ধুর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যান। বোধহয় আপনার পথেই পড়বে।

বন্ধুর বাড়ি? কোথায়?

নন্দনবাগান লেন।

নন্দনবাগান লেন! ঠিক আছে। নিজে ফিরতে পারবে?

তা পারব।

তা বাড়িতে বলে এসো।

নাঃ। আপনার দেরি হয়ে যাবে। বেশীক্ষণ থাকব না গিয়ে একটা ফো
করেও দিতে পারি।

সঙ্গে নিয়ে যাবার ভূতুড়ে আবদারটা ছেড়েছে দেখে খুশী হন সাহেব
বলেন, ঠিক আছে, চলো। ওখানে বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি, না বাপের বাড়ি?

অনন্যা একটু কেঁপে ওঠে।

তারপর সামলে নিয়ে একটু হেসে বলে, এখনো 'শ্বশুরবাড়ি' বলে কিছু হ
নি।

আচ্ছা।

পিছনের সীটে এরা। গাড়ির চালক অবাঙালী!

গাড়ি চলতে চলতে অনন্যা বলে, মামাবাবু! ওই ভণ্ড সাধুর আশ্রমে
ঠিকানাটা আমায় একটু লিখে দিন না।

আরে বাবা। কেন? মামাবাবুর ওপর গোঁসা করে নিজেই চলে যাবে
নাকি?

বাঃ, তা কেন? বাবাকেও তো লিখে পাঠাতে পারি! ওখান থেকে তো—

তা অবশ্য। তবে কথাটা বেশী চাউর না করাই ভালো! তাতে তদন্তের একটু
অসুবিধে হয়। কিন্তু ঠিকানাটা কি আমার মুখস্থ?

বাঃ! আপনার নোটবুকে তো লেখা আছে? তখন যে দেখে আপনি মাকে
বললেন!

পুলিশ সাহেব আর একবার ভাবলেন, কাজটা খুব কাঁচা কাজ হয়েছে
ছুটো আশায় ব্যাকুল অবোধ নারীহৃদয়ের কাছে এই আশার কথাটা বলা
ঠিক হয়নি!

আসলে—তিনি নিজেই একটু বিচলিত হয়ে গিয়েছেন সেই সার্জেণ্টবাহি
ছবিখানা দেখে।

নোটবুক বার করে একটু লিখে দিয়ে বললেন, দিচ্ছি বটে, তবে তাড়াতাড়ি
কিছু না করাই ভালো। আমি গিয়ে হয়তো পুরো আশ্রমসুদ্ধই অ্যারেস্ট
করে নিয়ে আসতে পারি। উড়িষ্যা গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে।
তবে ভয় স্থানীয় লোককে। এইসব জালজোচ্চুরীর ব্যাপারে ভণ্ড ব্যাটা-

দের প্রধান সহায় অন্ধ ভক্তের দল। কত 'দেখলাম।...পুলিশ কেসের আসামী, খুনের কেসের আসামী, তবু ভক্তরা 'গুরুদেব' বলে, কী 'বাবা মহারাজ' বলে গড়াগড়ি খাবে।...বড় ধর্মপুণ্যির দেশ আমাদের বৌমা।

...এই যে তোমার নন্দনবাগান লেন এসে গেল। কত নম্বর বাড়ি?

সে আমি দেখে নেব! ব্লাইণ্ড লেন। শেষ বাড়িটা। তো আপনার গাড়ি তো আর ঢুকবে না ওর মধ্যে।

'আচ্ছা'। বলে একটু হাসল। একটু নত হলো।

পুলিশ সাহেব পায়ের ধুলো নিতে দেন না? বলেন, আমার পায়ের ধুলো? রাম কহো। দুনিয়ার যত পাপী পাতকী পামর আছে, আমরা হচ্ছি তাদের 'টপ'-এ। আমাদের ছায়া মাড়ালে গঙ্গাস্নান করতে হয়।

তো বাড়িতে তাহলে একটা ফোন করে দিও। এতক্ষণে বোধহয় তোমার নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেছে। আহা, বেচারী নন্দাটা পাগল-ছাগল মানুষ! তায় আবার ঘরপোড়া গরু।

চলে গেলেন গাড়ির ধুলো উড়িয়ে।

অনন্যা একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল নিথর হয়ে। যেন প্রথমটা অবাক হতেও ভুলে গেল। তারপর অবাক হলো।

আচ্ছা এত সহজে এতগুলো কথা বানালাম কী করে? বললাম, বাবার কাছে পাঠাতে 'সেই' ঠিকানাটা চাইছি।...বললাম, বাড়িতে—ফোন করে জানাব। বললাম, এখানে বন্ধুর বাড়ি।

তারপর একটু ভাবল।

এ কথাটা কি বানানো মিথ্যা কথা? 'বন্ধু' বলতে আর কার মুখ মনে পড়ছে আমার?

বাবা? বাবার সঙ্গে যা বেইমানী করেছি, করে-চলেছি, তার পর কি আর বাবার সামনে 'প্রার্থী'র চেহারা নিয়ে দাঁড়ানো চলে? যদি—যদি—যদি সত্যিই ওকে আবার পাওয়া যায় তাহলে রানীর মতন গিয়ে দাঁড়াব।

যাবে। যাবে। পাওয়া যাবে। আমার মন বলছে পাওয়া যাবে। ওর ফটো-গুলো দেখতে দেখতে মামাবাবুর চোখে-মুখে যে ছাপটা ফুটে উঠেছিল,

তা হচ্ছে 'নিশ্চিত প্রাপ্তির নিশ্চিন্ততা'। উনি সিওর হয়েছেন। কিন্তু পুলিশের ব্যাপার। আঠারো মাসে 'বছর'। কত—কত দিন দেরি হবে। হয়তো ততদিনে ওখান থেকে সরিয়েও ফেলতে পারে। পারে। খুব পারে। ওইসব প্রতারক লোকেদের অনেক চর থাকে। তারা জানিয়ে দেয়, পুলিশের নজর পড়েছে।

তাহলে?

তাহলে কী হবে? হাতে পেয়েও আবার হারাতে হবে?

অনন্যার মনে হয়, এক্ষুণি একা একাই সেখানে ছুটে চলে যায়।

অসুবিধে কী? ঠিকানাটা তো রয়েছে হাতে। আর কত কত ভক্তও তো যায় শুনলাম। তেমনি একজন ভক্ত সেজে ঢুকতে চাইলে কে আটকাবে?

আমাকে যেতেই হবে।

এই মুহূর্তে না গেলে, আবার হারিয়ে ফেলব।

বাড়ির কথাটা মনে করল অনন্যা। বাড়ি মানে মনোজিতের বাড়ি। সেখানে সেই মুখগুলো। সুনন্দার-বুবুর-পল্টনের-মনোজিতের। কেউ অনন্যার প্রতি সহানুভূতিহীন নয়। তবু অনন্যার এই ছুটে যাওয়ার ইচ্ছেটাকে কি কেউ সমর্থন করবে? কেউ না। সবাই বলবে—মামাবাবু যা ভালো বুঝবেন।

কিন্তু ওই ভালো বোঝাবুঝি করতে করতে যদি পাখি উড়ে যায়।

তাই তো যায়। পুলিশ আর কটা অপরাধীকে ধরতে পারে? সবাই তো পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালায়। বলে জেল থেকেই পালায়। লোহার গরাদের আড়াল থেকে।

না, না,। দেরি করা চলবে না।

এক্ষুণি যেতে হবে।

টাকার দরকার?

অনন্যার গায়ে তো কিছু সোনা রয়েছে।

মনোজিৎ আকাশ থেকে পড়লেন।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? কখন থেকে? সেই তখন থেকে? 'শালাবাবু'

'সার পর থেকে ? কখন এল সে ? কী বলতে ? অ্যাঁ। সোলজারের খবর
· ওঃ। আশার কিছু নয় ? একটা উড়ো খবর ? তা সে কথা বলতে আসার
দরকার ছিল ? আশ্চর্য ! তোমাদের চোখের সামনে দিয়ে দিনের
ালোয় একটা জলজ্যান্ত মানুষ হাওয়া হয়ে গেল, দেখতে পেলে না ?···
রেশ কোথায় গেল ? অ্যাঁ। বেহুঁশ বেতালা হতভাগা ! বাইরের দরজার
াছেই ওর ঘর না ? · দোকানে গেছল ? ওঃ। এই একখানা বাড়ি !
ব্বিশ ঘণ্টা দোকান আর বাজার।···আমি এখন ওর মা-বাপকে কী বলব ?
· ওরা যদি এবার বলে বসে আমার মেয়েকে 'গুমখুন করে' ফেলেছ।···
ঃ। কী পাগলামি হচ্ছে ?
নন্দা রেগে ওঠেন।
[ও বলে, চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় করছ কেন বাবা ? এমনও তো
পারে, এমনিই হঠাৎ কোথাও—
ঃ প্রায় সন্ধ্যের সময় হঠাৎ কোথায় যাবে ? এ সময় কি লাইব্রেরী খোলা
কে ? আচ্ছা—ঠিক করে বলো তো ঠিক কী কী ঘটেছিল।···
, তার আগে আমায় এক গেলাস জল দে তো !
া, তুমি তোমার নতুনদাকে একবার ফোন করে দেখো তো।
স্থির, ব্যাকুল আর বৌয়ের এই বিদঘুটে ব্যবহারে তিতিবিরক্ত সুনন্দা
টে পড়লেন।
নদাকে ফোন করতে বসব কেন ? নতুনদা তাকে নিয়ে পালিয়েছে ?
ঃ মা কী যা-তা বলছ ? হঠাৎ এরকম কোনো ঘটনা ঘটলে পুলিশকেই
। জানাতে হয়। সে হিসেবেও—
মার হাত-পা উঠছে না। তুই কর।
ন্তু সুনন্দার নতুনদা কী বাড়িতে বসে থাকার ছেলে ? তাই তার নম্বরে
য়াল করলেই হ্যালো করে উঠবেন ?
লবাজারে ?
ও মিলল না। তেরোটা লাইনেও না।

হতভম্ব বিনায়ক বলল, আপনি কী প্রস্তাব করছেন, সেটা একবার ভালে
করে ভেবে দেখেছেন?

ভালো করে ভেবে দেখার সময় নেই। এক্ষুণি গিয়ে পড়া দরকার। ন
হলে ঠিক হাতছাড়া হয়ে যাবে। আজই, আজ রাত্রের ট্রেনটাই ধরা দরকার

আমি আপনার মন বুঝতে পারছি অনন্যা দেবী!

ওঃ। আর ওই 'দেবী-টেবী' আপনি-টাপনি নয় বিনায়ক। ওসব ফর্মালিটি
রাখো। এ জগতে তুমি ছাড়া আর কোনো বন্ধু নেই। আর কেউ আমায়
নিয়ে যেতে রাজী হবে না।

অনন্যার মুখ লাল, নিঃশ্বাস দ্রুত।

বিনায়ক অবাক চোখে অপরিচিতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অপরিচিতাই তো। এই মেয়েকে কী বিনায়ক দেখেছে কোনোদিন? দিনের
পর দিন একখানি বরফের পুতুল দেখে এসেছে।

যখন অভিজিতের ছাত্রজীবনের তথ্য জানতে চেয়েছে, তার কোনো রাজ
নৈতিক ভূমিকা ছিল কিনা সন্ধান চেয়েছে, তখনো তো স্থির শান্তভাবেই
কিন্তু আজ এ কী?

এ কি একটা সাময়িক পাগলামি ব্যাধি! অভিধানে এরকম একটা ব্যাধি
নাম আছে যেন। মনে হচ্ছে, যেন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে
তা হয়তো তাই।

ঝোঁকের মাথায় স্বভাব-বহির্ভূত, হয়তো বা সংসাররীতি-বহির্ভূত একটা
বেখাপ্পা কাজ করে বসে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছে না অনন্যা নামে
মেয়েটা।

তাছাড়া-মেয়েটা কী সত্যিই অমন বরফশীতল প্রকৃতির ছিল? যখন 'নীন
নামে তার জন্মগৃহের পরিমণ্ডলে ঝলসে বেড়াত। তখন?

মা বলত 'উচ্চিংড়ে'।

বাবা বলত 'প্রজাপতি'।

ঝকঝকে, ছটফটে!

সহসা একখানা অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্যের পাথরের চাঁই থেঁতলে দিলো প্রজ

পতির ডানা।

তাকিয়ে দেখতে দেখতে বিনায়ক ভাবল, এইভাবেই বুঝি হিমশিখরের ধ্বস নামে। জমাটবাঁধা জল গলে গিয়ে প্রচণ্ড বেগে নেমে আসে। প্রবল ঝর্ণাধারায় পাথর ভাসায়, জনপদ ভাসায়।

বিনায়ক চুপ করে আছ কেন ? তুমিও আমায় ফিরিয়ে দেবে ?

বিনায়ক আস্তে গভীর গলায় বলে, নাঃ। তোমাকে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা ধরি না। তোমার হুকুম হলে রেললাইনে গলা দিতেও দ্বিধা করব না। এ তো শুধু রেলগাড়ি চেপে—কিন্তু তুমি কি এই ভাবেই—

তাতে কী ? তাতে কিছু এসে যাবে না। কিন্তু তোমার কাছে টাকা আছে তো ? আমি তো—

এখন একটু হাসল।

তারপর বলল, যা পারো করো।

আর তারপর হঠাৎ বলে উঠল, তোমার বাড়ির লোকেরা সব শুনতে পাচ্ছেন ?

বিনায়ক একটু হাসল। বলল, নাঃ। আপাততঃ শ্রোতা বলতে ঘরের চারটে দেওয়াল। বাড়ির লোক বলতে শুধু দাদা আর বৌদি। সিনেমা গেছে। ফের-বার সময় হয়ে এল। চট পট বেরিয়ে পড়া যাক।

তাহলে ?—

এতক্ষণে অনন্যা একটা স্বাভাবিক কথা বলল, বাড়ির দরজা খুলে রেখে যাবে ?

নাঃ। ও আমাদের একটা ব্যবস্থা থাকে। ডুপ্লিকেট চাবির ব্যবস্থা। শুধু একটু লিখে রেখে যাওয়া দরকার।

একটা কাগজে বেশ বড় বড় করে লিখল, এক বিশেষ বন্ধুর খুব বিপদ। কলকাতার বাইরে চলে যেতে হচ্ছে। কবে ফিরতে পারব জানি না। টেলিগ্রামে জানাতে চেষ্টা করব।

টেবিলের ওপর দৃষ্টিগোচর জায়গায় রেখে দিলো একটা পেপারওয়েট চাপা দিয়ে। বেরিয়ে পড়ল দরজায় চাবি লাগিয়ে।

ট্যাক্সিতে ওঠার পর হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে গেল অনন্যা।
একটুক্ষণ পরে বিনায়ক আস্তে বলল, ভয় করছে?
ভয়? কেন? কিসের?
বিনায়ক বলল, কত কী-ই হতে পারে। বকুনি খাবার ভয়, লোক-নিন্দে
ভয়। কিংবা—কিংবা আমাকেই ভয়!
ছিঃ।
বিনায়কের একটা হাত চেপে ধরল অনন্যা।
তারপর আস্তে ছেড়ে দিয়ে বলল, পৃথিবীতে তাহলে 'ভরসা' শব্দটা থাক
না বলছ?
মাপ করো। খুব অন্যায় হয়েছে।
কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।
একটু পরে অনন্যাই সে স্তব্ধতা ভাঙে। আস্তে বলে ওঠে, ট্রেন কখন?
রাত দশটা পঁয়তাল্লিশ।
তাহলে টিকিট কাটার সময় আছে।
তা আছে। তবে রিজার্ভেশানের তো প্রশ্ন নেই, দাঁড়িয়ে যেতে হবে
তাতে কী? কত লোক সেভাবে যায়। একটা রাত মাত্র তো।
বিনায়ক একটু হাসল। বলল, একটা পুরো রাতও নয় অবশ্য। বলতে পার
আধখানাই। বালেশ্বরে গাড়ি ইন করে রাত তিনটে নাগাদ।
অনন্যা আবার চঞ্চল হয়।
তারপর? তখন সেই আশ্রমে যাবার গাড়ি পাওয়া যাবে? মানে যে কোনো
রকম গাড়িই হোক।
এই সেরেছে। সেই আশা করছ তুমি? বাকি রাতটা ওয়েটিংরুমেই কাটা
হবে। ভোর না হলে—
বিনায়ক!
ভারী শান্ত সেই স্বর।
আবার বিনায়কের হাতের ওপর একখানি হাত এসে ঠেকে। ঘামে ভে
তালু।

বিনায়ক ! বোধহয় হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি। এখন আমার সেন্স ফিরে আসছে। বুঝতে পারছি কী অদ্ভুত বিপদে ফেলেছি তোমায়।

আমার কথা থাক।

বিনায়কও শান্ত গলায় বলে, তোমার নিজের কথা বলো। কী করতে চাও ? বাড়ি ফিরে যাবে ?

বাড়ি ?

অনন্যা যেন শিউরে ওঠে, না না, বাড়ি নয়। ও হ্যাঁ, বাড়িই যেতে চাই। তুমি ছুটো কটকের টিকিট কাটো !

অনেক রাত্রে বাড়িতে ফোনে পাওয়া গেল সুনন্দার নতুনদাকে।

তিনি আকাশ থেকে পড়লেন, সে কী ! আমায় যে বলল, বন্ধুর বাড়ি পৌঁছেই তোদের ফোন করে দেবে !

বন্ধু ! এখানে আবার ওর কোন্ বন্ধু আছে ? কী রকম বন্ধু ?

কী আশ্চর্য। 'বন্ধু' আবার কী রকম কি ? দু'খানা ডানা থাকবে ?···কী বলছিস ? আমি ? আমি আবার দেখব কখন ? বৌমা তো গলির মধ্যে ঢুকে গেল।···বলল, গিয়েই ফোন করবে, বোধহয় লাইন পায়নি।···কী বলছিস ? লাইন না পাক, ফিরে আসতে কী হয়েছিল ?···ও হ্যাঁ সেটাই একটা চিন্তার কথা বটে। তো তোরা ওই বন্ধুর বাড়িতে—

এই সময় টেলিফোনে বুবুর গলা পেলেন নতুনদা।

ওই রাস্তাটা কী মামাবাবু ?

আহা, ওই তো বললাম তোর মাকে। ও না, বলিনি বোধহয়—ইয়ে নন্দন-বাগান লেনই তো বলল মনে হচ্ছে।

নন্দনবাগান লেন ! ওঃ। বুঝেছি।

বুঝেছিস ? তবে আর কী ? সকালবেলাই কেউ গিয়ে খোঁজ নিগে যা। হয়তো গল্পে গল্পে রাত হয়ে যাওয়ায় বন্ধু একা ছাড়েনি। চিন্তার কিছু নেই। আচ্ছা ছাড়ছি ! আমায় তো আবার ভোর পাঁচটায় জিপ নিয়ে আর দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে, সেই জ্যান্ত ভগবানদের আস্তানায় হানা

দিতে। সার্জেন্ট ব্যাটা ঘাঁটি আগলাচ্ছে বটে, তবে অ্যারেস্ট করবার ক্ষমতা তো তার নেই। দেখি কী হয়। ছাড়লাম। তোর মাকে প্যান প্যান করতে মানা করে দে।...আ—চ্ছা!

পল্টন বলল, কী রে বুবু? কী বুঝছিস!

যা বুঝছি ভালোই।

তোর এত মাথা খাটিয়ে বার-করা রণকৌশল ফেলিওর? হ্যা-হ্যা-হ্যা।

রণকৌশল আবার কী রে পাজী?

কী তা নিজেই বুঝে ছাখ!

বুবুর রাগে দুঃখে অপমানে চোখে জল আসে। বলে, ভিজে বেড়ালের মতন থাকত। এখন দেখছি ডেঞ্জারাস মেয়ে।

সুনন্দা কপালে করাঘাত করেন, এই ভয়টিই করেছি আমি বরাবর। ওই চুপচাপ মেয়ে কখন কী সর্বনাশ করে বসে!

মনোজিৎ শান্ত গলায় বললেন, মন্তব্যগুলো গলা খাটো করে বললেই ভালো হয় না? অন্তত সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

এর আবার অপেক্ষার কী আছে? বুবু তো বলছে, ওখানেই সেই সর্বনেশের বাড়ি। সেখানে গিয়ে রাত কাটাল। এর পর আবার রইল কী? ছি ছি! আর কিছু নয়, তলে তলে ভাব-ভালবাসা চলছিল, যেই শুনেছে, হয়তো আমার বুকের মানিক খোকার আসার আশা আছে, সেই দড়িছেঁড়া হয়ে —উঃ। কী নিরীহ সেজে থেকেছে! বুবু ঠিক বলেছে—ভিজে বেড়াল। নতুনদার মতন একটা দুঁদে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে এই কীর্তি করল! 'বন্ধু'। বন্ধু না যম? হায় ভগবান, ওই শয়তানকে আমি ছেলের মতন ভালবেসেছি।...ওগো আমার খোকা যদি সত্যিই ফিরে আসে তাকে আমি কী বলব? তুই হারিয়ে গিয়েছিলি, তাই তার শোধ নেবার জন্যে তোর বৌও—। ওরে, একদিনও তো বুঝতে পারিনি লক্ষ্মীছাড়ির ভেতরে এত পাপ!

মন্তব্যের বাণ ফুরোতে চায় না। যেন অক্ষয় তূণ?

তা এই রকমই হয়।

ছেলে হারিয়ে গেলে 'হাহাকার', মেয়ে হারিয়ে গেলে 'ছি-ছিক্কার'।
কেউ বলবে না সে হয়তো কোনো বিপদের পরিস্থিতিতে পড়েছে।
মনোজিৎ অবশ্য বলতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তাঁর কথা দাঁড়াল না।
সুনন্দা বললেন, তুমি আর ওর কথা বলবে না কেন? ওই বৌটি তো গোড়া থেকেই তোমায় 'তুক' করেছে! আচ্ছা, দেখো সকাল হলে। খোঁজ নিয়ে আসুক পল্টন।
তা এল বটে খোঁজ নিয়ে। সকালেই গেল, তবে খবরটা ঠিক মনোজিতের অনুকূলে নয়।
খবর সূত্রে জানা গেল, সে বাড়ির বিনায়ক নামক ছেলেটিকে তার কোনো বন্ধুর বিশেষ বিপদে গতকাল কলকাতার বাইরে চলে যেতে হয়েছে।
কখন?
বোধহয় সন্ধ্যার সময়।
'বোধহয়' মানে? বাড়ির লোক জানে না?
বাড়ির লোক তখন বাড়িতে ছিল না। চিঠি লিখে জানিয়ে গেছে।
পাড়ার লোক? কেউ আর কাউকে তার সঙ্গে যেতে দেখেছে?
পাড়ার লোক! কে কার কড়ি ধারে? কে কার খবর রাখে? ওই বাউণ্ডুলে মার্কা ছেলেটা তো রাতদিনই টো টো করে বেড়ায়। কে তার গতিবিধিতে চোখ ফেলে বসে থাকে? তাছাড়া—তখন টি, ভি,-র সময় না?
এ ধরনের খবর অবশ্যই মনোজিতের অনুকূলে নয়।
কিন্তু তারপর?

হ্যাঁ, তারপর গঙ্গার অনেক জল গড়ালো বৈকি।
'সময়' তো অস্থির। এবেলা ওবেলা পাতা ঝরে পড়ে। ক্যালেণ্ডারে তারিখ বদলায়।
অনেক ঘটনা, অনেক জাল জটিলতা। পুলিশের হাতে পড়লে জালিয়াতের জালটা যেমন কাটে, তেমনি নতুন জাল রচিতও হতে থাকে।
তবে সুনন্দার ওই মাথা খোঁড়াখুঁড়ির সকালের পরের সকালে কটকের

অমলেশ মজুমদার প্রেরিত একটি টেলিগ্রাম এসে হাজির হয়েছিল। যাতে জানানো হয়েছিল, 'গতকাল অনন্যা এখানে এসেছে। চিন্তার কারণ নেই! পরে চিঠি যাচ্ছে।'

মনোজিৎ কোনো মন্তব্য করেন নি। শুধু টেলিগ্রামটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সুনন্দার দিকে।

দিয়ে চলে এসেছিলেন নিজের ঘরে।

বুবু চুপিচুপি বলেছিল, এই পল্টন, নিরীক্ষণ করে ছাখ তো টেলিগ্রাম-খানা, সত্যিই কটক থেকে এসেছে কিনা!

পল্টন অনেক উল্টে পাল্টে দেখে বলেছিল, সত্যি বলেই তো মনে হচ্ছে।

বুবু ঠোঁট উল্টেছিল, তা সেটা বললেই হতো। কে বাধা দিত? এত নাটক করার কী দরকার ছিল?

কিন্তু বেচারী অনন্যার কী দোষ? জন্মলগ্নে তার সৃষ্টিকর্তা হয়তো নাটকীয় রসে আপ্লুত ছিলেন। তাই তার জীবনে বারে বারে নাটকীয়তা! হারানো স্বামীকে ফিরে পেয়েও কেন তার জীবনে এত সংঘাত?

সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, 'উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় ভণ্ড সাধুর আশ্রমে পুলিশী হানা।...আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ উক্ত 'গুরুদেব' কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গসহ নিখোঁজ।...ভক্তবৃন্দের মধ্যে হাহাকার।...আশ্রমের লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির হইতে 'জীবন্ত লক্ষ্মী-নারায়ণ' গ্রেপ্তার!

বিভিন্ন সময় চুরি করিয়া আনা তুটি যুবক-যুবতীকে দেবদেবী সাজইয়া উক্ত প্রতারক 'গুরুদেব' ফলাও কারবার করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছিল, কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশের বুদ্ধিমত্তায় ও তৎপরতায় এই তুষ্ট চক্র ভেদ হয়।...তুষ্কৃতকারী 'গুরুদেবের' সাহায্যকারী কয়েকজন আশ্রমবাসীর জবানবন্দীতে জানা যায়, ওই 'দেবদেবী' তু'জনকে সাধনার জোরে বৈকুণ্ঠ হইতে নামাইয়া আনা হইয়াছে। এই প্রচার সাপেক্ষে গুরুদেব হাজার হাজার 'ভক্ত'কে ধোঁকা দিয়া প্রচুর আয়ের পথ খুলিয়াছিলেন। আরো বিরাট মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল।

কিন্তু ওই 'দেবদেবী' যুগল ?

তাহারাও কি এই ঘৃণ্য ব্যবসায়ের শরিক ছিল ?

না। তাহারা খেলার পুতুল মাত্র। দিনের পর দিন নিয়মিত একপ্রকার মাদক দ্রব্য প্রয়োগে তাহাদের চৈতন্যের অবলুপ্তি ঘটানো হইয়াছিল। তাহারা সত্যিই 'দেবদেবী'। পৃথিবীর হতভাগ্য মানুষকে ত্রাণ করিতেই তাহাদের আবির্ভাব। বিহার অঞ্চলের 'লছমি' নাম্নী মেয়েটি তো বর্তমানে অপ্রকৃতিস্থা। সে কখনো হাসে কখনো কাঁদে, কখনো 'তোকে ভস্ম করে ফেলব' বলে লোককে ভয় দেখায়। নারায়ণ-রূপী যুবকটিরও কেমন আচ্ছন্ন ভাব!

উভয়কেই বিশেষ চিকিৎসাধীনে রাখা হইয়াছে। চিকিৎসকদের মতো ইহাদের মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে সময় লাগিবে।

পুলিশ সেই প্রতারক গুরুদেবকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।...

কেবলমাত্র একদিনই নয়, বেশ কয়েকদিন ধরেই এই সব খবর বার হতে থাকে। তবে কেউই বিশেষ অবাক হয় না। পূণ্যভূমি ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাসে এমন কত 'অ-লৌকিক' ঘটনার ইতিহাস আছে তার কি সংখ্যা আছে ? এটা সেই আদি অন্তকালের 'ঘটনা' ধারায় একটি নতুন সংযোজন মাত্র।

দেবতা ভাঙিয়ে আর মানুষ ভাঙিয়েই তো এদেশের অর্ধেক লোকের রুজি রোজগার। এদের অনেকেরই হয়তো অক্ষর পরিচয়ও নেই। তাতে কী ? মানবচরিত্র সম্পর্কে অসীম জ্ঞান।

ফিচলেমি ধূর্তামি আর ভণ্ডামির জোরে এরা আইনকে তুড়ি দিয়ে ওড়ায়। দৈবাৎ 'ফেরে' পড়ে হাজতবাস করতে এলেও, আবার 'গুরুদেব' হয়ে জঁকিয়ে বসে। কে বলতে পারে ওই পলাতক আসামীটি অন্য কোনো মঞ্চে নতুন মূর্তিতে ঝলসাচ্ছেন কিনা!

খবরের কাগজে এসব কথা চলল কিছুদিন। তারপর আর কী ? কিন্তু যাদের জীবনে এদের শয়তানীর কালো ছায়া পড়ে, তাদের নিয়ে কার ক'দিন মাথাব্যথা ?

'ব্যথা' শুধু তাদের, যাদের জীবন সেই ছায়ায় অন্ধকার হয়ে যায়!

অকস্মাৎ ঝরে পড়া লতার মতো এলিয়ে এসে পড়া মেয়েটাকে দেখে, অবন্তী কেঁদেছে হেসেছে, শুয়ে পড়েছে, ছুটোছুটি করেছে, আর কপাল চাপড়ে বলেছে, সব দোষ আমার রে! তোর বাবা তো যাচ্ছিল সেখানে—কলেজের সবাই গেল, আমিই ওকে যেতে দিলাম না!

মা! যেতে দিলে না!

দিলাম না নীনা। আমার ভয় করল। মনে হলো যদি সত্যিই ভবিষ্যৎ বলবার ক্ষমতা থাকে কারো, আর বলে ব'সে তাকে আর পাওয়া যাবে না।

এই ভয়ে তুমি—

এই ভয়ে আমি!

বাবা, এবার তবে চলো। আমায় নিয়ে চলো।

অমলেশ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, আর এখন উপায় নেই মা। মেয়ে চুরির কেস-এ, পুলিশ আশ্রম ঘেরাও করে রেখেছে।

তাহলে আর কী করা! আমি ফিরে যাই!

অবন্তী ঝাঁপিয়ে বলে, কোথায় ফিরে যাবি? সেখানে তোর কে আছে? কিসের দায়ে তুই ওদের দাসত্ব করে মরবি?

অনন্যা শান্ত গলায় বলে, মর্যাদার দায়ে, আত্মসম্মানের দায়ে। আমাকে ফিরে যেতেই হবে মা!

অমলেশ বললেন, ঠিক আছে। আমিই পৌঁছে দিইগে।

আবার অপরাধিনীর ভূমিকায় ফিরে আসা!

আবার প্রতীক্ষার প্রহর গোনা।

অতঃপর একদিন সেই দুরূহ প্রতীক্ষার অবসান!

নতুনদা বললেন, আমার 'নিকটাত্মীয়' না হলে আইন ওকে ছাড়ত ভেবেছিস? পুলিশ হসপিটালে রেখে রোজ একপালা করে জেরা চালাত! তো নে 'নারায়ণ'কে ঘরে প্রতিষ্ঠা করে তার নিদ্রাভঙ্গের সাধনা চালিয়ে যা!...আরে বাবা। ছেলে পেয়েও কেঁদে মরছিস! না না, তেমন ভয়ের

কিছু নেই। ডাক্তার তো বলেছে—স্মৃতিশক্তি লুপ্ত হয়ে যায়নি, শুধু বিট-কেল ওষুধের অতিরিক্ত প্রয়োগের প্রভাবে ঘোরে আছে।···চেনা জায়গা, চেনা মুখ দেখতে দেখতে ক্রমশ ঘোর কাটবে।···কই গো চালাকের বেটি! কোথায়? এসে তোমার চার্জ বুঝে নাও। মেয়েটি তুমি ডেঞ্জারাস। অ্যাঁ, আমায় বোকা বানিয়ে ঠিকানা আদায় করে 'বাপঘর' চলে যাওয়া হলো? নাও এখন বুদ্ধি খাটিয়ে তাড়াতাড়ি পাথরের পুতুলটাকে 'মানুষ' করে তোলো দিকি। তো তোমার বাপটি কই? জামাইকে না দেখেই চলে গেছেন নাকি?

না! আছেন। একটু বেরিয়েছেন।

ঠিক আছে। দেখো ওনাকে দেখে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে৷ কিনা। শেষমেষ তো ওনার বাড়ি থেকেই—এখন চলি রে নন্দা!

কিন্তু পুলিশ সাহেবের আশা সফল হয়নি।

অমলেশ যখন কাছে এসে যেন সহজভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, কী অভিজিৎ? কী খবর? কেমন আছ?

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। অচেনার মতোই।

অমলেশ বললেন, কী হলো? আমায় চিনতে পারছ না? আমায় দেখোনি? অভিজিৎ আস্তে বলেছিল, হ্যাঁ। একদিন খেলার মাঠে ভিড়ের মধ্যে দেখেছি মনে হচ্ছে।

তাই বুঝি? কী খেলার মাঠে?

কি জানি।

বলেই বলেছিল, আপনি যান। আমার ঘুম পাচ্ছে।

ঘুমই পায় তার সর্বদা।

সুনন্দা বলেন, ওই ঘুমই আমার কাল গো। কী শেকড়-বাকড়, পাতা-লতা খাইয়ে ছেলেটাকে এই হাল করে দিলো গো।

হঠাৎ সেই পেজমার্ক দেওয়া ইংরাজী বইখানা তাক থেকে পেড়ে এনে বলে-ছিলেন, খোকা, বইটা পড়তে পড়তে রেখে দিয়েছিলি। বাকিটা পড়বি না? অভিজিৎ একটু উল্টে-পাল্টে দেখে বলল, আগের জন্মের কথা তো। এখন

মনে পড়ছে না।

হ্যাঁ এইটাই এখন অভিজিতের ধারণাধারা।

এখানে যা কিছু দেখছে আবছা মনে পড়ছে সবই, তবে আগের জন্মের ব্যাপার তো তাই স্পষ্ট মনে পড়ছে না।

ওরে খোকা! না রে না। এসবই তোর এই জন্মের। এই ঘর-বাড়ি, এই খাট-বিছানা, বই, ছবি, এই তোর মা-বাপ, ভাইবোন, বৌ, সব এ জন্মের সব, সব। ভাব, ভালো করে ভাব।

অভিজিৎ অবিশ্বাসের মাথা নেড়েছে, তা কী করে হবে? কত জন্ম-জন্মান্তরের পর তবে তো এই পুণ্য জন্ম।

এ জন্মে তোর নাম কী বাবা!

কত নাম! ঠাকুর, প্রভু, নারায়ণ, পরমেশ্বর।

বুবু বলেছে, দাদা! আমায় চিনতে পারছ?

কেন পারব না? এসো এখানে বসো।

আমি কে বলো তো?

জানি। বোন।

পল্টন বলেছে, দাদা, সব সময় বাড়ি বসে থাকো। চলো না একটু বেড়িয়ে আসবে।

অভিজিৎ ভয়ে চমকে উঠেছে, চুপ, চুপ! বেরোলে ধরে নিয়ে যাবে!

কে ধরে নিয়ে যাবে?

ওই সব ওরা!

মনোজিৎ প্রথমদিনই কাছে এসে পিঠে হাত দিয়ে বলেছিলেন, সোলজার। কত রোগা হয়ে গেছিস রে!

তখন চমকে উঠেছিল।

সোলজার? কই? কোথায় সোলজার? ডাকো না! কতদিন দেখিনি।

তুই তো সোলজার।

ও বলেছিল, ধ্যাৎ! সে অন্য লোক!

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই একই ধরনের প্রশ্ন।

প্রতিদিনের চেষ্টা।

কিন্তু উত্তরও তো প্রায় একই। কখনো কখনো বিদ্যুৎ স্ফুরণের মতো যেটা ঝলসে ওঠে, তখনই বলে, ওঃ, সেই অন্য জন্মে দেখেছিলাম।

পুরনো ফটোর অ্যালবাম, বিয়ের সময়কার গোছা গোছা সেই রঙিন ফটো সব নিয়ে চেষ্টা, মনে পড়ছে না? মনে পড়ছে না?

পড়ছে তো। এই তো সোলজার। এই তো-তো। আগের জন্মে চিনতাম। আর এই কনেটা কে? অ্যাঁ?

কী জানি।

একে দেখোনি?

দেখেছি তো। কোথায় যে হারিয়ে গেল!

ই যে তোর সামনে বসে আছে, এ কে?

এ তো সেই সুন্দর মেয়েটা! ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াত।

এখন তো ভিড়ের মধ্যে নেই! ভালো করে ছাখ তো। ছাখ চিনতে পারিস কিনা!

হঠাৎ একটু হেসে ফেলে ঘাড় নিচু করে বলেছিল, লজ্জা করে।

অতএব অনন্যার জন্ম-নক্ষত্র তার জীবনে বারেবারেই নাটকীয়তার ধাক্কা এনে দিচ্ছে।

কিন্তু তার মধ্যে না আছে রোমাঞ্চ, না আছে নতুনত্ব। বাংলা সিনেমার সই বস্তাপচা প্লট। সুন্দরী নায়িকা যে কোনো একটা ভূমিকায় হতে ারে স্ত্রী, হতে পারে প্রেমিকা, হতে পারে বা নার্স। তবে কাজ সেই এক য় পাগল, নয় জড়বুদ্ধি, নয় বা স্মৃতিলুপ্ত নায়ক নিয়ে দিনের পর দিন ধর্যের পরীক্ষা দিয়ে চলা। চেষ্টা করে চলা তার চৈতন্যের জাগরণের লগ্ন-টকে নিয়ে আসতে।

বির পর্দায় কতবারই এমন নাটক দেখেছে অনন্যা। এখন তার ভূমিকা ায়িকার!

্যা, তীব্র একটা আকর্ষণ জন্মেছে ওই স্মৃতিভ্রষ্টের অনন্যার ওপর, কিন্তু সটা কি হৃদয়ের দরজায় ধাক্কা দিতে পারে?

কিংবা হয়তো পারত।

যদি না অনন্যার জীবনে আর এক দিগন্তের উন্মোচন ঘটে যেত।

তবু অনন্যা লড়ে যাচ্ছে বৈকি। আপ্রাণ সাধনায় লড়ে যাচ্ছে।

তাছাড়া লড়তে তো হবেই। আশ্চর্য এক অলিখিত অনুশাসনে আত্মীয়-সমাজ থেকে ডাক্তার পর্যন্ত সকলেই ধরে নিয়েছে, ওই ঘুমন্ত ভগবানের নিদ্রাভঙ্গের দায়িত্ব অনন্যারই।

জাগরণে বিলম্ব ঘটলে—

সেটা হবে অনন্যারই অক্ষমতা!

কিন্তু জীবন বড় জটিল।

সুনন্দা তাঁর পুত্রবধূকে প্রায় নির্লজ্জের মতোই উপদেশ দেন, ওই বিষে আচ্ছন্ন পুরুষটির মধ্যে চৈতন্য উদয়ের জন্যে কী কী করা উচিত, কী কী করলে ভালো। অথচ—

হ্যাঁ, অথচ যখন দেখেন সেই আচ্ছন্ন চৈতন্য জীবটাই মায়ের জন্যে তেমন ব্যগ্র হয় না, যেমন ব্যগ্র হয় বৌয়ের জন্যে, তখন সুনন্দা বেজার হন ঈর্ষিত হন।

ছেলে যখন হঠাৎ বলে ওঠে, সেই সুন্দর মেয়েটা কোথায় গেল? ওকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

তখন সুনন্দার মুখ রাগে অভিমানে লাল হয়ে ওঠে। বলেন, আসবে। করছে। আয় আমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শো। আমি মাথায় হা বুলিয়ে দিই।

তারপর আস্তে আস্তে মনে পড়াতে চেষ্টা করেন তার ছাত্রজীবনের কথা। স্কুল থেকে কলেজ থেকে ফিরেই কী রকম চেঁচাতে চেঁচাতে সিঁড়ি উঠত, মা! আজ কী খাবার?

কিন্তু বেশীক্ষণ চলে না।

অবোধটা আবার বলে ওঠে, কই সেই মেয়েটা এল না?

মেয়েটা বলিস কেন? ও তোর বৌ।

ধ্যাৎ। ও তো সোলজারের বৌ।

তা তুই-ই সোলজার।

ফ্যাঃ।

সোলজার তবে কে ?

সেই ছেলেটা। সেই যে—কি জানি !

তবে তুই তাহলে কে ?

সেই তো ভাবনা। আসলে আমি কে ?

তবু আস্তে আস্তে একটা সমাধানের পথ আবিষ্কার করা হয়। ডাক্তারেরই নির্দেশে।

এখন বোঝানো হতে থাকে তাকে, 'আগের জন্ম' 'পরের জন্ম' ব্যাপার একটা আছে ঠিকই, তবে তোমার সেই 'নারায়ণ' জন্মটিই পূর্বজন্মের। এখন এটাই তোমার 'তুমি'।

মামা মাঝে মাঝে এসে বাজখাঁই গলায় বলেন, এই যে—এই হচ্ছে তোর মা। একে মা বলে ডাকবি। হ্যাঁ। আর এই হচ্ছে বাবা। বাবা বলবি। মনে থাকবে ? আর এই হচ্ছে তোর বৌ। ওর সঙ্গে গল্প করবি, হাসবি, বেড়াতে যাবি। খুব ভালো মেয়ে, খুব লক্ষ্মী মেয়ে। মনে থাকবে ?

ভয়ে ভয়ে মাথা কাৎ করে।

কিন্তু বাড়ির আর একটা প্রাণী ?

তার ওপর অলিখিত নির্দেশে ওই মানসিক ভারসাম্য হারানো লোকটার মানসিক সাম্যতা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব।

সে এক অদ্ভুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এই মানুষটা তাকে দেখে পুলকিত হয়, বিগলিত হয়, কাছে এসে বসলেই হাতে হাত বুলিয়ে বলে, 'তুমি কী সুন্দর'!

যেমন বলেছিল সেই ফুলশয্যার রাত্রে। কিন্তু এই 'বলার' মধ্যে কি সেই 'বলার' স্বাদ পাওয়া যায় ? এই মানুষটার মধ্যে থেকে কি সেই মানুষটা বেরিয়ে এসে ধরা যায় ?

এর বলার মধ্যে যুবকের উষ্ণ হৃদয়ের তীব্র মুগ্ধতার স্পর্শ নেই! আছে যেন

শিশুর সরল লাবণ্যময় মুগ্ধতা!
ওকে শিশু থেকে যুবায় পরিণত করে তুলতে হবে।
কোন্ মোহিনী মায়ায়?
কোন্ ক্ষুরধার অস্ত্রে?
নারীহৃদয়ের সঙ্কোচ নেই? নারীমনের মর্যাদার সংগ্রাম!
ঘরে এসে ঢুকল অনন্যা।
দুটো আলো জ্বলছিল, একটাকে নিভিয়ে দিলো। বিছানায় এসে বসল।
বলল, চুপ করে বসে আছ কেন? এত বই দিয়ে গেলাম, পড়ছ না?
বই? হ্যাঁ, পড়েছি তো।
কই? কোন্‌টা পড়েছ?
কী জানি। এখন মনে পড়ছে না।
তারপর ওর হাতের বাহুমূলে একটা হাত রেখে বলে, তুমি এত সুন্দর হলে কী করে?
অনন্যা ওর গায়ে হাত রেখে বলে, তুমিও তো কত সুন্দর!
ধ্যাৎ, তোমার কাছে কিছু না। তোমার হাতে একটু হাত বোলাব?
আচ্ছা, এতে অনন্যার চোখে জল এসে যায় কেন?
চোখে জল এসে যায়, তবু মুখে হাসি এনে বলে, ওমা! তা আবার জিগ্যেস করছ কেন? আমি তোমার বৌ না? আমায় নিয়ে তো তুমি যা খুশী করতে পারো?
তুমি! তুমি 'আমার বৌ?'
নিশ্চয়। আগে এইখানেই কত আদর করেছ, মনে পড়ে না?
হঠাৎ একটু উদ্বেলিত হয় ছেলেটা।
হ্যাঁ। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।
আবার ঝিমিয়ে যায়। বলে, কিন্তু সে কি আমি?
হ্যাঁ। হ্যাঁ। তুমি, তুমি। আবার তেমনি করে আদর করো না গো আমায়
অনন্যা অভিজিতের কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ে। বলে খুব আদর করো মনে পড়াতে চেষ্টা করো।

স্মৃতি-হারানো মানুষটা হঠাৎ আবেগে ওকে জড়িয়ে ধরে, গালে গাল ঘষে, বলতে থাকে তুমি কী সুন্দর ! তুমি কী নরম !

তারপরই হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে বলে, নাঃ। তোমার লাগবে।

না, না। আমার কিচ্ছু লাগবে না। তুমি আরো জোরে চেপে ধরো আমায়। আমায় ছিঁড়েখুঁড়ে—

বা ঃ। কী যে বলো ! আমার বুঝি মায়া হয় না !

না গো, আমার কষ্ট হবে না।

অভিজিতের হাতটা নিজের গালে চেপে ধরে।

কিন্তু সে হাত কেমন শিথিল হয়ে যায়।

খোলা জানলার দিকে কেমন অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে থাকে একটু। আস্তে বলে, শুনতে পাচ্ছ ?

কী শুনতে পাব ?

ঘণ্টার শব্দ।…বাজছে, গান হচ্ছে। কত সব লোক কত কী বলছে ! শুনতে পাচ্ছ না ?

না আমি শুনতে পাচ্ছি না।

তীব্র একটা বিদ্রোহের স্বর ফুটে ওঠে অনন্যার কণ্ঠে।

অভিজিৎ ভয়ে ভয়ে বলে, আচ্ছা আর বলব না। কাল আবার আদর করব, কেমন ?

মনোজিৎ ডাক্তারের কাছে অভিযোগ করেন, আপনি বলেছিলেন, এটা সাময়িক। ছ'সপ্তাহ নাগাদ ঠিক হয়ে যাবে। তো—

ডাক্তার পাল্টা অভিযোগ করেন, ছ'সপ্তাহ এখনো পার হয়ে যায়নি মনোজিৎ-বাবু। তাছাড়া আপনাদের দিক থেকে তেমন চেষ্টা কোথায় ? পেশেণ্ট বাইরে বেরোতে চায় না বলে আপনারা তাকে একইভাবে বাড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছেন। ভুলিয়ে-ভালিয়ে বার করুন। বাইরে বেরোলে-টেরোলে মনের মধ্যে সাড় আসতে থাকে। ছেলের স্টুডেন্ট লাইফের কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই ? তাদেরকে বাড়িতে ডাকুন না। তাদের বলুন—পুরনো সব আড্ডার জায়গায় নিয়ে যেতে। আসলে ওই সব দেহাতী জায়গায় সব-

কিছুই তো রাফ্ ব্যাপার।

আমাদের জানা বাজার-চলতি ড্রাগফাগ বোধহয় ব্যবহার করেনি। জঙ্গলের শেকড়-বাকড় লতাপাতার রস দিয়ে—সেসব জিনিসের রি-অ্যাকশান খুবই সাংঘাতিক। শুনছিলাম সেই চুরি যাওয়া মেয়েটা নাকি পাগল হয়ে গেছে। ছেলেটাই বা তাছাড়া আর কী।

মনোজিৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলেন।

না, না। আপনি অত হতাশ হবেন না মনোজিৎবাবু। আপনার ছেলের চোখের দৃষ্টি অনেকটা নর্ম্যাল হয়ে এসেছে। আমি বলছি কি, আপনারা ওর স্টুডেন্ট লাইফের বন্ধু-টন্ধুদের ডাকুন। দেখা করান। আমি বলছি তাতে ফল ভালো পাবেন।

ছাত্রজীবনের বন্ধু-বান্ধব!

মনোজিৎ হতাশভাবে বললেন, আমরা আর বিশেষ কাকে চিনি! এক ওই বিনায়কই নিজে থেকেই—কিন্তু আর তো কই আসতে দেখি না।

কিন্তু তার কথা আর মনেই বা ছিল কার?

না, আর তাকে আসতে দেখা যায় না।

কিন্তু কোথায় সে?

কবে তাকে শেষ দেখা গিয়েছে?

নাঃ, সে এই কলকাতা শহরের পটভূমিতে নয়।

বিনায়ক নামের সেই ছেলেটাকে দেখা গিয়েছে সেই এক অতি প্রত্যূষের আবছা আলোয় কটকে, অধ্যাপক অমলেশের বাড়ির পথে প্রায় গেট-এর কাছকাছি।

স্টেশন থেকে রিকশায়।

দুটো মানুষ। বিনায়ক আর অনন্যা।

বিনায়ক বলেছিল, রিকশাওলাকে পথ চিনিয়ে নেবার দায়িত্ব কিন্তু তোমার।

তা জানি।

আসছিল। প্রায় এসে যাওয়ার মুখে বিনায়কের কোলের ওপর জড়ো করা দুটো হাতের ওপর একখানা ঠাণ্ডা নরম শিথিল হাত এসে পড়ল।

বিনায়ক ! এমনও তো হতে পারে, আমি একাই এসেছি।

বিনায়ক সেই হাতের ওপর একটা হাত রাখার লোভ জয় করতে পারেনি।

সেটাই হবে। আমি এখানেই নেমে পড়ব।

তুমিও এই কথাই ভাবছিলে?

বিনায়ক বোধহয় একটু হাসল। বলল, আমি কী ভাবছিলাম তা জানি না। তবে তুমি এ কথাই বলবে তাই আমি ভাবছিলাম। এখানেই নামব। শুধু দূর থেকে দেখে নেব তুমি বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকলে।

তারপর।

তারপর আর কী?

বিনায়ক কাল থেকে তোমার খাওয়া হয়নি। সারারাত দাঁড়িয়ে কেটেছে—

বিনায়ক আবার একটু হাসল। তোমার বোধহয় কাল খুব ভালো খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। আর আরামের বিছানায় সুখনিদ্রা!

আমি তো এখনি সব কিছু পাব বিনায়ক। মা-বাপের কোল, খাওয়া, ঘুম। কিন্তু—

ওই তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিও না অনন্যা। নামছি। এই রিকশা, একটু থামো তো।

তবু অনন্যা ঝুঁকে পড়ে বলে, এই রিকশাটা তো এখুনি এখান দিয়েই ফিরবে।

তাই বোধহয়।

দোহাই তোমার, এটাই ধরে নিও। হাঁটতে শুরু করো না। আচ্ছা।

বিনায়ক, কথা দাও স্টেশনে গিয়ে চা-টা খাবে আর ফেরার ট্রেনে আগে খেয়ে নেবে।

হায় ঈশ্বর! এই জন্যে কথা দেওয়া!

বিনায়ক, আবার কবে কখন দেখা হবে?

ভবিষ্যতের যবনিকার ওপারে কী আছে কে বলতে পারে।

রিকশাটা থেমে দাঁড়িয়ে। লোকটা প্যাড্‌ল করে চলেছে।।

বিনায়ক, তুমি নিশ্চয় আমায় খুব স্বার্থপর আর খুব নিষ্ঠুর ভাবছ!

আমি তোমায় কী ভাবছি, সেটা আমার একারেই থাক না, আচ্ছা!

গুড্‌বাই।

বিনায়ক!

বলো।

না, কিছু না। বলার কী বা আছে!

আহা। তুমি এগোও।

রিকশাটা আবার এগোয়। গেট-এর সামনে দাঁড়িয়ে ঘন্টি মারে।

তারপর কি আর দেখা গেছে বিনায়ক নামের সেই ছেলেটাকে?

সুনন্দা ব্যাকুল গলায় বলেন. পল্টন, তুই একবার সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সেই নন্দনবাগান না কোথায় খোঁজ নিয়ে আয় না বাবা!

পল্টন কিছু বলার আগেই বুবু বলে ওঠে, গিয়ে কী হবে? সে এখানে নেই।

এখানে নেই, কোথায় গেছে?

রৌরকেল্লায় না কোথায় যেন।

তোকে কে বললো?

অত জেরা করো তুমি, ওঃ। আমার এক বন্ধু ওদের পাড়ায় থাকে।

এ উত্তরে বোঝা গেল না, সেই বন্ধুই খবর সাপ্লায়ার কিনা!

পল্টন, তুই তোর দাদার আর কোনো বন্ধুকে চিনিস না?

দাদার বন্ধুদের আমি চিনতে যাব কোথা থেকে! তবে বন্ধু এসে আর কী করবে? দাদার ব্রেনের বারোটা বেজে গেছে।

আঃ পল্টন। চুপ কর। চুপ কর।

চুপ করেই তো আছি বাবা। তবে যা দেখছি—সেদিন আমার একটা পুরনো ফুটবল নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে বললাম, দাদা, তোমার মনে আছে এটা তুমি আমায় ক্লাশে ফার্স্ট হওয়ার জন্যে প্রাইজ দিয়েছিলে? তো একটু দেখে বলল কিনা, মনে পড়েছে। সেই অনেক আগের জন্মে।

দাদার ব্রেনের বারোটা বেজে যাওয়ার আরো নানাবিধ নমুনার গল্প করতে শুরু করছিল। হঠাৎ অনন্যাকে আসতে দেখল। ব্যস্ত, বিপর্যস্ত।

এই, তোমরা দেখগে ওকে। কী নাকি হারিয়ে গেছে ওর। সেইটা খুঁজে পাচ্ছে না, সারা ঘর তোলপাড় করছে।

কী খুঁজে পাচ্ছে না?

সুনন্দা ছুটে আসেন। ব্যাকুল হন।

তা জানি না। বলছে, খুব দরকারি একটা জিনিস খুঁজে পাচ্ছে না ঘর তছনছ করছে।

সুনন্দা কেঁদে ফেলেন, কই এমন তো করে না? তবে কী আরো খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে?

সত্যি নিজস্ব কোনো 'প্রকাশ' দেখা যায় না এ বাড়ির ওই ভাগ্যহত ছেলে-টার মধ্যে।

সুনন্দা ওর চিরকালের পছন্দসই প্রিয় রান্নাগুলি করেন, করেন বিশেষ প্রিয় খাবার-টাবার সব।

একমনে খেয়ে যায়। বোঝা যায় ভালো লাগছে। আবার দিলেও আপত্তি জানায় না, খেয়ে নেয়। কিন্তু কখনো বলতে শোনা যায় না ভালো হয়েছে।

সুনন্দা যেচে যেচে বলেন, হ্যাঁ খোকা ভালো লাগছে?

তখন ঘাড় কাৎ করে।

তুই তো এসব খুব ভালবাসতিস। আগের মতো হয়েছে?

তখন চিন্তার মতো গলায় বলে, তা তো জানি না।

সব সময় নিরুত্তাপ শীতল।

সেই মানুষ কি হারিয়েছে বলে ঘর তছনছ করছে! আর ভরসা কোথায়?

তবু সবাই ছুটে যায় অভিজিতের ঘরের মধ্যে।

বুবু আর পল্টনের মধ্যে চোখে চোখে ইশারা হয়।

কী হারিয়েছে বুঝতে পারছিস?

পল্টন অন্যের অলক্ষ্যে নিজের মাথার কোনায় একটা টোকা মারে।

বিনায়কের দাদা অবাক হয়ে বলে, আবার সেই 'দুবাই' চলে যাবি? রৌর-কেল্লার চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এলি?

রৌরকেল্লার!

বিনায়ক নস্যাতের ভঙ্গীতে বলল, ওটা একটা চাকরিই ছিল না।

আহা, আস্তে আস্তে উন্নতি হতো।

কস্মিন কালেও না।

তা' দেশের মধ্যে আরো চেষ্টা করে দেখলে—

করলাম তো কতদিন। অথচ ওরা ডাকছে।

ওরা ডাকছে!

হ্যাঁ মানে আর কি একটা অ্যাড্‌ভার্টিসমেণ্ট চোখে পড়ল। আমাদেরই সেই কোম্পানীর। সারা ভারতে জানাচ্ছে—যারা কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে, অথচ আবার যেতে ইচ্ছুক তাদের আবার সসম্মানে নেওয়া হবে। তাছাড়া এমনিতে তো নতুনদের জন্যে দরজা খোলা। মাইনে ফাইনে তো দারুণ।

দাদা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, ভেবেছিলাম এবার একটা বিয়ে-ফিয়ে করবি। দুই ভাইয়ে একসঙ্গে—

বাঁশরি আড়ালে বলল, সব তোমার চালাকি। বোকাসোকা মানুষটাকে যা হোক একটা বুঝিয়ে দিলে। কক্ষণো তারা ডাকেনি। তুমি পালিয়ে যেতে চাও।

পালিয়ে! হঠাৎ ফেরারি আসামীর পোস্ট কেন?

কেন, তা নিজেই ভালো জানো। আমার গা ছুঁয়ে বলো, পালাবার জন্যে চেষ্টা করে আবার লেখালেখি করে—

কী মুশকিল, হঠাৎ পালাবার প্রশ্ন কেন? পালাতে যাব কী দুঃখে?

যে দুঃখে নষ্টনীড়ের অমল পালিয়েছিল।

ওঃ। মার্ভেলাস। বৌদি, আমি বলছি তুমি এই অসামান্য প্রতিভার এমন অপচয় করো না। নভেল লিখতে শুরু করো।

বাজে কথা বলে আমায় ঠকাতে পারবে না। তবে—

থাক। ওই 'তবে'টা তুলে রাখো।

বুবু বাড়ি নেই। পল্টনও না। সুনন্দা বুবুর ঘর তল্লাশ করে সেই 'ভৃগু'র সিদ্ধান্তখানা খুঁজে বার করে রান্নাঘরে এনে পড়তে বসেছিলেন।

কে জানে এর মধ্যে সত্যিই কোনো রহস্য লুকনো আছে কিনা। সেদিন বুবু বললো, সোলজারের সঙ্গে কী সব যেন মিলেছে। তারপরই—

পরেশ এসে দাঁড়াল, মাসিমা। সে-ই বন্ধুবাবু!

বুকটা ধড়াস করে উঠল সুনন্দার। একেই কি বলে ইচ্ছাশক্তির জোর। ক'দিন ধরে সুনন্দা অবিরত ভেবে চলেছেন, বিনায়ক হঠাৎ এসে পড়ুক।

তবু সাবধানে বললেন, কোন্ বন্ধু?

সেই যে গো বিনায়কবাবু শুদোলাম এতোদিন আসো নাই কেন? তা বললো, এই তো এলাম।

সুনন্দা বিগলিত হলেন, এলোমেলো হলেন।

বিনায়ককে এতদিন কোথায় ছিল বলে অনুযোগ করলেন, তৎপরে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে দ্রুত ছন্দে অভিজিতের অবস্থার কথা বললেন, এবং ডাক্তার কী বলেছে, তা বললেন। সেই কারণেই যে তাঁরা বিনায়কের জন্যে হা-পিত্যেশ করছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি সব কথা দ্রুতলয়ে বলে নিয়ে বললেন, হয়তো তোমায় দেখে চিনতে পারে? ছাখো বাবা গিয়ে।

তারপর গলা তুলে ডাকলেন, বৌমা!

বৌমা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, থমকে দাঁড়াল।

মনে হলো সে কী স্বপ্ন দেখছে?

সুনন্দা বললেন, এই ছাখো, বিনায়ক এসেছে। তুমি ওকে নিয়ে খোকার ঘরে যাও। আমি একটু কিছু খাবার করে আর চা নিয়ে যাচ্ছি। শোন আচমকা বন্ধুকে দেখে কী ভাব হয় দেখো। ডাক্তারকে বলতে হবে।···কী আর বলব। আমার কপাল। দুষ্টু ছেলেটা—নাকি আবার সেই কোথায় চলে যাচ্ছে। সেই যে আবুথাবু নাকি! দেশে-রাজ্যে একটা চাকরি জুটল না!

সেই সেদিন অমলেশের টেলিগ্রামে বৌ একা বাপের কাছে গিয়ে পড়েছে জেনে, সুনন্দা নিজের কুটিল চিন্তার জন্য মনে মনে লজ্জিত ছিলেন। এখন তাই বিনায়ক সম্পর্কে উদারতা এসেছে।

তাছাড়া—

ডাক্তারের নির্দেশ।

সুনন্দা অনেকখানি আশা নিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু খাবার বানাতে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।

কিন্তু সুনন্দার ছেলের বৌ?

সে কি তার পূজনীয়া গুরুজনের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করল?

তা' যদি করবে, তবে—সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এসে ডান দিকে অভিজিতের ঘরের দিকে না চলে এসে বাঁ দিকে এগিয়ে গেল কেন? দালানের শেষ প্রান্তে একটা কোনাচে বারান্দায় চলে এল কেন? যেখানে সংসারের বাতিল জিনিসপত্র কিছু জমিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে।

বিনায়ক মৃদু গম্ভীর গলায় বলল, বলো কী বলবে?

কিন্তু বিনায়ক কি ভেবেছিল এই মেয়েটা আবার একবার বাঁধ ভাসাবে? কিছু বলার আগে দুহাতে বিনায়কের দুই বাহুমূল চেপে ধরে বলে উঠবে, বিনায়ক! আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো!

হতবুদ্ধি বিনায়ক বড় কষ্টে নিজেকে সামলায়। রুদ্ধ গভীর স্বরে বলে, তোমায় নিয়ে যাব!

হ্যাঁ। হ্যাঁ। নিয়ে চলো। আমি আর পারছি না। এই পাথরের দেবতাকে নিয়ে—

অনন্যা! আমি তো কোথাও যাচ্ছি না। আমি শুধু পালিয়ে যেতে চাই।

কান্নায় ভেঙে পড়ে অনন্যা নামের ধীরস্থির মেয়ে।

বিনায়ক ওর মাথাটা বুকের কাছে চেপে ধরে।

অনন্যা, লোভ দেখিও না। হয়তো ফেলিওর হবো। তোমার ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নেই অনন্যা। আমায় ক্ষমা করো। আমি যাই—

অ্যাই। কে রে?

হঠাৎ যেন এই বেদনাদীর্ণ পরিস্থিতির উপর একটা বজ্রপাত হয়।

সামনে অভিজিৎ! মারমুখী মূর্তি। কে তুই, অ্যাঁ? তুই ওকে আদর করছিস যে! ও আমার বৌ না?

এক হ্যাঁচকায় অনন্যাকে নিজের দিকে টেনে নেয়। হাত দিয়ে আগলাবার

মতো ভঙ্গী করে বলে, আমার বৌয়ের সঙ্গে কথা বলবি না। খবরদার। যাঃ। চলে যা!

বিনায়ক অপলকে তাকিয়ে দেখে, সেই তার একদার একান্ত প্রিয় পরিচিত মানুষটাকে। খুব দুঃখের একটা আলোড়ন ওঠে।

তবু স্থির গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলে, কে বললে তোমার বৌ? ও তো 'সোলজারের বৌ'।

(ইতিমধ্যে সুনন্দার কাছে এ তথ্যও জানা হয়ে গেছে) জোরের সঙ্গেই বলে।

এই! চোপ।

সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসে অভিজিৎ নামের লোকটা। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় বিনায়কের গালে।

তুমি ওকে মারলে!

পাগলের বজ্র বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে রুদ্ধশ্বাস অনন্যা বলে ওঠে, তুমি ওকে মারলে!

মারবই তো। আরো মারব। ও তোমার সঙ্গে কথা কইতে এলে মারব, তোমার দিকে তাকালে মারব, তোমায়—

না, তুমি ওকে মারতে পারবে না। ও আমার বন্ধু। আমি ওর সঙ্গে চলে যাব।

ওর সঙ্গে চলে যাবে!

হঠাৎ যেন ঝুলে পড়ে ভয়ঙ্কর-মূর্তি লোকটা। মুখটা সাদা হয়ে যায়। প্রায় অবাক হয়ে অনন্যার দিকে তাকায়।

স্খলিত স্বরে বলে, তাহলে কে আমার কাছে থাকবে?

অনন্যা আরো দেখে ওই ভয়ার্ত মুখের দিকে। তারপর গলার স্বরে দৃঢ়তা এনে বলে, কেন, তোমার মা-বাবা ভাইবোন।

না!

আবার বজ্রগর্জন।

তাহলে আমি ওকে মেরে-মেরে মেরে ফেলব। ও চলে যাক। এক্ষুণি চলে

যাক। ওকে আবার মারতে ইচ্ছে করছে। তুমি ওর সঙ্গে চলে যাবে। ওঃ! ওঃ!

বিনায়ক এখন অনন্যার দিকে তাকিয়ে একটু অদ্ভুত বিষণ্ণ হাসি হাসে। আস্তে বলে, পাথরের পুতুলের মধ্যে রক্তের জোয়ার দেখা দিচ্ছে। এবার হয়তো সেরে উঠবে অনন্যা।

তারপর অভিজিতের আবার ক্ষেপে-ওঠা মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলে, দূর বোকা! বৌ তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছে। ও কখনো তোকে ছেড়ে চলে যেতে পারে? ও তোকে কী দারুণ ভালবাসে বুঝতে পারিস না? প্রচণ্ড ভালবাসে। তোকে ছেড়ে যাবার সাধ্যই নেই।

আবার স্তব্ধ হয়ে যায় ক্ষেপে-ওঠা মানুষটা।

যেন কোথায় কোনখানে একটা আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা চলছে।

আবার অবাক অসহায় দৃষ্টিতে অনন্যার মুখের দিকে তাকায়। তাকায় বিনায়কের মুখের দিকে।

বিনায়ক ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে বলে, চলি রে সোলজার। তোর কিছু ভয় নেই। আমি আর কক্ষণো আসব না। অ-নেক দূরে চলে যাব।

অনন্যা শিথিল গলায় বলে, একটা নিষ্ঠুর স্বার্থপর মেয়ের কথা ভুলে যেও।

বিনায়ক আবার একটু হাসে। দেখি কতটা পর্যন্ত হুকুম তামিল করা যায়। আচ্ছা! টা টা!··· সোলজার টা টা!

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল দ্রুত পায়ে।

আর তখন ভারী বিচলিত দেখাল অভিজিৎকে।

সেই চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট গলায় বলল, ও রাগ করে চলে গেল। কী হবে?

অনন্যা কি ছুটে সিঁড়ির দিকে গেল?

নাঃ।

অনন্যা তার সামনের এই হতাশ অসহায় অপরাধীর মতো মুখে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে দেখল। আর যেন খুব তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, যাক গে। কী আর হবে।

না! না! ও আমার বন্ধু। ও আমায় ভালবাসে। ওকে আমি মারলাম! ও আর আসবে না।···আমি কী করব?

হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে উথলে কেঁদে উঠে দালান পার হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়।

একটা পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে অনন্যা।